পথে-ঘাটে

রানী চন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক: ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা
কলিকাতা—৯

প্রথম সংস্করণ: ১৯৬০

প্রচ্ছদ চিত্র: নন্দলাল বসু
প্রচ্ছদ বিন্যাস: বিপুল গুহ

মুদ্রক: দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

বন্ধুর বন্ধু—অভীক-কে

স্বামী কর্ম উপলক্ষে নানা স্থানে 'ট্যুরে' যেতেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁর সঙ্গ নিতাম। তাঁর সঙ্গে চল্‌তি পথে চলতে চলতে যেটুকু দেখেছি, যতটুকু শুনেছি—সে-সবের কিছুটা লিখেছি। অনেকটাই বাকী রয়ে গেল।

ব্যক্তিগত দুর্যোগের দরুন ফিরে পাণ্ডুলিপি দেখা বা সংশোধন করা হয়ে ওঠেনি। যাঁরা আমার হয়ে দেখে দিয়েছেন তাঁদের আমি অন্তরভরা কৃতজ্ঞতা জানাই। ভুলত্রুটি যা' রইলো—তার জন্য আমিই দায়ী।

'জিতভূম'
শান্তিনিকেতন

রানী

নেফা

নেফার একটি জিলা 'সুবনসিরি,' সুবনসিরির সদর 'জিরো'।

মুখোমুখি দুই উঁচু পাহাড়ের টিলার উপরে একটিতে 'সার্কিট হাউস', অন্যটিতে পলিটিক্যাল অফিসারের বাসস্থান,—আমরা আছি এদের সঙ্গেই। হু হু-হাওয়া। টিলায় বসে দেখা যায় নীচে খেলার মাঠ ক্লাবঘর দোকান বসতি অফিস স্কুল, হাসপাতাল,—ভারত সরকারের পূর্ণ 'এস্টাব্লিশমেণ্ট'। নেফাকে তুলে ধরতে হবে, নেফার লোকের মন জয় করতে হবে।

জিরো নতুন সহর। জিরোতে নতুন পথ নতুন বাড়ী, নতুন লাগানো গাছের সারি। ভারতের নানা দেশ থেকে এসেছে নানা কর্মচারী—নানা বিভাগের নানা কর্মভার নিয়ে।

সুবনসিরির সকল ভালোমন্দের যোগাযোগস্থল এই জিরো।

দু'জন নেফাবাসী 'লিয়াসোঁ' অফিসার অপেক্ষা করছে বাইরে, আমাদের সঙ্গে যাবে গ্রামে—গ্রাম দেখাতে। লাল রং-এর জমকালো প্যাণ্ট কোট পরনে, মাথায় লম্বা লোমের ছড়ানো টুপী। রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ঢালাই-কাঁসার বাহারে পাইপ মুখে দিয়ে টানছে। অল্প অল্প হিন্দি জানে, সেইটুকুর ভিত্তিতে দোভাষীর কাজ করে। বাইরে থেকে কেউ এলে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। নয়তো ঘুরে বেড়িয়ে তামাক খেয়েই সময় কাটিয়ে দেয় বেশীর ভাগ।

সস্ত্রীক পলিটিক্যাল অফিসর চললেন আমাদের নিয়ে।

লোকালয় পেরিয়ে বাঁক ঘুরে যেতেই যেন এক খোলা উপত্যকায় এসে পড়লাম। যেন দরজা খুলে অনেকখানি আকাশ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। পাহাড়ে মাটিতে ঘাসে বনে নীলে সবুজে ফুলে মেঘে সব অতুলনীয় সৌন্দর্য। বিস্তৃত শস্যহীন মাঠ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট সবুজ পাহাড়,—পাহাড় ঘিরে জংলী পিচ পিয়ার্সের গাছ, লাল গোলাপী সাদা বেগুনি ফুলে ফুলে ভরা। দূরে নীল পাহাড়। উপরে সাদা মেঘের লুটোপুটি সুনীল আকাশে। এ এক অপরূপ শোভা, অপূর্ব সাজ। ঐ সাজের উগ্রতা নেই। সলজ্জ সুন্দর সাজ। বিয়ের আসরে হালকা ওড়নায় আবৃত সুবেশী সালঙ্কারা কনেকে দেখে বরের মনে স্বপ্ন জাগায়—সেই স্বপ্ন-মাখা সৌন্দর্য দিকে দিকে।

এরই মাঝে পাহাড়ের কোলে কোলে আপাথানীদের গ্রাম।

পথের ধারে গ্রামের স্কুল বাড়ী,—'স্বাগতম্' জানাতে সাজিয়েছে তোরণ। বাঁশের খুঁটিতে জড়িয়েছে ঝাউপাতা। ঝুলিয়েছে থোকা থোকা বাঁশচাঁছা ফুল। সবুজ পাতার মাঝে মাঝে দেখাচ্ছে ঠিক যেন সাদা অর্কিডের গুচ্ছ এক একটা। হাতীর দাঁতের মতো রং।

কাঁচা বাঁশের সবুজ ছালটা ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলে ভিতরের সাদা বাঁশটার গা থেকে গাঁট পর্যন্ত হাল্‌কা হাতে চেঁছে চেঁছে ছেড়ে দিয়েছে;—একেবারে আলগা

করে তুলে ফেলেনি সবটা। পাতলা কাপড়ের মতো আঁশগুলি একটু কুঁকড়ে জড়ো হয়ে ঝুলছে এক একটা গাঁট হতে। দূর থেকে দেখায় যেন এখুনি তুলে আনা তাজা ফুলের গোছা সব।

গ্রামে গ্রামে থামি। স্কুল বাড়ি দেখতে দেখতে যাই। একই ছাঁদে একই উপাদানে সাজানো সব তোরণ। কাঁচা বাঁশের মৃদু সৌরভ মনে লেগে থাকে।

ক্ষেতে কাজ করছে বেশির ভাগই মেয়েরা। নতুন করে ধান লাগাবার সময় আসছে। শুকনো জমির আগাছার গোছাগুলি কেটে কেটে ফেলছে।

পুরনো ধানের গোড়াগুলি ক্ষেতেই ছড়ানো থাকে, কিছু পচে, কিছু পোড়ায়,—ক্ষেতে সার হয়। মাঝে মাঝে জলজমা ক্ষেত,—তা' থেকে মাটি তুলে ভালো করে আল বাঁধছে ছেলেরা, কোদাল দিয়ে কাদামাটি উল্টে দিচ্ছে। ক্ষেতে হাল দেয় না এরা, কোদাল দিয়েই মাটি তৈরী করে।

'তাখে তাগুন'—গাঁওবুড়ার নাম। 'তাখে' পাড়ার নাম, তাগুন বুড়ার নিজ নাম। এদের মেয়েদের নাম ইয়াজা, ইয়াল্লা, ইয়াখা, ইয়াইয়া, ইয়াপা,—এইরকম। বাবাকে ডাকে 'আব্বা', মাকে ডাকে 'আনে'।

তাখে তাগুনকে হিরণ ডাকে 'আব্বা' বলে। হিরণের আব্বার গাঁয়েই আসি আগে।

'লাপাং'—মিটিং করবার প্ল্যাটফরম। গায়ে গায়ে লাগা বাড়িগুলি, জলে-কাদায় থকথকে সব সরুপথ গ্রামের ভিতরে। গ্রামের মাঝখানে একটু খোলা স্থানে লাপাং।

মোটা মোটা বৃক্ষখণ্ডের খুঁটির উপরে—বোধহয় বটগাছের চেয়ে দ্বিগুণ তিনগুণ মোটা 'টিজা' গাছ, তারি তক্তা ফেলা লাপাং। দুই জোড়া পালঙ্কের মতো চওড়া মোটা বড় বড় তক্তা। দা আর কুড়ুল দিয়েই কেটে আনে এই তক্তা বন হ'তে পাড়ার যুবকরা। সেই একহাত দেড়হাত মোটা এত বড় বড় তক্তা আনাই তো এক ব্যাপার।

মোটা কাঠের সিঁড়ি ফেলা, তাই বেয়ে উঠতে হয় লাপাং-এ। ভিড় করে বস'লে শতাধিক লোক বসতে পারে এতে। ঘিঞ্জিগ্রাম, ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটি, দরকারে অদরকারে কোথায় জড়ো হবে পাড়ার লোক? কার অঙ্গনে বসবে? অঙ্গন এদের নেই।

তাই গ্রামের মধ্যিখানে চৌমাথার উপরে এই খোলা জায়গাটুকুতে হ'ল পাড়ার মুরুব্বিদের বৈঠকখানা।

লাপাং-এ উঠে বসলাম, পাড়ার মুরুব্বিরাও বসলেন। অতিথিপরায়ণ লোক এরা। গ্রামে অতিথি এলে বড় খুসী হয়। সবার ঘর থেকে কিছু কিছু করে আপং, ডিমসিদ্ধ এনে জড়ো করা হয়েছে। বাঁশের চোঙার গ্লাশে আপং দিল—দেশী মদ, আর দিল হাতে হাতে ডিমসিদ্ধ খেতে। গ্রামের নারীপুরুষ বালক বালিকা সব ভীড় করেছে লাপাং ঘিরে পথের উপরে।

আপাথানী মেয়েদের পরনে হাতে-বোনা সাদা মোটা কাপড়, হাঁটুর উপর অবধি তোলা লুঙ্গির মতো কোমরে ঘুরিয়ে পরা। চওড়া কালোপাড়ের নকশা থাকে দু' হাঁটু ঘিরে। দূর থেকে দেখলে বা ফটো তুললে মনে হয় যেন স্কার্ট পরা মেয়েরা ধান বুনছে ক্ষেতে—জলেকাদায় পা ডুবিয়ে। গায়ে গরম কাপড়ের জামা সবাকার।

ছেলে বুড়ো নারীপুরুষ সকলের পিঠের দিকে ঝোলে একটা পুরু মোটা চাদর—'ক্লোক'-এর মতো। চাদরের একদিকের ধারে মাঝখানে মালার মতো সরু

একটা দড়ি বাঁধা থাকে, সেই দড়িতে মাথাটা গলিয়ে দেয়, চাদরটা পিঠ ঢেকে পিছনেই ঝুলতে থাকে। লোকেরা কাজ করে কাঠ কাটে, মেয়েরা ফসল বোনে পথ চলে, শিশুরা ছোটে খেলা করে,—চাদর গড়িয়ে পড়ে যায় না বা ধরে থাকতে হয় না হাতে চেপে। চাদর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে থাকলেও চাদর চাদরের কাজ ঠিকমতো করে যায়। শীত থেকে সকলকে রক্ষা করে রাখে।

সব কাপড় এরা নিজেরাই বোনে, যে যার ঘরে।

ছেলেরা পরে লেংটি। লাল রং দিয়ে সরু সরু বেত রং করে সেই বেতে বোনা মোটা বেল্ট পরে কোমরে, বেল্ট হতে পিছনে ঝোলে বেতেরই বোনা একটি লেজ। পশু থেকে মনুষ্যজীবন,—সে কথা স্মরণ রাখতে পরে এই লেজটি। কুকুর ভয় পেলে লেজটা যেমন পেটের তলায় গুটিয়ে আনে, তেমনিতরো গড়ন লেজটির। বসবার সময়ে পিছন থেকে লেংটিটা ঢেকে সামনের দিকেও এগিয়ে এসে ঢাকা দেয় খানিকটা। মোচার খোলের মতো গড়ন, তবে মুখের কাছটা গোল। অনেকটা কাঠবাদাম পাতার মতো মুখের দিকটা।

ছেলেরা লম্বা চুল কপালের উপরে এগিয়ে এনে ঝুঁটি বাঁধে, ঝুঁটি এফোঁড় ওফোঁড় করে পশম বোনার কাঁটার মতো লম্বা একটা কাঁটা গুঁজে রাখে। এই ঝুঁটি এরা নানাভাবে সাজায়।

মেয়েরা বাঁধে মাথার পিছনে ঝুঁটি। বাঁশের ছোট একটা কাঁটা গোঁজা থাকে তাতে।

ভীড়ের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে এক যুবক—যেন যুবরাজের ভঙ্গী। কপালের উপর ঝুঁটির গোড়ায় কাঁসার তৈরী চেনমালা জড়ানো। ঝুঁটিতে লম্বা লম্বা দু' দুটো কাঁটা। ঝুঁটিতে খেঁজুর-আঁঠির-বিনুনী বাঁধা।

খেঁজুর-আঁঠির-বিনুনী দেখে মনে পড়লো, ছেলেবেলায় দিদিমা এই রকম বিনুনী বেঁধে দিতেন আমার চুলে। বিনুনীর দু'পাশ থেকে সরু সরু চুলের গোছা তুলে তুলে নিয়ে বিনুনী বেঁধে যেতে হয়। অনেক সময় লাগে এই বিনুনী বাঁধতে। খেঁজুর-আঁঠির মতোই সরু সরু ঝিরঝিরে দু' লাইন নক্শা পড়ে [illegible]া বিনুনীতে। দিদিমার কাছে শেখা, তাই জানি নাম।

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম,—কতক্ষণ লেগেছে বিনুনী করতে?

সে বললো, দু'তিন ঘণ্টা লাগে। মাসে দু'মাসে একবার করে খুলি, বাঁধি।

মোটা মোটা খুঁটির উপরে ঘর। কোনো ঘর দেখায় দোতলা সমান উঁচু, কোনো ঘর দেড়তলা সমান। ঢালু নীচু জমি বুঝে বুঝে লম্বা ছোট খুঁটির উপরে বাড়িগুলি তুলে ধরা, বাঁশ, কাঠের বাড়ী, প্রতি বাড়ীর সামনে বাঁশ, কাঠের রেলিং-ঘেরা খোলা বারান্দা। বাড়ীতে বাড়ীতে গিন্নির দল মেয়ের দল দাঁড়িয়ে আছে আপন আপন শিশু বুকে নিয়ে। কেউ আমাদের দূর হতে দেখছে, কেউ দেখছে [illegible]ছ হতে। রাস্তা দিয়ে মিছিল গেলে যেমন সবাই পথে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে, এও যেন তেমনিই।

এদের ঘরের ভিতরটা একটু দেখব।

গ্রামসেবিকা হিরণ আসামী মেয়ে। গ্রামের বাইরে স্কুল, সেখানে এদের আস্তানা। দুটি মেয়ে থাকে এরা, এখানকার মেয়েদের হাতের কাজ শেখায়। একা একা লাগলে চলে আসে গ্রামে। এদের দেশে আছে, এদের সঙ্গে না মিশলে তো চলেও না। হিরণ গাঁওবুড়াকে 'আব্বা' বলে ডাকে, আব্বাও হিরণকে কন্যাতুল্য স্নেহ করে।

হিরণের কাছে আমার ঘর দেখবার ইচ্ছার কথা শুনে আব্বা আমাদের নিয়ে

চলল তার নিজের বাড়ীতে। সরু পথ, কাদামাটি, মুরগী শুয়োর ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে।

আব্বার বাড়ী একটু উঁচু জমিতে। ছোট ছোট খুঁটির উপরে দোচালা বড় লম্বা একখানা ঘর। ঘরে উঠবার মুখে বাঁশে ঘেরা বাঁশের মাচার সুন্দর একফালি 'ব্যালকনি'র মতো বারান্দা।

ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। খানিক দাঁড়িয়ে থাকলেও অন্ধকার সয়ে আসে না, কিছু দেখা যায় না। অনেক সময়ে বাইরের আলো থেকে ভিতরে ঢুকলে সব অন্ধকার লাগে, পরে অন্ধকার সয়ে আসে, ধীরে ধীরে সবকিছু দৃষ্টিতে পড়ে। এ তা' নয়।

মেঝের মাঝখানে আগুনের কুণ্ডে ছাইচাপা আগুন। আব্বা কয়েকটা কাঠ গুঁজে দিল আগুনে, আগুন জ্বলে উঠলো। সেই আলোতে দেখতে পেলাম আগুনের উপরে বাঁশের ছোট একটা মাচা, তার উপরে 'আপং'-এর হাঁড়ি, 'সারসে'-এর দানা, মিথুনের মাংস। চাপ চাপ মাংস আগুনের তাতে 'রোস্ট' হয়ে আছে। ধোঁয়ায় তাপে মাংস এমনভাবে তৈরী হয়ে যায়,—নষ্ট হয় না অনেক দিন পর্যন্ত। দরকার মতো এই মাংস হতেই কেটে কেটে নিয়ে খায় গৃহস্থরা। 'সারসের' দানা কুটে মদ তৈরী করে। ভাত শাক শুধু সিদ্ধ হয় উনুনে, তা'ছাড়া আর সবকিছু রান্না হয় মাচার উপরে এইভাবে ভাপে আর আগুনের তাতে।

আব্বা বেড়ার গা হতে একখানা ধোঁয়ায় ধূসর সাদা কম্বল টেনে নিয়ে আগুনের ধারে পেতে দিল আমাদের বসবার জন্য। আগুন ঘিরেই বসে সবাই—যে যতক্ষণ ঘরে থাকে। আব্বার পাতা কম্বলখানায় বসতে যাব, কোথায় যে ছিল—গাঁট্টাগোট্টা একটা কুকুর আমাদের ঠেলেঠুলে আগুনের ধার ঘেঁষে কম্বলের মাঝখানে বিশেষ স্থানটি দখল করে পেটের খাঁজে মুখ ঢুকিয়ে মহা আরামে শুয়ে পড়ল।

আমরা হটে এলাম, তার এপাশে-ওপাশে জায়গা নিয়ে বসলাম। শীতের দেশ, একটু আগুনের তাপ বড়ই আরামদায়ক।

আব্বার সংসার বড়। পুত্র পুত্রবধূ সবাইকে নিয়ে থাকে আব্বা এই ঘরে। ঘরের প্রধান বস্তু আগুন, আর আগুনের উপরের মাচা। বেড়ার গায়ে ছোট ছোট 'কাঁর', তাতে থাকে কম্বল কাপড়। রাত্রে আগুনের ধারে কম্বল বিছিয়ে ঘুমোয় সবাই। ঘরের বাইরে পিছন দিকে চালের নীচে যে সরু মাচা—সেখানেই এদের মলত্যাগের ব্যবস্থা। বাঁশের কঞ্চি ব্যবহার করে, জলের বদলে। ঘরের নীচে শুয়োর থাকে, ময়লা খেয়ে ফেলে।

'আব্বা'র ঘর, ঘুরে ঘুরে দেখতে বাধা নেই কোনো, সঙ্কোচও নেই। 'আব্বা' 'আনে'—সর্বদেশে সর্বকালের আপনজন।

বাড়ীতে 'আনে' নেই, আব্বা কি আর করে, আদরযত্ন দেখায় কি করে? আব্বা বেড়ার ধার থেকে গায়ে দেবার মোটা একখানি চাদর তুলে আমার হাতে দিল, বললো, কাঠের ধোঁয়ায় কালো হয়ে আছে, নয়তো নতুন বোনা এখানা। ধুয়ে নিয়ে গায়ে দিও।

গ্রামের বাইরে একসারি ছোট্ট ছোট্ট ঘর, গৃহস্থরা যে যার ঘরে দানা ভরে রাখে। প্রয়োজন মতো বের করে নেয়। আগুন যদি লাগে গ্রামে—মুখের আহারটা নষ্ট হবে না সেই আগুনে।

'জং' গ্রাম, আপাথানীদের সবচেয়ে বড় গ্রাম। সাড়ে পাঁচ হাজার আপাথানীর বাস এ গ্রামে।

এ বছর এ গ্রামে 'পুজো। এক এক বছর এক এক গ্রামে এই পুজো হয়। যে গ্রামে পুজো হয়—অন্য গ্রামের সব লোক অতিথি হয়ে আসে সেই গ্রামে। 'মিথন' বলি হয়, সবাই সেই মাংস খায়।

প্রতিটি বাড়ীতে একটি লম্বা থাম পোঁতা, তার মাথায় তিনখানি সরু তক্তা। তক্তার দু'পাশে ঝুলছে বাঁশের গা চাঁছা সেই রকম ফুলের গোছা। যতগুলি বাড়ী, ততগুলি থাম, আর তত দ্বিগুণ সেই ফুল। গ্রাম ছাপিয়ে বাড়ী ছাপিয়ে ফুলের গোছা দোলে হাওয়ায়। তফাতে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগে যেন প্রত্যেক বাড়ীর মাথার উপরে রাজছত্র ধরা। সারা গ্রামের এ এক শোভা।

'বব্' খেলা এদের প্রসিদ্ধ খেলা। গ্রামের ভিতরের লম্বা পথটি জুড়ে মস্ত লম্বা একটা বেত টাঙানো। বেতের এক দিকটা মাটির সঙ্গে লাগা, আর দিকটা উঁচু খুঁটির ডগায় বাঁধা। 'ক্রা'-গাছ—সুউচ্চ গাছ, তার পুরো কাণ্ডটা দিয়ে এই খুঁটি।

বিশেষ সাজে সেজেছে আজ পূজারী দুইজন। বুকে সাদাকড়ির বেল্ট, গলায় পুঁথির মালা, কোমরে হাতে কাঁসার গহনা ভরা। মাথার ঝুঁটিতে লাগানো কাঁটা থেকে ঝুলছে ঝালরের মতো চেনের গোছা। পরনে রঙীন লুঙ্গি, গায়ে রঙীন কাজ করা চাদর, মাথার উপর থেকে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া নক্সা তোলা রঙীন কাপড়।

নেফার পুরুষরা যে যত বেশী বৌ ঘরে আনতে পারে তার সম্মান তত বেশী সমাজে। কারণ বৌ আনতে এদের টাকা লাগে। কে কত ধনী—বৌদের সংখ্যা দিয়েই নির্ণয় হয় তা'।

গরুর মতো রংটা সাদা, মোষের মতো গড়ন অনেকটা—ঘাড়ে গর্দানে মাংসল এই বৃহৎ জন্তুটিকে এরা বলে 'মিথন'। এক একটা মিথনের দাম এদের হিসাবে পাঁচশ' টাকা। বেচাকেনা এদের টাকা দিয়ে হয় না, হয় মিথন দিয়ে।

তিব্বতীরা আসত, তাদের সঙ্গে থাকত পশুর লোম, পাথরের মালা, আর ধাতুর থালা গামলা। মিথনের বদলে লেনদেন করত তারা তাদের জিনিষ এদের কাছে। তিব্বতীদের পাথরের মালা—দার্জিলিং কালিমপঙের বাজারে যে সব লম্বা লম্বা মোটা দানার মালা দেখি, সেই রকমেরই মালা সব। এক একটা মিথনে এক একটা মালা কেনে এরা। এদের ধনসম্পত্তিই হচ্ছে মালা আর মিথন।

পূজারী দুইজনের একজন মাঝবয়সী, আর একজন প্রায় বৃদ্ধ।

সঙ্গের বন্ধু হেসে ইঙ্গিতে দেখালেন বৃদ্ধকে, বললেন,—এই সেই গাঁওবুড়া। একে দেখবার আগ্রহ ছিল আমাদের। এর কথা শুনেছি আগে।

প্রথমবার যখন এসেছিলেন এখানে পণ্ডিত নেহেরুজী, কন্যা ইন্দিরাও ছিল সঙ্গে। ইন্দিরাকে দেখে পছন্দ হয়েছিল গাঁওবুড়ার। পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞেস করলো—ক'টা মিথন লাগবে?

প্রস্তাব শুনে পণ্ডিতজী একটু হকচকিয়ে গেলেন। সামলে নিয়ে হেসে বললেন, মেয়ে তো সামনেই আছে, তার সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করলেই তো ভালো সবচেয়ে।

লাপাং-এ বসেছি সবাই। মাঝবয়সী পূজারী উঠে দাঁড়িয়ে সুর করে মন্ত্র পড়তে লাগলো। বৃদ্ধ পূজারী বসে একহাত পরিমাণ বাঁশের কঞ্চি নিয়ে তক্তার উপরে আড়ে আড়ে রাখতে লাগলো। ওদিকে 'বব্' খেলা শুরু হ'ল।

যুবকরা লাফিয়ে হাত দিয়ে বেতটা ধরতেই স্প্রিং-এর মতো বেতটা ঝটকায়

ঝট্‌কায় বাড়ি ছাপিয়ে লাফিয়ে উঠতে থাকল। দু'হাতে বেত ধরা যুবকরা শূন্যে শূন্যে দুলতে লাগল। বেশীক্ষণ পারে না থাকতে এইভাবে, এক, দু'মিনিট শূন্যে থাকবার পর বেতটা নামার সঙ্গে সঙ্গে ধপ করে নেমে পড়ে মাটিতে। কেউ নামে, কেউ থাকে, কেউ ওঠে। বেতের মাঝখানটা জুড়ে কতকগুলি দেহ ঝুলতে থাকে। সকলেরই চেষ্টা থাকে বেতের ঢালু দিকটা হতে উপর দিকে যাবার। যে যত উপরে উঠতে পারে তার তত বাহাদুরি।

এ খেলায় বিপদ অনেক। হাত পিছলে একবার ছিট্‌কে পড়লেই হাড়গোড় মাথা ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড রক্তারক্তি কাণ্ড হবে একটা। তাই পুজারীরা কণ্ঠি সাজায়, পুজো করে, মন্ত্র পড়ে। নির্বিঘ্নে যেন খেলা সমাপ্ত হয় সুরু থেকে শেষ তক্‌।

'লেহাগম'—যুবকের নাম। বাঁ হাতের কবজি ঘিরে জড়ানো সরু কালো বিনুনী একগোছা। কুকুরের লোম বা মাথার চুল দিয়ে করে এই বিনুনী। এই বিনুনীর বালা হাতে থাকলে তীর ছুঁড়বার সময়ে ঘষা লাগে না হাতের চামড়ায়। সব সময়েই যেন এদের যোদ্ধার সাজ, যোদ্ধার মন।

লেহাগম তার ঘরে ডেকে নিয়ে এলো আমাদের। ঘরের ভিতরে বেড়ার গায়ে ঝুলছে চামড়ার ঢাল, লেহাগম ঢালটা হাতে তুলে নিয়ে বর্শা ছোঁড়া দেখালো। বর্শাটা বেড়ার দিকে ছুঁড়েই দৌড়ে গিয়ে বুকের ভিতর থেকে ছোট ছুরি বের করে বেড়ার খানিকটা কেটে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো, যেন বর্শায় বেঁধা জীবটার বুকপিঠ চিরেকুটে ফেললো। বোঝালো,—জন্তু মানুষ এইভাবেই মারে এরা—যখন যাকে মারতে চায়।

এ গ্রামেও আমাদের উপহার দিল হাতে বোনা চাদর কুর্তা। অতিথিদের এরা এই রকম কিছু না কিছু দেয়ই। আমরাও দিলাম কয়েক বস্তা নুন গাঁওবুড়াকে, ঘরে ঘরে ভাগ করে নেবে। নুন পেলে এরা বড় খুশী হয়।

এখানকার লোকদের হাতের কাজ সকলেরই সুন্দর নিপুণ। এদের হাতের বোনা সুন্দর, এদের হাতের কারুকাজ সুন্দর। সরু বেত তুলে যা কিছু করে—অলঙ্কারের সামিল সুন্দর দেখায় তা।

হাসপাতাল কি এখনো বোঝে না ঠিকমতো। ভুলিয়ে-ভালিয়ে রোগী-রোগিণীকে ধরে আনা হয় হাসপাতালে—কষ্টে শোয়ানো হয় বিছানাতে। টফি লজেঞ্জুস দিয়ে ভোলাতে হয় ক্ষণে ক্ষণে রোগীকে। আর, তারাও তক্কে তক্কে থাকে—কখন উঠে পালিয়ে যাবে এখান হতে।

এখনকার ছেলেরা শিক্ষিত হয়ে উঠছে, দলে দলে পাশ করে বের হচ্ছে। উজ্জ্বল তাদের মুখ—তাদের দৃষ্টি। দেহ সুস্বাস্থ্যে ভরা।

টিলার উপর থেকে দেখছিলাম জিরোর সহরটা। এখান থেকে প্রায় সবটাই এক রকম দেখা যায়। নীচের পথ দিয়ে যাচ্ছিল একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক; পলিটিক্যাল অফিসারের স্ত্রী শ্রীমতী সিং তাকে দেখিয়ে বললেন—এই সেই দোভাষীর মেজবৌ।

এখানে দুজন নেফাবাসী দোভাষীর কাজ করে। একজন একটু ভারী গড়নের, গম্ভীর ভাবের। অন্যজন বয়স কিছুটা হলেও দেখতে ছেলেমানুষ, হালকা গড়নের,—হালকা মেজাজেরও। যেন স্কুল-পালানো দুষ্টু ছেলের ভাবভঙ্গী তার। এর কথাই শুনেছি যে এর ঘরে নাকি অনেকগুলি বৌ।

গল্প বলেছিলেন শ্রীমতী সিং, এই দোভাষীর মা নাকি স্বপ্নে দেখেছিল—তোর ছেলে একটা মস্ত লোক হবে, সে বারোটা বিয়ে করবে।

মা মরে গেছে, কিন্তু মা'র স্বপ্ন সফল করতে সে বিয়ের পর বিয়ে করে চলেছে। আশা আছে আর বছর দুয়েকের মধ্যে বাকী বিয়ে কয়টা ও করে উঠতে পারবে।

এক ঘরে দুটো বৌ দেখলেই আমরা কত অবাক হই, আর এখানে এতগুলি বৌ! একবার দেখতেই হবে। যেতে হলে আজ রাত্রেই যেতে হয়, নইলে সময় কোথায়? পলিটিক্যাল অফিসর একটু ইতস্ততঃ করছেন—'প্রোটোকলে' বাঁধে একটু। কিন্তু কি আর করা!

দোভাষীর বাড়ীতে খবর পাঠানো হল। সস্ত্রীক শ্রীসিং ও আমরা দু'জন এলাম তার বাড়ীতে। সরকারী বাড়ী পেয়েছে—জিরোতেই। এর মেজবৌকে দেখেছি নীচের পথ দিয়ে যাচ্ছিল যখন তার দোকানে। কাপড় চাদরের দোকান আছে একটি, সে নিজেই তা' দেখাশোনা করে, হিসাবপত্র রাখে। ফর্সা রং, লম্বা গড়ন, চৌকো চ্যাপ্টা মুখে একটা কর্তৃত্বের ছাপ। মহিলাটিই আমাদের অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো।

সরাসরি বলতে তো পারি না যে, দোভাষীর বৌদের দেখতে এসেছি। এদিক ওদিক তাকাই। সব মিলিয়ে তিনখানা ঘর। মেয়েরা ঘুরঘুর করছে ঘরের ভিতরে। কে কুমারী কে বিবাহিত বুঝতে পারি না।

একটি মেয়ে এলো, কোলে কচি শিশু। মেজবৌ বললো, এইটি তিন নম্বরের বৌ। আর একটি এলো—গর্ভবতী, এটি চার নম্বরের বৌ। আর একটি যুবতী এলো, সুন্দরী; এরা সবাই বেশ সুন্দর, তার মধ্যে এটি বিশেষ সুন্দর। একেই তো কাল সন্ধ্যায় দেখেছি স্কুলের মেয়েদের ফাংশনে ছাত্রীদের দলের সঙ্গে নাচতে। সবার মাঝখান থেকে চোখে পড়ে এ। এটি হ'ল দোভাষীর পাঁচ নম্বরের বৌ। এর এখনো সন্তানাদি হয়নি। আরো একটি কচি বৌ—সেও এমনি।

দোভাষীর সর্বপ্রথম বৌ—বড় বৌ, সে এখানে নেই। সে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে গেছে বাপের ঘরে। মেজবৌই এখন বড় সংসারে। তার হাতেই ভার সমস্ত সংসারের।

দোভাষী এঘর-ওঘর ঘুরছে ফিরছে। কখনো বাইরে চলে যাচ্ছে, কখনো ভিতরে ঢুকছে। সেদিকে তাকিয়ে সস্নেহে মেজবৌ বললো,—ও কোনো কিছু দেখে না, সব আমার হাতে। কি খাবে, কি পরবে, কোথায় শোবে সব আমাকে করে দিতে হয়। আমি হাতে তুলে না দিলে নিজে থেকে কখনো কিছু খাবেও না।

কথাবার্তায় মশগুল আছি, আর বৌদের দেখছি। অন্য দোভাষী এসে বলে ফেললো, স্যার, ঘরে এর আরো তিনটে বৌ আছে।

আরো বৌ? কই—দেখি দেখি।

গামছার মতো ছোট ছোট লুঙ্গি পরনে, ছোট ব্লাউজ গায়ে প্রায় একবয়সী বাচ্চা বাচ্চা তিনটে মেয়েকে এনে দাঁড় করিয়ে দিল সামনে। বাচ্চা মেয়েদের যেমন ফুলো ফুলো পেট হয় তেমনি পেটগুলি বের করে দিয়ে তিনটি বালিকা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো আর অচেনা মানুষ দেখে অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে দেয়ালের গায়ে গা মোড়ামুড়ি দিতে লাগলো।

মেজবৌ বললো,—এদের বয়স হয়েছে, তবে দেখতে বাড়েনি এখনো। তা' কি করা যাবে, ছোটকালে আনলে দাম কম লাগে। দেখতে দেখতে এরা গায়ে বেড়ে উঠবে।

দোভাষী একগোছা মালা বের করে আনলো। তিব্বতীদের কাছ থেকে কেনা। মোটা মোটা পাথরের মালা দেখিয়ে বলে, এটার দাম এক হাজার টাকা,

অর্থাৎ দুটো মিথন। বলে, এটার দাম দু' হাজার টাকা, অর্থাৎ চারটে মিথন। ছোট ছোট দানার মতো পুঁথির মালা এক থোকা দেখিয়ে বলে—এর এক একটা মালা এক একটা মিথন দিয়ে কেনা।

এই রকম মালা দিয়ে যে লোক বৌ কেনে তার নামডাক খুব। তার ঘরে মেয়ে দিয়ে মেয়ের বাপ ভাবে বড় ঘরে মেয়ে দিলাম। মেজবৌকে দেখিয়ে দোভাষী বলে, সবচেয়ে বেশী মালা দিয়েছি একে কিনতে।

মেজবৌও গর্বিত সেজন্য। ঠোঁটের কোণ টিপে হাসে। তার দাম আর সকলের চেয়ে বেশী।

দোভাষীর বর্তমানে দশটি সন্তান। ছোটয় বড়য় মিলিয়ে ঘরে কিলবিল করছে অরা।

দোভাষীকে নাকি শ্রীসিং জিজ্ঞেস করেছিলেন একদিন যে, এতগুলি বৌ সামলাও কি করে?

দোভাষী বলেছিল,—এ তো আর তোমাদের মতো নয়, আমাদের যার যত বেশী ক্ষেত, তার তত বৌর-এর দরকার হয়। নয়তো ক্ষেতে কাজ করবে কে?...

রাত অনেক হ'ল। ঘরে ফিরে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

চোখ বুজতে ভেসে উঠলো—স্কুলের ধারের সেই টিলাটি, নীল রঙের ফুলে ফুলে ভরা।

অতি ছোট গাছ, মৃদু সৌরভ মাখানো, লিলির মতো মাটি থেকে ওঠা একটি ডাঁটির মাথায় এক গুচ্ছ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীল রঙের ফুল। এই ফুল দিয়ে গাঁথা গোড়ে মালা একখানি দিয়েছিল স্কুলের মেয়েরা; আর দিয়েছিল পিচফুলের লাল টুকুটুকে মালা বেতের সুতোয় গাঁথা—সেই মালা দু'টির স্নিগ্ধ স্পর্শ বুকে এসে লাগলো। ঘুমিয়ে পড়লাম।

বহু জাতি নেফায়। জিরোতে আছে আপাথানী, ডাফ্‌লা। ডাফ্‌লাদের পরনে কালো রঙের লংক্লথ। গায়ে গরম জামা, পিঠে আপাথানীদের মতো ঝোলানো মোটা চাদর।

ডাফ্‌লারা কাপড় বেশী বোনে না। কালো রঙের থান কাপড় কিনে মেয়ে-পুরুষেরা পরে।

'দাপারিজো' আসতে পথে ডাফ্‌লাদের এক গ্রামে থামি। পথ হ'তে অনেকখানি উঁচুতে পাহাড়ের উপরে গ্রাম। দুই গাঁও-বুড়ী টেনে টেনে আমাকে নিয়ে উঠলো সেখানে শেষ পর্যন্ত। সময় মেপে চলা আমাদের। তাড়াহুড়ো ক'রে খাড়াই ভাঙতে ভয় ছিল প্রাণে।

এই ডাফলাদেরই হ'ল সত্যিকারের 'লং-হাউস'। লম্বা ঘর তো আপাথানীদেরও আছে। তারা এক পরিবার থাকে এক এক ঘরে, পুত্র পুত্রবধূ নাতি-নাতনীদের নিয়ে। আর ডাফ্‌লারা থাকে আট-দশ পরিবার মিলে একটা ঘরে।

খুঁটির উপরে লম্বা দোচালা ঘর, দু'মাথায় দু'টি মাত্র দরজা। ঘরের মেঝেতে মাঝখান দিয়ে পর পর যতগুলি উনুন—মানে ধুনি, ততগুলি পরিবারের বাস সে-ঘরে।

ঢুকলাম ঘরে এদের ঘরসংসার দেখতে। ঘরসংসার না দেখলে যেন এদের দেখা-জানাটা সম্পূর্ণ হয় না।

ঘরের একপাশে বেড়ার গায়ে শতাধিক হরিণ শুয়োরের চোয়ালের হাড়।

তাছাড়া আছে মিথনের মাথা, শুয়োরের দাঁত, হরিণের শিং। আগুনের ধোঁয়াতে কালিতে কালো হয়ে ঝুলছে সব। কালি এরা আটকায়ই বা কী করে? দিবারাত্রি ঘরে আগুন জ্বলে, বন্ধ ঘরে জ্বলন্ত কাঠের ধোঁয়ায় কষে মেলানো কালি; এ নয় যে হাতে লাগলো—ঝেড়ে মুছে ফেললাম। ঐ কালি যেখানে লাগলো—চেপে বসে গেল। বলেছিল হিরণ যে, আব্বার ঘরে যখন যাই, শত সাবধান হয়ে থাকলেও শাড়ীর এখানে ওখানে কালি লেগে যায়; তা' আর ওঠে না সহজে। এই কালি আর আগুন নিয়েই এদের জীবন, সুরু হতে শেষ পর্যন্ত।

কালিতে আর আলকাত্‌রার মতো কষে চিক্‌চিক্‌ করে উনুনের আলোতে সারাঘর, ঘরের চাল। মাংসের ডেলাটা কালো হয়ে ঝোলে মাচার উপরে।

ভাবি, এই যে এত আগুন এক এক ঘরে, বিপদ ঘটে না কিছু?

নেফাবাসী বন্ধু বললেন,—দৈব দুর্ঘটনা তো সর্বত্রই আছে। তবে এদের যেটা সাংঘাতিক বিপদ ঘটে তা' হচ্ছে শীতের সময়ে আগুনের উপরে যে মাচান আছে তা'তে এরা শিশুদের শুইয়ে রাখে। অনেক সময়ে শিশুরা গড়িয়ে আগুনে পড়ে যায়। এইভাবে শিশুমৃত্যু প্রায়ই ঘটে এখানে।

শুধু গৌরবর্ণ বললে ঠিক যেন বলা হয় না, যেন জ্যোতির আভা মেশানো রঙ এদের। এমন যে রঙ সবার—মাটিতে কালিতে চিটে ধরা হয়ে আছে। শিশু আর বালকবালিকাদের মুখ যেন কালচে 'প্লাষ্টার্সিনে' ঢাকা। চোখের জল, বৃষ্টির ফোঁটা লেগে মুখের দু' একটা জায়গার ময়লা একটু সরেছে কি মুছেছে—কালো মুখের মাঝে তাদের সেই আসল রংটিই লাগছে যেন শ্বেতী হয়েছে মুখে।

নাতিটা কাঁদছে, তাঁর দু' নাকের গড়ানো সর্দি গাঁওবুড়া আঙ্গুল দিয়ে টিপে নিয়ে বালকটির নাকে গালেই ঘষে দিল ভালো করে। সর্দিটা টেনে আর ফেলে দিল না বাইরে। এই কফে ভেজা মুখের উপরেই ধুলো পড়ল কালি লাগল;—এমনি করেই চললো। জলে ধুতে জানে না কিছু। বড়দের, বুড়োদের হাত পা'ও এমনিতরো।

এই হাতেই গাঁওবুড়া আমাদের 'আপং' খেতে দিল, সিদ্ধ ডিম দিল। ডিমটা খোলা শুদ্ধই দিল, যে যার ছাড়িয়ে নিলাম।

ডাফ্‌লারা আপাথানীদের চেয়ে বলিষ্ঠ, কর্মঠ। আপাথানীরা থাকে পাহাড়ের উপত্যকায়, সমতল ভূমিতে ক্ষেতে ধান চাষ করে। ডাফলারা থাকে পাহাড়ের উপরে, পাহাড় ঘুরে ঘুরে জুম চাষ করে। পাহাড়ে ওঠে নামে, পর পর পাহাড় ডিঙোয়; ডাফ্‌লাদের মেয়েরা তাই গোড়ালিতে বেতের রিঙ গেঁথে নেয় আঁট করে—মজবুত করে। এ রিঙ কেউ পা গলিয়ে পরে না মলের মতো, এবা একজন পা ছড়িয়ে বসে, আর একজন সেই পায়ে রিঙ বুনতে থাকে। গোড়ালির মাপে আঁটসাঁট বুনন দেয়।

পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল প্রৌঢ়া কয়জন। তাদের পায়ে রিঙ নেই, ছিঁড়ে গেছে পুরোনো হয়ে। রিঙের জায়গায় আঙ্গুল দুয়েক চওড়া কালো দাগ গোড়ালি ঘি'র কেটে বসে আছে। কতকাল পায়ে পরে ছিল রিঙ, মাংস আর পুরন্ত হতে পারেনি সেখানটায়।

ছেলেরা রিঙ পরে হাঁটুর নীচে, পায়ের 'মাসেলে'র ঠিক উপরটাতে। পাহাড়ে চলতে পায়ে জোর পায় এরা এইভাবে পা বাঁধা থাকলে।

বালকদের যাদের পায়ে এখনও রিঙ বোনা হয়নি, তাদের পায়ে সুতো বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কচি পায়ে এখনকার মতো এই সুতোর বাঁধই যথেষ্ট।

আপাথানীদের সঙ্গে ডাফলাদের চিরকালের ঝগড়া। মিথন নিয়ে ঝগড়া, নারী

নিয়ে ঝগড়া। আপাথানীদের মিথন চড়ে বেড়াচ্ছে উপত্যকায়; দেখ্ না দেখ্ ডাফ্‌লারা গিয়ে মিথন চুরি করে নিয়ে এলো। মেয়েরা বনে পাহাড়ে কাঠ কাটছে, মেয়ে তুলে নিয়ে এলো। তারপর লাগলো লড়াই। খোঁজ যদি পায় কোন্ গ্রামের লোক চুরি করেছে,—কে করেছে, তাকে নাইবা পাওয়া গেল, সেই গ্রামেরই কোনো একজনকে কেটেকুটে চুরির প্রতিশোধ নিয়ে নিল।

দু'পক্ষেই চলে এই রকম শোধবোধ নেওয়ার পালা। কিছুদিন আগে এই গ্রামেরই এক ডাফ্‌লা, রাত্রিবেলা শত্রুর গ্রামের এক মেয়ের একটা হাত কেটে নিয়ে এলো। সেই কাটা হাত নিয়েই উৎসব চললো এদের কয়দিন ধরে।

আপাথানী মেয়েদের উপর ঝোঁক বেশী ডাফ্‌লাদের। আপাথানী মেয়েরা ডাফ্‌লাদের চোখে সুন্দরী। এজন্য আপাথানী মেয়েরা নিজেদের মুখ কুৎসিত করার জন্য দু'নাকে টাকা সমান গোল কালো রঙের দুই কাঠের চাক্‌তি পরে থাকে। নাকটা গালের উপরে চওড়া হয়ে গড়িয়ে পড়ে মুখখানাকে বিকৃত করে রাখে। নাকের এই চওড়া ফুটো, কালো কাঠের চাক্‌তি—এ একটা চিহ্নও আপাথানী মেয়েদের। ডাফ্‌লাদের ঘরে গ্রামে, এই রকম নাকওয়ালা মেয়ে দেখলেই সহজে চেনা যাবে যে, এ আপাথানী মেয়ে।

যে পথে রওনা হবার কথা ছিল আমাদের, সে পথ বন্ধ পাহাড় ধসে। অনবরতই পাহাড় ধসে ঐ পথে। পথ কাটবার কালেও কতবার পাহাড় ধসেছে, কত লোক মারা গেছে। পথের ধারে ধারে তাদের নামে স্মৃতিস্তম্ভ হলুদ রঙের।

ঘুর-পথে আশি মাইল জীপে 'কিমিন' হয়ে 'লীলাবাড়ী' আসি। দুর্গম দেশ। এখান হতে উড়ো জাহাজে উঠবো। কলিঙ্গের মালবাহী এরোপ্লেন, স্থানে স্থানে খাবার পৌঁছে দেয়, সহর গড়তে মালমশলা এনে দেয়। এদেরই এক প্লেনে নিয়ে চলেছে বোঝাই করে লম্বা লম্বা লোহার পাইপ, কলের জলের জন্য। একপাশে খান তিন-চার চেয়ার আলগা বসানো। মাথার উপরে লম্বা একটা বাঁশ বাঁধা। এক হাতে সেই বাঁশ ধরে ধরে পাইপ ডিঙ্গিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসি।

জুমের চাষের আয়োজন চলেছে চারিদিকে। পাহাড়ের পর পাহাড় জ্বলছে, সেই ধোঁয়ায় ঘন জমাট কুয়াসার মতো ঢাকা সর্বত্র। পাইলট মুখে হাসি টেনে বললেন, এই সময়টাতে প্লেন চালানো বড় আতঙ্কের। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে পাহাড় এড়িয়ে প্লেন চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। পরিষ্কার সব দেখতে পাওয়া চাই। নইলেই বিপদ।

ছোট্ট প্লেন। নীচে উপরে তাকাই, মেঘে ধোঁয়ায় সব যেন মাখামাখি।

প্লেন ছাড়লো। লোহার পাইপগুলি হুড়হুড় করে গড়িয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। হাতের কাছে ঝোলানো একটা দড়ি দু'হাতে চেপে ধরে পা দুটো চেয়ারের উপরে তুলতে না তুলতে পাইলটদের রাখা খাবার জলের বড় গোল ফ্লাস্কটা পায়ের উপরে আছড়ে পড়লো। লোহার পাইপগুলির সঙ্গে চেয়ার কয়খানাও ডাইনে বাঁয়ে নাচতে লাগলো। প্লেন উপরে উঠলো। প্লেনের ডানা, দরজার পাল্লা ঝরঝর রব তুলে কাঁপতে থাকলো।

পঁচিশ মিনিটের পথ। ছোট্ট উপত্যকা। লোহার পাত-ফেলা ঘাসে ঢাকা রাণওয়ে; প্লেন এসে নামলো সেখানে।

এসে গেলাম 'দাপুরিজো'তে। ক্লান্ত হয়ে আছি। শীত উপত্যকার অন্ধকার। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। সারারাত ধরে ফোঁসফোঁস, ঘোঁতঘোঁত, হাঁচি-কাশি হরেক রকম আওয়াজ হ'তে থাকলো খাটের তলায়। রাত শেষ না হতেই হুটোপাটি ঠেলাঠেলি লাগলো একটা জমাট ভীড়ের।

সঙ্গে সঙ্গে ছাগল ভেড়ার ডাক, মুরগীর চীৎকার, কুকুর শুয়োর গাধার তান—সব মিলিয়ে এক প্রচণ্ড প্রভাত-সঙ্গীত।

কম্বলের ভিতর হতে মাথা বের করি। ছোট ছোট খুঁটির উপরে মাটি হতে হাত দুই-তিন উপরে তুলে ধরা বাঁশের তৈরী এই বাংলোবাড়ী। ছেঁচা বাঁশের বেড়া, চাটাইয়ের মেঝে, মাঝে মাঝে পাটাতন ফেলা। মেঝের সেই বাঁশের বুননীর ফাঁক দিয়েই দেখি।

বোধহয় এ তল্লাটের চরে বেড়ানো যত ছাগল ভেড়া কুকুর শুয়োর মুরগী। গাধা সব এসে ঠাসাঠাসি করে আশ্রয় নিয়েছিল এই বাড়ীটার নীচে—রাত্রিবেলা। বিরাট একটা দল। শুয়ে শুয়েই দেখছি—সাফ হয়ে গেল তলাটা।

মেঝের যেখানটায় পাটাতন ফেলা, সেখানে পাটাতনের ফাঁকে ফাঁকে ভোরের আলোর লম্বা লম্বা ডোরা দেখা দিল। উঠে পড়লাম।

সরকারী বাংলো। মুরুব্বি লোক যাঁরা আসেন এইখানেই থাকেন। বিশেষ ভাবে তৈরী তাই বাঁশের বুননের চাটাইয়ের বেড়া মেঝে। আড়াল নেই তেমন। এঘর ওঘর, সব চলাচল দেখা যায় বেড়ার দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে। সকলের কথা এসে পোঁছোয় সকলের কানে।

দাপরিজো পাহাড়ে-ঘেরা পাহাড়ী জায়গা হলেও খুব বেশী উঁচু জায়গা নয়। তবে বড় শীত। এখন ফাল্গুন মাসের শেষ দিক, তবু শীতে ঠক্‌ঠক্ কাঁপছি। মেঘ বৃষ্টির জন্য এত শীত বোধহয়।

ক'বছর আগেও পথ বাড়ী কিছু ছিল না এখানে। এখন জীপ চলে এমন পথ বহু হয়েছে পাহাড় ঘিরে। ছোট্ট একখানি উপত্যকায় নতুন সহর দাপরিজো। সরকারী লোকেরই বাস এখানে বেশী—জিরো সহরের মতো। কিছু দূরে দূরে পাহাড়, পাহাড়ের ভিতরে ছোট্ট ছোট্ট উপত্যকায় 'গালং'দের গ্রাম।

গালংদের জামাকাপড় অনেক পরিষ্কার, ঝরঝরে। রোদ্দুরের দেশ। ধারার জলে মাঝে মাঝে স্নানও করে এরা, মেয়েদের পরনে হাল্কা লুঙ্গি, গায়ে ব্লাউজ। মেয়েদের লুঙ্গিকে বলে 'গালে', ছেলেদের হাতকাটা কোটকে বলে 'গানুক'। ছেলেদের পরনে সাদা সুতোর কাপড়ের লেংটি। লেংটির একটি আঁচল সামনের দিকে ঝুলিয়ে রাখা। গায়ে লম্বা জামা, কখনো সুতির কখনো উলের। মাথায় বেতের বোনা টুপী। সমস্ত নেফার লোকেদের বেতের কাজ বড় সুন্দর; যেমন মিহি কাজ তেমনি নিপুণতা তায়।

ছেলেদের পিঠে থাকে বেতের বোনা—'গানি-ব্যাগ'। ঘাড় হতে বেতের বেল্টে কোমরে ঝোলে তলোয়ারের মতো লম্বা দা, বুকে ঝোলে ছোরা—বেতের বোনা খাপে ভরা।

ছোরা, তলোয়ারের খাপ নিয়ে এদের বড় সখ। কেউ তার খাপে মিহি বেতের নক্সা তোলে, কেউ তাতে বাঘের দাঁত দিয়ে সাজায়, কেউ বা বাঁদর বনবিড়ালের চামড়া দিয়ে মোড়ে খাপ। মাথার টুপীতেও তাই—নিজ নিজ পছন্দে নিজ নিজ টুপী সাজায়।

বনবিড়ালের গায়ে চিতাবাঘের নক্‌শা। গড়নে বিড়াল, আকারে বিড়ালের চেয়ে একটু বড়, অতিশয় দুষ্টু প্রাণী। মুরগীর উপর এদের বিশেষ লোভ। মুরগী যারা পালে তারা অতিষ্ঠ এদের যন্ত্রণায়। এদের দেখলেই লোকে তীর ছোঁড়ে; মারতে পারলে বড় খুশী হয়।

লোকেরা ক্ষেতের ইঁদুর খেতে খুব ভালোবাসে। একটা ইঁদুর দেখলো তো হৈ হৈ করে সবাই ছুটলো। ইঁদুরটাকে ধরে প্রথমেই গলা টিপে দেয়—দিয়ে,

পিঠে বাঁধা টুকরীতে ফেলে রাখে। এই টুকরীকে বলে 'নাড়া'—এই 'নাড়া'য় ইঁদুর মেরে মেরে ফেলতে থাকে। ঘরে এসে ইঁদুরগুলি আগুনে পুড়িয়ে শক্ত কালো কয়লার মতো বস্তু হ'ল যখন—তখন কামড়ে চিবিয়ে খেয়ে নিল। কাঁচা বাঁশের চোঙার ভিতরে ইঁদুর ভরে পুড়িয়ে নিয়েও খায়।

গালংদের ঘরের চালে 'টোকা' পাতার ছাউনী। তালপাতার মতোই পাতা, শুধু তালপাতার চেয়ে একটু ছোট, একটু নরম।

দাপরিজো হতে কিছু দূরে উপরে 'গালং'দের একটি গ্রাম। ভিজে ভিজে মাটির স্যাঁতসেঁতে পথ, দু'ধারে সবুজ গাছগাছড়ার জঙ্গল।

জঙ্গল ভেদ করে গ্রামে ঢুকলাম; যেন ঝলকে ঝলকে আলো ঝলমল করে উঠলো। গাঁয়ের সব লোক এসে জমেছে সেখানে। মেয়েদের সকলের পরনে টকটকে হলুদ, লাল লুঙ্গি। জায়গাটা যেন আলো হয়ে আছে—সবুজের মাঝে তাদের বসনের উজ্জ্বল রঙে।

জঙ্গলের মধ্যে একটি ছোট উপত্যকায় গালংদের এই একটি অতি ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের মুখে সবুজ বাঁশ কেটে গেট বানিয়েছে, দু'ধারে মেয়েরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে। সাদা মুরগীর নরম পালকের মালা দিয়ে তারা অতিথিদের অভ্যর্থনা করলো। অতিথিদের মাঝখানে রেখে সকলে নাচতে-নাচতে গাইতে-গাইতে নিয়ে চললো গ্রামের ভিতরে।

কাছের ও দূরের নানা গ্রামের মোড়ল, গাঁওবুড়া—তারাও এসেছে এখানে। সবার সঙ্গে এখানেই এক জায়গায় দেখা হবে, কাজের কথা হবে, এই ব্যবস্থা হয়েছে। এরাও আজ এই গ্রামের অতিথি।

গ্রামের ক্লাবঘরের সামনের আঙিনায় ব্যবস্থা হয়েছে অতিথি, মুরুব্বিদের বসবার। রেল ষ্টেশনে যেমন পিঠ ঠেস দিয়ে বসার কাঠের বেঞ্চি থাকে, তেমনি বেঞ্চি বানিয়েছে আজই গোটা গোটা তাজা বাঁশ কেটে। নতুন টেবিল বানিয়েছে সবুজ বাঁশের। তাজা বাঁশের সৌরভে ভরপুর জায়গাটা। অতিথিরা মুরুব্বিরা সবাই বসলো বেঞ্চিতে পা' ঝুলিয়ে পিঠ ঠেস দিয়ে আরাম করে। জন পঞ্চাশ এরাই হবেন। সবার হাতে সবুজ বাঁশের চোঙায় 'আপং'। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ কেটে কেটে সবুজ গেলাশ বানিয়ে দিচ্ছে সবার হাতে। সবুজ বাঁশ, কাঁচা বাঁশ। দা-এর এক এক কোপে তেরছা করে কাটা বাঁশের মুখের দিকটা। সেদিকে মুখ লাগিয়ে চুমুক দিয়ে খেতে সুবিধে; গড়িয়ে পড়বে না হাতে গায়ে। দা দিয়ে কাটলো বাঁশের গ্লাশ, ছুরিটা দিয়ে চোঙার সবুজ গা'টা একটু এদিক ওদিক করে চেঁছে দিল—সুন্দর ধানছড়ার নক্সা হয়ে গেল গায়ে। সবুজের ভিতরে সাদা বাঁশের রূপ রেখায় রেখায় ফুটে ফুটে উঠলো।

অতিথি আজ আমরাও। আমরাও বসেছি সবুজ বাঁশের শীতল বেঞ্চিতে, সামনে সবুজ বাঁশের টেবিল। 'আপং'-এর গেলাস আমাদের হাতেও তুলে দিয়েছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছি গেলাস; আমাদের গেলাসগুলিতে আরো বেশী মিহি নক্সা। কিন্তু কত তাড়াতাড়ি তৈরী করলো এরা—করে চলেছে, চোখের সামনেই দেখছি। দেখছি আর আনন্দে খুশী হয়ে উঠছি।

ঝুড়িতে করে এলো একমাপে মোড়া কলাপাতার সবুজ সবুজ ছোট ছোট প্যাকেট। সকল অতিথির হাতে একটি করে প্যাকেট তুলে দিল। প্যাকেটে আছে রান্নাকরা মাংস, আপং-এর সঙ্গে খাবার। কেরোসিনের টিন ভরা আপং এনে গ্রামের যুবকরা লাউ-এর হাতা ভরে ঢেলে ঢেলে দিতে লাগলো সবার গেলাসে। দেখতে দেখতে চার টিন আপং শেষ হয়ে গেল আধঘণ্টার মধ্যে।

যেদিকে তাকাই চোখ জুড়ানো সবুজ। মাটি ঢেকে আছে সবুজ ঘাসে। এই সবুজের মাঝখানে লাল লুঙ্গি পরা মেয়ের দল নাচ সুরু করে দিল। মনে হ'ল যেন সবুজ বনের মাঝখানে একটা শিমুল গাছের ডালে ডালে লাল ফুল ফুটে উঠলো।

গানংদের বাজনা নেই। তলোয়ার হাতে নিয়ে নাড়ে; হাতলের কাছে লোহার একটা ঢিলে চাক্তি থাকে, নাড়লে ঝন্ঝন্ করে। মূল গায়েন তলোয়ার হাতে চাক্তিতে ঝন্ঝন্ শব্দ তোলে, সেই তালেই সে মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুরে সুরে এক এক লাইন গায়, অন্যরা তাকে ঘিরে সুরে সুরে নাচে আর তার গাওয়া গানের সুর ধরে।

গোল হয়ে নাচে। কখনো হাত ধরাধরি করে, কখনো দু'হাত দু'পাশে দুলিয়ে। ধীর শান্ত নাচ। গান যেন গুঞ্জন।

উৎসবে, আনন্দে তো নাচেই এরা, অতিথি এলেও নাচে, অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে। তাই প্রতি লাইনে গান করে করে বলছে 'পুনুং একে ইয়ামি'; মানে এই নাচের দ্বারা যারা নাচছে তারা 'নিগমুনে জয়হিন্দ',—অতিথিকে জয়হিন্দ বলছে। নাচ দিয়ে নাচিয়েরা অতিথিকে নমস্কার করছে।

বালক-বালিকারা তফাতে দাঁড়িয়ে নাচ দেখছে। সবার পিঠে বাঁধা একটি করে শিশু ভাইবোন। মা'রা দিদিরা নাচছে, তাদের পিঠের শিশু এরা বহন করছে। শিশুগুলি ছোট্ট ছোট্ট চোখে কুত্ কুত্ করে তাকাচ্ছে। একটি শিশু তার বালক ভাই-এর পিঠের দিকে ঝুলে পড়া গলার মালাটা একমনে চিবিয়ে দু'হাতে টেনে ছিঁড়বার চেষ্টা করে চলেছে।

ছোটদের কোমরে কাঁসার করতালের মতো গোল চাক্তির মালা। চলে যখন ঝম্ঝম্ শব্দ হয় ছোট মেয়ের লুঙ্গির ভিতর হতে। জিরোতেও দেখেছি স্কুলের মেয়েরা এলো কোমরে ঝম্ঝম্ আওয়াজ তুলে।

পাশেই কতকগুলি খুঁটির উপরে সুদৃশ্য একটি গোল ঘর, এটি যুবকদের ক্লাবঘর, নাম 'মুসুপ'। মেয়েদের ক্লাবঘরের নাম 'রাসেং'।

মাত্র কয়েকখানি বাড়ী নিয়ে এই গ্রাম। পরিষ্কার গ্রাম। ঘাসে ঢাকা, যেন ঘন সবুজ লনের উপরে এখানে ওখানে উঁচু উঁচু খুঁটির মাথার উপরে বাড়ীগুলি।

গ্রাম দেখতে উঠলাম। 'আপং' খাওয়া শেষ হয়নি সবার। গ্রাম দেখে এসে আবার আপং খাবে অনেকে। গাঁওবুড়ার ইঙ্গিতে কয়েকটি যুবক কাছের গাছ হ'তে কতকগুলি বড় বড় পাতা ছিঁড়ে এনে গেলাসের মুখগুলি ঢাকা দিল। কোমরের দা দিয়ে কোপ মেরে বাঁশ কেটে একটা লম্বা টুকরো বের করে আনলো। বুকের ছুরি দিয়ে সেই বাঁশ থেকে সরু সুতোর মতো আঁশ বের করলো। সেই আঁশ জড়িয়ে পাতা ঢাকা দেওয়া গেলাসের মুখগুলি বেঁধে রাখলো। মাছি পোকা না বসে যাতে। ঝটিতিই করলো সবকিছু। এরা যেন চলতে চলতে বাঁশ কাটে, বেত কাটে, তার সুতো তোলে, মালা গাঁথে, বেড়া বাঁধে। সবই অতি সহজ। পায়ে চলে বেড়াবার মতোই সহজ।

এদের বাড়ীর ভিতরটা দেখতে উঠলাম এক বাড়ীতে সিঁড়ি বেয়ে। বড় চৌকো বাড়ী, ভিতরে একখানাই চৌকো ঘর, ঘর ঘিরে ঢাকা বারান্দা—সবই ঐ একখানা চৌকো চালের নীচে। চালটা ঘরের মেঝে পর্যন্ত নোয়ানো। বাঁশের মেঝে, বেড়ার দেয়াল। প্রচুর জায়গা ঘরের ভিতরে। অবস্থাপন্ন মোড়লের বাড়ী এটি। একতলার মতো উঁচু খুঁটির উপরে বাড়ী; অনেকগুলি খুঁটি, খুঁটিতে খুঁটিতে প্রায় ঘেরা নীচের তলাটা। সেখানে ভাগে ভাগে থাকে গরু ছাগল ভেড়া শুয়োর—

এইসব।

ঘরে মিথুনের মাথা, শুয়োরের চোয়াল দাঁত একগাদা। যখন যা' মারে, খায়, তাদের মাথার হাড়গুলি ঘরে সাজিয়ে রাখে। এইগুলিই ঘরের শোভা, গৃহের মান।

ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। ধুনিতে কাঠের আগুন, সেই আগুনের আলোয় দেখা যায় ঘর। আগুনের উপরে মাচাতে শুকোচ্ছে ধান, ধানের উপরে বাঁশের ঝুড়িতে 'স্মোক্ড্' হচ্ছে মাংস। বাঁশের 'শেল্ফ', কাঠের হুক বেড়ার গায়ে গায়ে। দাঁড়িতে ঝুলছে কম্বল, চাদর, গরম গাত্রবস্ত্র।

ঘরের মাঝখানে চৌকো বাঁধানো জায়গা ঘিরে জ্বলছে যে ধুনি, তার আগুন ঘিরে ছড়িয়ে থাকা বাসি ছাইয়ের উপরে গা' এলিয়ে ঘুমুচ্ছে, খেলা করছে গোটা পাঁচেক কুকুরছানা। শিশুর আদরে ঘরেই থাকে এরা, ঘরময় খেলা করে বেড়ায় বড় না হওয়া পর্যন্ত।

এক ডাল হতে যেখান দিয়ে আর একটা ডাল বের হয় সেই জায়গাটুকু কেটে চেঁছে সুন্দর সুন্দর হুকের মতো করে নেয় এরা। কখনো বা চওড়া কাঠ হতে কেটেও করে। হুকে ঝোলানো বড় বড় বাঁশের চোঙা। এতে থাকে 'আপং', থাকে জল, থাকে ধানকোটা চাল। বেড়ার গায়ে বাঁশের থাক—তাতে থাকে খাবার বাসন, রান্নার সরঞ্জাম। ঘরের একধারে শোবার ব্যবস্থা। কম্বল গদ্দা ঝুলিয়ে আলাদা করা, যেন পর্দা দিয়ে ঘিরে ঢাকা। মোটা পাতার বোনা নরম চাটাই পেতে তার উপরে কম্বল গদ্দা বিছিয়ে ঘুমোয়। বোন, মেয়ে, কুটুমবাটুম এলে তাদের জন্যও ঘরের এক এক কোণা এমনি করে ঘিরে দেয়।

ঘরের সামনে এগিয়ে যাওয়া বাঁশের লম্বা মাচা,—খানিকটা ঢাকা বারান্দা, খানিকটা খোলা বারান্দার মতো। ঢাকা বারান্দার একধারের চালে বাঁশের তৈরী মুখবন্ধ জালি টুক্রী পর পর ঝোলানো। মুরগী থাকে রাত্রিবেলা এক একটায় এক একটা।

সুন্দর ব্যবস্থা সবকিছুর। ধানকোটার উদ্খল কুলো ডালা সবকিছু সাজানো আছে। অন্ধকার ঘর হলেও ততটা অন্ধকার নয়, যতটা দেখেছি আপাথানী ডাফ্লাদের। এরা যেন অনেক 'ফ্যাশনেবল্'।

ভোরবেলা ভাত রান্না করে খেয়ে নিয়ে সবাই চলে যায় ক্ষেতে কাজ করতে। ঘরে থাকে শুধু অথর্ব বৃদ্ধ বৃদ্ধারা, আর কচি শিশুরা। মা' বুকের দুধ খাইয়ে কচি শিশুকে সারাদিনের মতো ঘরে রেখে গেল, বুড়ী ঠাকুরমা মুখে 'আপং' নিয়ে শিশুর মুখে দিয়ে দিয়ে শিশুর পেট ভরা রাখলো। গরুর দুধের বদলে 'আপং' খাইয়েই রাখে এরা শিশুকে। ঝিনুক চামচের ব্যবহার জানে না, শিশুর মুখে মুখ লাগিয়ে খাওয়ায় শিশুকে। শিশু ভাতও খেতে শেখে এম্নি করে। মা ঠাকুরমা মুখে ভাত নিয়ে চিবিয়ে সেই মণ্ডভাত শিশুর মুখে দেয়। ধীরে ধীরে মাংস সবজি সবই এইভাবে খেতে শেখে সবাই শিশুকালে।

কাঠির গোছা দিয়ে এরা হিসাব রাখে জমির, হিসাব রাখে চাষের।

মোড়লের বুড়ীমা হাঁউ-মাঁউ করে কেঁদে উঠলো। তার মেজছেলে কয়দিন আগে মারা গেছে। চোখে ভালো দেখতে পায় না, কে এসেছে বুঝতে পারছে না। নতুন কোনো সাড়া পেলেই সদ্য শোক উথ্লে ওঠে মা'র বুকে। বাইরে ঘাসের উপরে ঘরের প্রায় গা-লাগা কয়েকটা বাঁশ পোঁতা। ছেলেকে কবর দেওয়া হয়েছে ওখানে।

মোড়লের বুড়ো বাপ বেড়ার গায়ের মাচা হতে কাপড়ের একটা থলি এনে মেঝেতে উপুড় করে ঢালেন। তার মূল্যবান সম্পত্তি এনে মেলে ধরেন আমাদের

সামনে। গৃহে অতিথি এলে গৃহকর্তা তার সম্পত্তি দেখায়। এই-ই রীতি এদের। এই সম্পত্তি দিয়েই ধনী-দরিদ্র নির্ধারিত হয়। বুড়ো দেখান একটি ছোট তিব্বতী কাঁসার ঘণ্টা, অনেকদিনের—এখন কাঁসা কালো হয়ে গেছে। বলেন, 'এটার দাম পাঁচশ' টাকা'। একটা তিব্বতী কাঁসার বালা দেখান, বলেন, 'এটার দাম হাজার টাকা'। হাজার টাকা মানে দুটো মিথন। একটা সাধারণ তিব্বতী তলোয়ার,—তার দাম একটা গরু—অর্থাৎ দুশ' টাকা। মালার চেয়ে ধাতব দ্রব্যের দাম বেশী।

গালং-এর দোভাষী, 'তাতোরিবা' নাম, তাতোরিবা বড় একটা মুখখোলা ধাতুর তিব্বতী হাঁড়ি দেখালো। বললে, ওর এক বৌর সঙ্গে এসেছে এটা। ওকে এটার জন্য দিতে হয়েছিল দু'দুটো মিথন। বৌর সঙ্গে এমনিতরো সম্পত্তি এলে সেই বৌর বড় খাতির স্বামীর ঘরে। জিরোর দোভাষীর বর্তমান বড়বৌর সঙ্গেও এমনি সম্পত্তি এসেছিল—কতকগুলি পাথর ও পুঁথির মালা। যার জন্য সর্বক্ষণ বৌর গর্ব। যদিও মিথন গরু দিয়ে দাম শুধতে হয়, তবু ঐসব সম্পত্তি ঘরে রাখায় মর্যাদা বাড়ে অনেক।

তাতোরিবা হাঁড়িটা দেখিয়ে বললো,—এটা সে তার মেয়ের সাথে দিয়ে দেবে মেয়ের বিয়ের সময়ে, মূল্য বাবদ নেবে দশটা মিথন। জিনিষ দিয়ে মিথন কাটাকুটি করে। যেমন পাঁচ মিথন কন্যাপণ; একটা ঘণ্টা দুই মিথন, একটা মালা এক মিথন,—বাকী রইলো দুই মিথন। তখন দুই মিথন দিয়ে কন্যাপণ শোধ করে।

মেয়েরা সবাই ছোটখাটো গড়নের। আসবার সময়ে তাদের একটি লুঙ্গি আমাকে উপহার দিতে এলো। শাড়ীর উপরেই লুঙ্গিটা কোমরে জড়িয়ে দিতে গিয়ে মেয়েটি হেসেই লুটোপুটি। লুঙ্গিতে সবটা বেড় এলো না।

বনের ভিতর দিয়ে সেই পাথুরে নালা পেরিয়ে চলেছি। ছোট ছোট খুঁটির উপরে আধখানা করে চেরা লম্বা লম্বা বাঁশের নলে ধরে উপরের ঝরণার জল দূর হতে কাছে এনেছে। পিঠে ছুঁচোলো বেতের ঝুড়িতে তিন চারটে মোটা বাঁশের চোঙা। চোঙায় জল ভরে ভরে নিচ্ছে কয়েকটি মেয়ে।

অন্ধকার হয়ে আসছে। এই বন দিয়েই গিয়েছি যাবার সময়ে। এখন বুনো গন্ধে ছেয়ে আছে পথ। সন্ধেবেলা কি নিঃশ্বাস ছাড়ে বন?

হয়তো কাছাকাছি ঝড় হচ্ছে কোথাও, তীক্ষ্ণ হাওয়া বইছে এখানে। হয়তো বরফ পড়েছে কাছের কোনো উঁচু পাহাড়ে, হাড় কাঁপানো শীতে অঙ্গ কাঁপছে আমাদের। দাপরিজোর আকাশে পাহাড়ে রোদের ঝিলিক মেঘের খেলা দুই-ই আসছে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

বসে আছি তৈরী হয়ে। প্লেন আসবার কথা, এলেই চলে যাবো। সময় গড়িয়ে গেল প্লেনের দেখা নেই।

দাপরিজো নেফার পাহাড়ের ভীড়ের মধ্যে একটি ছোট্ট উপত্যকা। এক টুকরো বসতি। সরকারী প্রশাসনের একটি ছোট টুকরো এখানে স্কুল হাসপাতাল ইত্যাদি নিয়ে। বাইরের সঙ্গে খবরাখবর নিতে কোন ব্যবস্থা নেই। সপ্তাহে রবিবারে শুধু যাত্রী নিয়ে প্লেন আসে, সেই সঙ্গে আসে এখানকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য, খাদ্য; আর আসে মাছ। সেদিন ভীড় লেগে যায় কিছুক্ষণের জন্য প্লেন ঘিরে, আর মাছের দোকানে মাছের টুকরো নিয়ে। এক রবিবার প্লেন না এলে সেই আর-এক রবিবার পর্যন্ত থাকতে হয় অপেক্ষায়।

এই বাড়ীর সীমানা ঘেরা বেড়ার ধারেই প্লেনের ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড। মনে হয়

যেন এই বাড়ীর বাগানেরই লন। বসে আছি বারান্দায়। প্লেন এলে ঘর হতে বেরিয়ে মোটর গাড়ীতে উঠবার মতো প্লেনে উঠে বসবো আর কি।

আমাদের চোখ আকাশের দিকে—ঐ বুঝি প্লেন আসে। প্লেন এসে নামবার আগে হুইসিল দেয়। ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে গ্রামের গরু ঘোড়া চরে বেড়ায়, ছাগল শুয়োর ঘাস কাদা খায়। লোকেরা মাঠের উপর দিয়ে কোনাকুনি পায়ে-চলা-পথে পথ সংক্ষেপ করে চলাচল করে। হুইসিল শুনে তাড়াতাড়ি তখন ছাগল ঘোড়া তাড়িয়ে লোক ছুটোছুটি করে মাঠ ফাঁকা করে দেয়। প্লেন নামে।

মেঘের ফাঁক হতে হুইসিল দিল না কেউ আজ সারাদিনমানে।

সাড়ে চারটা বাজতেই অন্ধকার নেমে এলো। আজকের মতো আকাশ হতে দৃষ্টি নামিয়ে নিলাম। যে প্লেন আজ এলো না, সে আর আসবে না এ কয়দিন। আসবে আবার আর-এক রবিবারে, তাও আকাশে পরিষ্কার পথ পেলে।

তবু আশা মনে, ততদিন আমাদের ফেলে রাখবে না এখানে। প্রায়ই এসব দিকে ছোট প্লেন, হেলিকপটার আসে, আউটপোস্টে উপর হতে খাবার ফেলে দিয়ে যায়। তাদেরই কেউ আসবে হয়তো আমাদের তুলে নিতে। কিন্তু খবর পাঠানো যায় কি করে?

বলেছিলেন মেজর স্মিথ তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা. যে, 'চীন যখন আমাদের আক্রমণ করলো, সে সময়ে চীনেরা যত এগিয়ে আসছে আর আমরা পাহাড়ে পিছু হটছি। দলে দলে লোক রাত্রে ছুটে চলেছি। শীতে আগুন জ্বালতে পারছি না, শত্রুপক্ষ দেখে ফেলবে। ঘুম নেই, খাবার নেই। কয়দিন বাদে একটা প্লেন এলো, আমাদের জন্য খাবার ফেললো। সেখানে বসে খাবার খেয়ে জিরোবারও উপায় নেই; শত্রুপক্ষরাও তো দেখছে কোথায় খাবার ফেলা হচ্ছে প্লেন হতে। কোনো মতে খাবারের প্যাকেট বান্ডিল কুড়িয়ে আবার ছুটছি—

মনে হতে লাগলো কেবলি সেই নিরাশ্রয় ক্লান্ত ক্ষুধার্ত জোয়ানদের কথা। সেদিন তারা একখানি প্লেনের আওয়াজের জন্য কী উদ্‌গ্রীব হয়েই না থাকতো আকাশে লক্ষ্য রেখে, দিনের পর দিন গভীর বনে, দুর্গম পর্বতে, বালুভরা শুষ্ক মরুভূমিতে।

শ্রীযুক্ত মার-এর বাড়ীতে কাটে সন্ধ্যেটা। গেরিলা বাহিনীর এক শিক্ষক ইনি। দাপারিজোতে মিলিটারী এরিয়ায় থাকেন। গাছ কেটে বন পুড়িয়ে এদিকটা বাসযোগ্য করা হয়েছে। পরিষ্কার এক টিলার উপরে শ্রীমার-এর বাড়ী; বাঁশের বাড়ী, বাঁশের বেড়ার ছোট ছোট ঘর, ঝাঁপ। ডাল কেটে কেটে হয়েছে বারান্দার রেলিং। পাথুরে মাটির উপর বাঁশের চাটাই ফেলা মেঝে। চলতে ফিরতে মচ্‌মচ্‌ করে। এই চাটাইর মেঝের নীচে ঢুকেছিল সাপ কয়দিন আগে। লন্ঠনের আলো,—এককোণায় আলো পড়ে তো অন্য কোণায় অন্ধকর ছড়ায়। ফোঁস ফোঁস শব্দে এদেশী ভৃত্য টের পায়, মনিবকে বলে। শ্রীমার আন্দাজে শব্দ লক্ষ্য করে বন্দুক ছোড়ে। সাপটা সত্যিই মরে। পরে টেনে বের করে যখন আনা হ'ল দেখা গেল প্রকান্ড এক গোখ্‌রো সাপ।

মার-এর তাগিন স্ত্রী। চৌদ্দটা মিথন দিয়ে এই স্ত্রী আনতে হয়েছে ঘরে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি। মার হ'ল লুসাই, স্ত্রী তাগিন। এখন লুসাই ভাষা শিখে গেছে, লুঙ্গি ছেড়ে ফ্রক পড়ে। স্বামী ধর্মে খৃষ্টান।

অস্থায়ী বাড়ী। ছোট্ট, ছবির মতো বাড়ী। বাইরে অন্ধকার রাত্রি। বারান্দায় চাল হতে ঝুলছে একটি কেরোসিন লন্ঠন। ঘর হতে বারান্দায় এসে বসলাম। নীচে সুবনসিরি নদী ঘুরে গেছে খানিকটা। দূরে বাঁকের মুখে বালির চরা—

কুশাসনের আসন একখানি যেন।

নতুন পথ তৈরী হবে নদীর ধার ধরে। দলে দলে লোক পাথর ভাঙ্গছে রাত পর্যন্ত। পাথর ভাঙার শব্দ উঠে আসছে উপরে, যেন তালে বেতালে জলতরঙ্গ বাজছে।

আরো এক সন্ধ্যে কাটলো। এরপরও যদি থাকতে হয় সন্ধ্যেটা কাটাবো কোথায় ঠিক করে রাখি মনে মনে। দিনের জন্য ভাবনা নেই, দিনে তো প্রতি পলে প্রতীক্ষা। এই ঘাসে ঢাকা রাণওয়েটুকু ছেড়ে দু'পা দূরে যাবার উপায় নেই, দূরে কাছে কত গ্রাম কত বস্তি। যদি জানতাম কবে প্লেন আসবে তবে ঘুরে ঘুরে দেখতে পারতাম, দেখে আনন্দে থাকতাম। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। শুধুই চেয়ে থাকা, শুধুই বসে থাকা এক ঠাঁই সন্ধ্যেতক্।

বাংলোর সামনে এগিয়ে আসা চৌকোনা চারদিক-খোলা মাথা-ঢাকা বারান্দা। এই বারান্দায়ই বসে থাকি, আকাশ দেখি; আর আমাদের দেখতে ভীড় করে আশেপাশের পাহাড়বাসীরা। দেখতে দেখতে কয়েকজনের মুখ চেনা হয়ে গেছে, কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হয়েছে।

আজও এসেছে সেই গালং। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হবে তার। চমৎকার স্বাস্থ্য, সবল দেহ। ভীষণ তার রাগ,—সে মীমাংসা চায়।

কিসের মীমাংসা?

সে বলে যে, সরকার তরফের লোক নাকি তাকে দিয়ে খানিক রাস্তা বানাবার কাজ করিয়েছিল। তার হিসাবে দশ হাজার টাকা পাওনা। ওভারসিয়ার বলে, তা' নয়, তিন চারশ' মতো টাকার কাজ করেছিল, ওকে সে টাকা দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

খুচরো টাকার হিসাব এরা বোঝ না। বোঝে একশ' পাঁচশ' এক হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার। এর মাঝামাঝি অঙ্ক এদের জানা নেই।

ক্রুদ্ধ গালং মানে না। বলে, দশ হাজার দিবে বলেছিল, টাকা না দিলে আমি ওর মাথাটা কাটি লিব।

অতি সহজেই বললো একথা। কাটাকাটি অতি সহজ জিনিষ। শিশুকাল হ'তে দা' ছুরি নিয়ে খেলা যাদের।

অভীকের মতো ছোট্ট একটি ছেলে; উলঙ্গ, মোটা পেটটা সামনে এগিয়ে দিয়ে মনের আনন্দে একটা লিক্‌লিকে দা দু'হাতে মুখে তুলে কামড়ে কামড়ে চলেছে পথ দিয়ে। এখন এদের গ্রীষ্মকাল। জামাকাপড় গা' হতে ঝ'রে পড়েছে অনেক।

এদের পুরুষদের দাড়িগোঁফ হয় না মুখে। গালংরা মাথায় লম্বা চুলও রাখে না। সকলেরই চুলে এক ছাঁট, বাটি বসানো ছাঁট, যেন কালো একটা বাটি উপুড় করা মাথার উপরে। ঘাড় কানের পাশ চেঁছে সাফ করা। হাত পা এদের পরিষ্কার, মাটি ময়লা চেপ্টে নেই। মাথায় শোলার হ্যাটের মতো বেতের টুপী, দু'দিকে একটু কোণা বের করা। মেয়েরা পুঁতির মালা পরে না অতো ডাফ্‌লা আপাথানী-দের মতো। ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ের দল। ছেলেরাও তেমনি বলিষ্ঠ, সুন্দর।

সব রকমের কাজই করে এরা দা দিয়ে। চুল কাটে—তাও দা দিয়ে। কাঁচির ব্যবহার জানে না এরা। কিন্তু দা দিয়ে কি করে মাথায় চুলে ছাঁট দেয়—কাটে? ততোরিবাকে বলি, দেখাবে একটু, কি করে কাটে চুল?

ভীড় তো লেগেই আছে আমাদের ঘিরে, ততোরিবা হাঁক দিল,—কার লম্বা চুল আছে এগিয়ে এসো।

এখন এরা যেন একটু সচেতন হয়েছে নিজেদের নিয়ে। যুবকরা যেন লজ্জা

পেল ততোরিবার ডাক শুনে। এড়িয়ে এড়িয়ে সরে দাঁড়াতে লাগলো। যুবকদের মাথায়ই একটু লম্বা চুল, তারাই এযুগের সোখীন লোক। তারা কেউ রাজী হল না মাথা পেতে দিতে। বন্ধু ইউসুপ—বড় ঘরের ছেলে, বড় কাজ করে। সাজ-সজ্জার বালাই নেই। এদের 'গানুক' পরেই ঘুরে বেড়ায়, অফিসে যায়। ইউসুপ মৃদু হেসে চুলে হাত বুলোতে বুলোতে এগিয়ে এলেন, বললেন, আমার চুল-গুলি সত্যিই বড় হয়ে গেছে, কাটা দরকার।

ততোরিবা দুই দা দুই হাতে ধরে এক দা-এর উপর আর এক দা-এর কোপ মেরে ইউসুপের মাথার এক গোছা চুল কেটে ফেললো, বললো, এই করে কাটে চুল।

তিব্বতের সঙ্গেই জিনিষপত্রের লেনদেন ছিল এদের বরাবর। সেখানকার তৈরী দা-ই এদের পছন্দ বেশী। তলোয়ারের মতো লম্বা লম্বা দাগুলি এখন এখানেই হয়। ট্রেনিং সেণ্টারে তৈরী করে। দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে এরা লোহার ভালোমন্দ পরখ করে। সেদিন দেখলাম ট্রেনিং সেণ্টারের একটা দা তাতোরিবা দাঁতে কামড়ে কামড়ে দেখলো। পরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফেলে রাখলো, বললো,—এ লোহাটা ঠিক না।

ঘাটে পথে যে যুবকদের দেখছি, দেখি তাদের সাজের বড় সখ। যেখানে যা পাবে গলায় ঝোলাবে, টুপীতে গুঁজবে। কোথায় একটা চামচ পেয়েছে, গলায় ঝুলিয়েছে। ঝুলিয়েছে গড্‌রেজের চাবি, বাঘের দাঁত, বড় পুঁতির দানা। কানে রুপোর পাত্‌লা কল্‌কে, টর্চের মুখ, বালা, কাঠের টুক্‌রো।

—আরে, হাসপাতালের রোগী না এ? হ্যাঁ, হাসপাতালেই তো দেখেছিলাম একে, পেটে কঠিন রোগ। এখনও আছে হাসপাতালের রোগী হয়েই। দিব্যি ছেলে পিঠে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শিশু এদের প্রাণ। শিশু ছাড়া থাকে না এরা। কোলের শিশুটি যদি মা'র বুকে থাকে তবে তার আগের শিশুটি থাকে বাপের পিঠে পিঠে। বাপ হাসপাতালে এলো তো শিশুটিও এলো বাপের সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় সব যুবক পিতার সঙ্গেই একটি করে শিশুসন্তান—বিশেষ করে পুত্রসন্তান থাকে।

হাসপাতালে থাকার নিয়মকানুন এখনও এরা মানে না কিছু। যখন ইচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রে এসে হাসপাতালে ঘুমোয়। তাইতেই কৃতার্থ হয়ে যায় নার্সরা, ডাক্তাররা।

আরো একটি রোগী দেখেছিলাম হাসপাতালে সেইদিনই। হাঁপানীর রোগী, এসেছে মাসখানেক হল। খারাপ রকমের হাঁপানী; ঝাড়ফুঁক করে চিকিৎসা চলছিল বহুদিন। পরে একদিন পালিয়ে এলো এখানে রোগ ভালো করতে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো গাঁয়ের লোক দা ছোরা নিয়ে। লড়াই করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ছেলেটাকে। অনেক কষ্টে রক্ষা করা গেছে তাকে। ডাক্তারের মুখেই শুনেছিলাম কাহিনী। সেই ছেলেটিও এসে গেছে। পিটপিটে চোখ নিয়ে মিটমিট করে হাসছে। আজ গাঁওবুড়াদের মিটিং হবে এ বাড়ীতে। এক সময়ে দেখি ছেলেটিও এলো এগিয়ে, তেমনি করে হাসতে হাসতে এসে ঘরে ঢুকলো। খালি একটা চেয়ারের উপরে হাতের খাপ-খোলা দাটা রাখলো, রেখে তার উপরে চেপে বসল।

সামনে পথের পাশের দোচালা চালাঘরটা হ'ল এখানকার সরকারী কোর্ট। আজ বুঝি বিচারের দিন। পায়ে 'লেপা' পড়া এক তাগিন কয়েদীকে এনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে অনেকক্ষণ।

ছোট বালক, পিঠে এক কালো কুকুরের বাচ্চা বেঁধে দুলছে—যেন শিশু

ভাইয়ের কান্না থামাচ্ছে।

কয়দিন হ'ল এক অপেক্ষায় বসে আছি, একভাবে মালপত্র বাঁধা। ভোর হ্তে এই এক ভাবনা—এই ব্ঝি প্লেন এলো। প্লেন এসে থাকবে না বেশী সময়। নামবে, আমাদের তুলে নিয়েই উড়ে যাবে। বারান্দায় বসে কেবল কোণের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকছি। দ্' পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ঐদিকের মেঘ ফ্ঁড়েই আসবে প্লেন।

এদিকে তত মেঘ নেই। মাঝে মাঝে রোদের ঝিলিক। কি জানি যেখান হ'তে প্লেন আসবে সেখানকার আকাশ কেমনতরো?

দেখতে দেখতে সাদা ধোঁয়ার মতো মেঘে ছেয়ে গেল চারদিক। কাছের পাহাড়-গ্লিতেও সেই মেঘদ্ত নেমে এলো। ঢাকলো সব। এ মেঘ ঝরে পড়ে না, বিছিয়ে থাকে। বিছিয়ে থাকে মনেও। সব মিলে যেন চোখ জড়ানো ঘ্ম ঘ্ম ভাব।

আরো এক ভোর গেল। আরো।

আজ ভোরে 'তারে' খবর এলো 'গতকাল দ্'বার চেষ্টা করেছে প্লেন আসতে, পারেনি। আজ সকালে আবার চেষ্টা করবে।' আজও তো এদিকে কালকের মতই আকাশ।

ঐ আসছে আসছে, এলো এলো। একটা প্লেন মাথার উপরে চক্কর দিল। দিয়ে আবার চলে গেল নাকি? বোধহয় চলেই গেল। ছ্টে বাইরে গিয়েছিলাম, আবার এসে বারান্দায় উঠলাম।

পাহাড়ের গায়ে প্লেনটা দেখা দিল। নামছে নীচে। সৈন্যদের প্লেন। খোলা দরজা। নামলো, একদল সৈন্য তুলে নিয়ে 'ডিনজান' গেল।

তব্, একদিন সেই ভোর এলো। অতি আকাঙ্ক্ষিত প্লেন এসে নামলো, আমাদের তুলে নিল। যাবার সময়ে একট্ যেন বেদনাও বোধ করলাম দাপরিজো ছেড়ে যেতে।

এদিকটায় ট্টিনই ভারতের শেষ ঘাঁটি, তারপরেই হ'ল চীন-এর ঘাঁটি। দ্র্গম স্থান, স্বল্প পরিসরের স্থান। সহজ আসা-যাওয়ার পথ নয় এ'।

কলিঙ্গের প্লেন যেন জীপ এক একখানা। কোথাও যেতে আসতে আটকায় না তাদের। তেমনি ডাকাব্কো পাইলট সব। কলিঙ্গের প্লেন ছাড়া অন্য কোনো প্লেন আসতে রাজী নয় এসব স্থানে। পাহাড়ের ভিতরে গিয়ে ঢ্কছে, বেরিয়ে আসছে। আউটপোস্টে যেখানে নামতে পারে না, সেখানে গিয়ে চালের বস্তা, খাবারের বস্তা, জ্যান্ত ছাগল ভেড়া ফেলে দিয়ে আসছে। খোলা দরজার পথে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে ফেলে দেয় প্লেন হতে। এই রকম এক প্লেনে চলেছি ট্টিন-এ। প্লেন ভরা ছাগল ভেড়া, প্যাকিং ব'ক্সে প্যাক করা। বাক্সের উপর প্যারাস্ট বাঁধা। হেলতে দ্লতে নামবে তারা মাটিতে। ছাগল ভেড়ার গন্ধে ভরা প্লেনের ভিতরটা। একপাশে খান চারেক চেয়ার।

চাক্মা বললেন,—এ তো ভালো, আপনারা ছাগল ভেড়ার সঙ্গে চলেছেন। এলোইন সাহেব বলেন তিনি যতবার যান আসেন, সঙ্গে থাকে শ্য়োর ভরা বাক্স।

ঘন বনে ভরা এসব পাহাড়। লতাগ্ল্মে আচ্ছ্বাদিত বলে পাহাড় নিকট হতে, স্দ্র হতে সমান ভয় দেখায়। এই রকম পাহাড়ের মাঝখানে অতি ছোট্ট একটা উপত্যকা—পাহাড়ের অন্তরতম দেশ—এখানেই ট্টিন গ্রাম।

নানা জাতি থাকে পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে—অল্প সংখ্যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

বন কেটে ছোট ছোট চালা তুলে নেয়। বাইরের জগৎ এদের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত। জগৎ বলতে একটু লেনদেন ছিল তিব্বতের যে জায়গাটুকুর সঙ্গে সেখানে এখন চীনেদের ঘাঁটি।

টুটিনের চার্জ নিয়ে আছেন বর্তমানে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। একাই থাকেন। স্ত্রী এসেছিলেন একবার। এমন নির্জন নির্বান্ধব জায়গায় থাকতে পারলেন না বেশী দিন। কান্নাকাটি করে চলে গেছেন।

ফল ফুল হয় না টুটিনে। তবু কয়েকটা ফুলের গাছ তুলেছেন ভদ্রলোক বাংলোর সামনে। একটা উঁচু পাহাড়ী টিলার উপরে বাংলো। ঝিমধরা সুনসান তল্লাট। সাদা চার পাঁপড়ির বুনো গোলাপের ঝাড়ে ফুলগুলি একমাত্র কথা কইবার সঙ্গী। হাল্কা বেগুনি রঙের কাঞ্চনও আছে দুটি। আর আছে লাল মাদারের গাছ একসারি নতুন লাগানো। প্লেনে করেই আনতে হয় এখানে—যা' কিছু সব।

স্যাঁতসেঁতে সবুজ শ্যাওলা ধরা যেন জায়গাটা। লোকজন বেশী নেই—আশে-পাশের গ্রাম হতে দু' পাঁচজন যা আসে তাদের নিয়ে একটি হাতের কাজের সেণ্টার খোলা হয়েছে। একটু পড়াশোনা শেখাবার চেষ্টাও হয়। কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো কর্মীদের।* একজন বাংলাভাষী আসামী শিক্ষক হাতের কাজ শেখান। তাঁত বোনে এরা, উল দিয়ে আসন করে, ছোট ছোট গালিচা করে। পাতলা কাঠের মুখোশ গড়ে। তিব্বতের ছাপ এদের হাতের কাজে। তিব্বতী আছেও কয়েকজন এখানে।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের কাছে নিচ্ছিলাম খবর। গ্রামেও যেতে হয় তাঁকে। এ পাহাড়ে দু' ঘর, ও পাহাড়ে চার ঘর এমনি সব লোকের বসতি। কয়েকদিনের সময় হাতে নিয়েই বের হন আশেপাশের গ্রাম দেখতে। আগে হতে খবর পাঠাবার পথ নেই। যখন যান আধঘণ্টার মধ্যে গ্রামের লোক বাঁশ কেটে বাঁশের বাড়ী বানিয়ে দেয় তাঁর থাকবার জন্য।

সদা সতর্ক হয়ে থাকতে হয় এখানে। এটাই শেষ সীমানা, অতি জরুরী স্থান। সামনের উঁচু পাহাড়টা দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, এই পাহাড়টার আড়ালেই চীনেদের ঘাঁটি। পাহাড়টার পিছনেই আছে তারা। মাত্র তের মাইল পথের ব্যবধান। তারা কিন্তু আমাদের দেখছে, সর্বদা চোখে চোখে রাখছে; কিন্তু আমরা তাদের দেখতে পাই না।

টুটিন দেখা শেষ হল। স্থানের পরিবেশটা ছাড়া দেখবার কিছু তেমন নেই। ভদ্রলোকের স্ত্রীকে দোষ দেওয়া যায় না। ভদ্রলোক কাজেকর্মে থাকেন—এদিকে ওদিকে যান, বাংলোতে থাকতে হয় ভদ্রমহিলাকে চব্বিশ ঘণ্টা—অজানাভাষীদের মধ্যে নিরন্তর একটা আতঙ্ক নিয়ে। হাসিমুখে কে পারে থাকতে?

কলিঙ্গের প্লেনই আবার এসে নিয়ে চললো আমাদের। খোলা দরজা দিয়ে হাওয়া ঢুকে চেয়ারের তলা দিয়ে এসে পা' দুটো জমিয়ে তুলছে।

সবুজ পাহাড়ের চাপে টেরাভাইটি রঙের সবুজ জলধারা—ব্রহ্মপুত্র ক্ষীণ শরীর নিয়ে পাথরে গা' বাঁচিয়ে চলেছে—নীচে। এখানে তার কত বিনয়ীভাব। আর, সমভূমিতে পড়েই সে ছড়িয়ে পড়েছে, যেন লড়াই জিতে রাজ্য বিস্তার করে বসেছেন রাজা। ফুলে ফুলে ওঠে গর্বে তার চওড়া বুকের পাটা।

পাশিঘাটে এলাম। আসামীরা বলে 'ডিহাং', আদিবাসীরা বলে 'সিয়াং', আমরা বলি ব্রহ্মপুত্র। এই সিয়াং নদীর ধারেই পাশিঘাট। নদীর ধারে খানিকটা সমতল ভূমিতে এই নতুন সহর। পাশিঘাট বিস্তৃত সহর, পরিচ্ছন্ন সহর। এখানে

রেডিও ষ্টেশন আছে। এখানকার হাসপাতালের শিক্ষিত নার্স ডাক্তারদের অতি সুনাম। এখানে স্কুল কলেজ আছে। ছাত্রছাত্রীদের নার্স ডাক্তারদের মুখগুলি বুদ্ধিতে দীপ্তিতে উজ্জ্বল। সাজে সজ্জায় আধুনিক। সিয়াং নদীর জল ছুঁয়েছে 'লন'—এই লনের উপর মনোরম পরিবেশে গেষ্ট হাউস। এ' কয়দিনের ঘোরা-ঘুরির পরে মনে হয় এক নতুন দেশে এলাম। কিন্তু এবারে সহর দেখতে আসিনি আমরা, এসেছি সহর ছাড়িয়ে যারা থাকে তাদের দেখতে! কিছু সহজে পাই, কিছু খুঁজে খুঁজে নিই।

পাশিঘাট—এরা বলে গরম দেশ। এখন ফাল্গুনের শেষ, এখনো আমরা গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে ঘুরছি, আর এরা দেখি অঙ্গের গরম বস্ত্র খুলে ফেলেছে।

পাশিঘাটের পাহাড়ের ভিতরে ভিতরে 'পাশি'দের গ্রাম, 'মিনিয়ং', 'পাদাম'দের গ্রাম। পাশিদের মেয়েরা সাজে অনেক ঝরঝরে। এদের মেয়েদের নাক-কান গহনায় বোঝাই নয়। প্রায় মেয়েই নাকে কানে পরে না কিছু। গলায় একটি দু'টি মালা, পরনে গালেক ও ব্লাউজ। মাথার চুল ছাঁটা পুরুষদের মতো—মেয়েলি সৌন্দর্য হানি করা। পাশি, মিনিয়ং পাদাম,—এরা একান্নবর্তী পরিবার নয়। পুত্রকন্যারা বড় হয়ে নিজের নিজের পছন্দমতো সঙ্গী নিয়ে ঘর বাঁধে। পিতামাতার কাছ হতে আলাদা হয়ে বাস ক'রে। বিবাহের অনুষ্ঠানও বিশেষ কিছু নয়। পাত্রপাত্রীর পিতামাতার ঘরে কিছু মাংসের হয়তো আদান-প্রদান হয়। এরা খানিকটা মাংস কেটে তাদের পাঠিয়ে দিল, ওরা কিছু মাংস এদের পাঠালো। গাঁয়েই আলাদা ঘর তুললো। নব দম্পতি নতুন জীবন সুরু করলো।

একটি করেই স্ত্রী থাকে এদের। যদি কখনো অমিল হয়, গাঁয়ের পঞ্চায়েত তার বিচার করে। বিয়ে যত সহজ—ছাড়াছাড়ি তত সহজ নয়।

কমলালেবু কাঁঠাল গাছে ভরা গ্রাম। চারদিক ফলের বনে, লতায়, ঝোপে, বৃক্ষে বনস্পতিতে ঠাসা। তারি মাঝখানে মাঝখানে গ্রাম। টোকোপাতা বেতপাতার ছাউনী চালে।

পাশি মিনিয়ং পাদাম—এদের লাল ও হলুদ রং বেশী প্রিয়। এই রকম ঘন সবুজ আর নীলের মাঝখানে এ' যেন প্রাণের নিঃশ্বাস। এই দু'টি রং নইলে যেন চলে না।

দু'টি যুবক চলেছে পথ দিয়ে, বুকখোলা জামা গায়ে। খোলা ফর্সা চওড়া বুকের মধ্যিখানে বড় একটি পদক ঝুলছে গলা হতে, নীল হলুদ লম্বা লম্বা পাথরে সাজানো কানের ঝাপটার মতো গড়নের। চওড়া বুকের মাঝখানটিতে দেখাচ্ছে বড় সুন্দর। যেন পৌরুষের গর্ব একটুকরো।

পথে পড়ে 'বালেক' গ্রাম। পথের ধারেই স্কুল ঘর, বাঁশের খুঁটির উপর একদিক খোলা। মেয়েদের পরনে টকটকে লুঙ্গি জামা। বড় বড় লকেট দেওয়া টাকার সারি সাজানো লম্বা রূপোর হার। মাথায় সবার তোয়ালে বা চাদর জড়ানো।

বালকদের গায়ে বুক-খোলা কোট, সবুজ নীল বা কালো রঙের। গলা হতে পা পর্যন্ত উন্মুক্ত। এই বেশেই আজকের মতো পড়া সাঙ্গ করে উঠলো।

পাশিঘাট হতে বাইশ মাইল দূরে 'ব্রহ্মপুত্র ঘাট'। পথে যেতে ধারে ধারে গ্রাম, স্কুল পড়ে, থেমে থেমে চলি। দীর্ঘ বনপথ, লতাগুল্মে জড়াজড়ি বন। পাখীর গান, বনের শোভা, জঙ্গলের সুরভিতে আচ্ছন্ন মন। লম্বা লম্বা বেতে ঝোলানো পুল, ছোট ছোট নদী নালার উপরে, এ পাহাড় হতে গাঁথা ও পাহাড়ে। পাথুরে নালা বয়ে যাচ্ছে নীচে, গভীর নালার অন্ধকারে অরণ্যের পত্র-পল্লবের ঘন

ছায়ায় দু'টি প্রজাপতি তাদের বড় বড় বাসন্তী রঙের ডানা মেলে স্তব্ধ হাওয়ায় পাশাপাশি স্থির ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে তাদের ডানা, কাঁপছে বিশাল অরণ্যানীর ভিতরে কচি কোমল বাসন্তী রঙের দু'টি ক্ষুদ্র প্রাণ।

নেফা ঘোরা এবারের মতো এখানেই শেষ। ব্রহ্মপুত্র ঘাট হতে ডিব্রুগড় যাবো জলপথে। সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছুবো গিয়ে।

পথে যাবো; খাঁচায় মুরগী, বাঁশের বোনা শিকায় সিদ্ধ ডিম কাঁচা ডিম, আপং, কাপড় না দিয়ে পারে না। প্রীতির বোঝা বুকে পিঠে তুলে নিই।

যখন এসেছিলাম তখন এরা গেয়েছিল—'আইপে আলক্ষা'—স্বাগতম জানিয়েছিল। এখন নেফার বন্ধুরা গাইতে লাগলো 'আইপে গিলাক্ষা'—যাত্রা শুভ হোক, বিদায়।

নৌকো ছাড়ে। প্লেনে গেলে ট্রেনে চড়লে এমন মনে হয় না। মনে হল চললাম তীর ছেড়ে দূর হতে দূরে। দূরের লোক ধু ধু করে। স্থির জল ডিহাং নদীর, যেন ইস্পাতের পাত্। সে পাত্ কেটে নৌকো চললো আমাদের নিয়ে।

....

জন্‌সর—বাওয়ার

....

'জন্‌সর' আর 'বাওয়ার', দুই পাহাড়ী পরগণা; দুই পরগণা মিলে এখন এক। আগে লোকে আলাদা আলাদা নামে নিজের দেশের নাম বলতো। এখন জিজ্ঞেস করলে বলে, আমরা জন্‌সর-বাওয়ারের লোক।

নির্জন পাহাড়, বহুকাল বাইরের লোকের আসা-যাওয়ার পথ ছিল না তেমন। তারাও বাইরে আসবার প্রয়োজন বোধ করেনি। বড় বড় ঝাউ, পাইন, দেবদারুর ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়, তারি ভিতরে পাহাড়ের তরঙ্গের মধ্যে লুকোনো ছোট ছোট গ্রাম।

জনসর-বাওয়ারের লোকেরা বনের গাছ কেটে কাঠের বাড়ী করে পাথর ভেঙে দেয়াল গড়ে। গরু ছাগল ভেড়া মোষ পালে। তাদের লোম দিয়ে কম্বল চাদর বোনে, চামড়ার থলি বানিয়ে 'ডাল নিমক গেঁহু চাউল' রাখে। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে ফাঁকা জমিতে চাষ করে। কাঠের জ্বালানীতে রান্না করে। গরু ছাগলের দুধ খায়, মাখন তোলে, ঘি বানায়। জীবনধারণের জন্য যা কিছুর প্রয়োজন সবই তাদের হাতের কাছে।

মাঝে মাঝে বাড়তি কম্বল চাদর নিয়ে একজন দু'জন কয়েকদিনের পথ হেঁটে সহরে যায়। সে-সব বিক্রি করে নুন কেনে, মেয়েদের ঘাগড়ার রঙীন কাপড় কেনে, সখ করে বৌদের জন্য পুঁথির মালা কেনে। সোনা রুপোও কিনে আনে কিছু। গ্রামেই থাকে স্বর্ণকার, সে বানিয়ে দেয় অলঙ্কার। জন্‌সর-বাওয়ার হাত পাতে না বাইরে কোনো কিছুর জন্য। নিজেদের জঙ্গল পাহাড়, বাস-বসতি নিয়ে তারা খুশী। তাদেরই মধ্যে পণ্ডিত আছে, বংশানুক্রমে তারা পুজাআর্চার কাজ করে, শুভ কাজে মন্ত্র পড়ে। গ্রামে বানিয়া আছে, ক্ষত্রিয় আছে, কাহার কাছে, লোহার আছে। ছুত-অচ্ছুত সব জাত মিলে তারা এক জনসর-বাওয়ারের লোক।

জনসর-বাওয়ারের লোক খুসীর হাসি হাসে। বলে, আমাদের এখানে ভিক্ষুক নেই একটিওই আমরা যত গরীবই হই, না খেয়ে থাকি না কেউ। আমাদের এখানে পতিতা রমণী বলে কেউ নেই। আমাদের কোনো মেয়ে অনাথ হয় না। আমাদের কোনো সন্তান পিতৃমাতৃহারা নয়।

জনসর-বাওয়ারের পুরুষ নারী সবাই লম্বা ছিপছিপে। টিকোলো নাক, টানা চোখ, সরু গলা, লম্বাটে মুখ। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এদের দেহের রং। পুরুষেরা পরে চুড়িদার, গায়ে সাদা লোমের গরম কোট, কোমরবন্ধ, মাথায় উলের টুপী। মেয়েদের পরনে রঙীন ঘাগ্‌রা, গায়ে লম্বা হাতের জ্যাকেট—সরু কোমর এ'টে ছড়িয়ে পড়ে ঘাগড়ার উপরে। মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা। পথ চলে যেন গরবিনী ভঙ্গী। নাকে কানে লম্বা নথ। উ'চু জাতের যারা, তারা পরে সোনার নথ, নীচু জাতের মেয়েরা পরে রুপোর।

কোথা হতে এরা প্রথম এলো এই পাহাড়ে—কি জানি। কেউ বলে কাশ্মীর হতে এসেছে। কেউ বলে পাহাড়ের নীচে যে সহর, সেখান হতেই এসেছে মোগল রাজত্বের আমলে। অত্যাচারের ভয়ে পালিয়ে এসে পাহাড়ের গভীরে লুকিয়েছিল, আর যায়নি ফিরে।

আমার 'দেব্‌কী' বলে, তা নয় দিদি, মহাভারতের বিরাট-রাজার আমলে কীচকের ভয়ে এরা প্রথম পালিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। কীচক খুব অত্যাচারী ছিল তো? বিরাট রাজার রাজ্য এই দিকেই ছিল। ঐদিকে যেতে যেতে আরো কিছুটা বাঁদিকে গেলে সেই পাহাড় দেখতে পাবে। সেখানে আছে বিরাট রাজার 'খাঁই'। 'খাঁই' হল কুয়া। সেই খাঁই মাটিতে ঢেকে গিয়েছিল, এখন লোকেরা সেটা বের করেছে। মস্ত সেই খাঁই। তার ভিতর খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। সেই আমলের কিছু কিছু লোহার জিনিষও পাওয়া যাচ্ছে।

দেব্‌কী দেই, দেই হল দেবী। মেয়েদের নামের সঙ্গে 'দেবী' জুড়ে ডাকে এরা। মালো দেই, চম্পা দেই, ফুলো দেই—নাম সব।

দেব্‌কী এই জনসর-বাওয়ারেরই মেয়ে। জনসর-বাওয়ারের ছেলেমেয়েরা বাইরে যায়নি কখনো লেখাপড়া শিখতে। লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন বোধ করেনি তারা জীবনে। এখন দু' চারজন ছেলে বাইরে গিয়ে শিক্ষিত হচ্ছে। আর মেয়েদের মধ্যে দেব্‌কীই প্রথম মেয়ে, যে লেখাপড়া শিখেছে, কলেজে পড়েছে।

দেব্‌কীর বাবা কি করে যেন ছিটকে পড়েছিলেন জনসর-বাওয়ার হতে বাইরে। দেব্‌কী বলে, আমার ছেলেবেলায় কোমরের বাঁদিকে একটা ফোড়া হল, সে ফোড়া কিছুতে সারে না। গাঁয়ের লোকের চিকিৎসা—শেষে লোহা পুড়িয়ে ফোড়ার ভিতর ঢুকিয়ে দিল। ফোড়া ভালো হয়ে গেল, কিন্তু আমি খোঁড়া হয়ে গেলাম। পায়ের সূক্ষ্ম শিরাগুলি নাকি ঐ চিকিৎসাতে শুকিয়ে গেল। বাঁ পা'টা ছোট হয়ে রইলো। একটু বড় হলাম পরে বাবা বললো—এ মেয়ে তো পাহাড়ে উঠে কাঠ কাটতে পারবে না, ঘাস আনতে পারবে না; একে বরং লেখাপড়া শেখাই। বাবা তখন কর্মসূত্রে ইন্দোরে থাকতেন, আমাকে নিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

দেব্‌কী বলে, আমার জন্ম কোথায় জানো দিদি? পাহাড়ের মাথায় জঙ্গলের ভিতরে। মা গিয়েছিলেন গরু ভেড়ার জন্য ঘাস কাটতে, সেই সময় আমার জন্ম হয়। সঙ্গে এক কাহারণী ছিল, হাতের কাস্তে দিয়ে আমার নাড়ী কেটে দিল। সেই কাহারণীই তার ঘাগড়াতে আমাকে জড়িয়ে নিয়ে মা'র সঙ্গে সঙ্গে এসে বাড়ীতে পৌঁছে দিল। আমি যেখানে জন্মেছিলাম তার কাছে এক 'দেবীস্থান' ছিল সেইজন্যই আমার নাম রাখলো দেব্‌কী।

জনসর-বাওয়ারের বাড়ীগুলি কাঠে পাথরে মিলিয়ে। ছোট্ট ছোট্ট ঘর, ছোট্টতর ঘুলঘুলি। ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে মুখ ফুটিয়ে দেখে না মেয়েরা অজানা লোককে। হাসিমুখে বেরিয়ে এসে কোমরে হাত রেখে সামনে দাঁড়ায়। স্বাধীন সত্তা এক একটি। জড়তা ভীরুতা নেই, সমাজের রীতি-নীতির কঠিন চাপ নেই। সহজ ভঙ্গী, সাবলীল গতি। মেয়েরা যেন সংসারের খুসীর ঝরণা—পাহাড়ের প্রাণ।

স্বামী নিয়ে বিরোধ নেই নারীদের, পুরুষের নেই নারী নিয়ে কলহ। সমাজের যে নীতি বেঁধে রেখেছিল আদিতে, তাই চলে আসছে আজও। বাড়ীর যে বড় ভাই সে-ই কেবল বিবাহের অধিকারী। সে বিয়ে করে আনে নিজের স্ত্রীকে নয়, আনে পরিবারের স্ত্রীকে। সব ভাই-এর সমান অধিকার সেই স্ত্রীতে। একাধিক বিবাহ করে বধূ ঘরে আনে বড় ভাই। অনেক পরিবারে স্ত্রীর চেয়ে স্বামীর সংখ্যা হয় বেশী, অনেক পরিবারে স্বামীর চেয়ে স্ত্রী হয় অধিক। তা' নিয়ে গোলমাল নেই কোনো। নিজেদের মধ্যেই নিয়ম গাঁথা, কোন স্ত্রী কোন স্বামীর ভাগে ক'দিন থাকবে। তিন চারদিন পর পরই পালা বদল হয়। চাকা ঘোরার মতো স্ত্রীরা স্বামীরা স্থান বদল করে। এ নিয়মের কেউ ব্যতিক্রম করে না। তাই এদের স্ত্রীদের সন্তানরা বিশেষ কোনো ভাই-এর সন্তান বলে আলাদা পরিচয় পেতে পায় না। সব সন্তানই পরিবারের সন্তান। পরিবারের বড় ভাই, যে বিবাহের অধিকারী, সে-ই সকল সন্তানের পিতা। সব সন্তানের উপরেই এক স্নেহ সকলের।

কখনো কোনো স্ত্রী বহুদিন বাপের বাড়ীতে কাটিয়ে সন্তানসম্ভবা হয়ে স্বামীর ঘরে ফিরে এলে পরে, এ নিয়ে ঝামেলা করে না কেউ। সেই সন্তানকে বংশের সন্তানদের সঙ্গেই মিলিয়ে মিশিয়ে নেয়।

সন্তান যত বেশী হয় সংখ্যায়, ততই মঙ্গল সংসারের। কাজের হাত যত বাড়ে, ততই বাড়ে সচ্ছলতা। কঠিন পাহাড়ে কঠিন জীবনধারণ, অফুরান কাজ। যে পরিবারে যত লোক ততই পরিবারের সমৃদ্ধি। পাহাড়ের পর পাহাড় পড়ে আছে—জমি নিয়ে চাষ করো, কাঠ কাটো, পশু চরাও—কোনো বাধা নেই। শীতকালে লতার বাকলের দড়ি বানাও, ঘর তোলো, কাঠের গামলা ঘটিবাটি তৈরী করো, পশুর লোমের উল কাটো, কম্বল চাদর বোনো—কত কাজ হয় ঘরে বসেও। পর্বতের রাজ্যের গভীরে এই জনসর-বাওয়ার সুখে আছে, শান্তিতে আছে।

এক পরিবারে চার পাঁচ বৌ; বড়বৌ রান্নাঘরের রুটি বানাবার অধিকারিণী। সেখানে অন্য বৌ-এর স্থান নেই। সবার আহার যার হাতে, কর্তৃত্বও তারি হাতে। বড়বৌ রুটি বানাবে, মেজবৌ বড়বৌকে সাহায্য করবে রান্নাঘরের কাজে। সেজবৌ ন'বৌ, আর যারা থাকে, তারা গরু মোষ ছাগল ভেড়ার যত্ন করবে, শিশুদের লালন করবে। ছোটবৌ বনে যাবে, কাঠ আনবে, ঘাস কেটে আনবে পশুদের জন্য। পরিষ্কার ভাগ ভাগি কাজ নিয়ে কোনো বিবাদ নেই কারো সঙ্গে।

বলি, দেবকী, এক পরিবারে ভাই হয়তো পাঁচজন, তাদের স্ত্রী থাকে কয়টি সাধারণত?

দেবকী বলে, জানো তো দিদি, আমাদের এখানে মেয়ের আদর বেশী। বিয়েতে মেয়েকে টাকা দিয়ে আনতে হয়। মেয়ের হাতে একটা বটুয়া থাকে, সেই বটুয়ায় যে যেমন পারে টাকা দেয়। সেটা বৌর নিজস্ব টাকা, কেউ হাত দেবে না তাতে। তারপর তাকে নথ পরিয়ে বরের বাড়ীতে নিয়ে আসে। সেখানেই বিয়ে

হয়, খাওয়াদাওয়া হয়। বিয়ের খরচ ছেলেকেই দিতে হয় সব। তাই যারা যত খরচ করতে পারে, তারা ততটা বিয়ে করে বৌ ঘরে আনে। যারা পারে না, তারা এক দুই বৌ নিয়েই সংসার চালায়।

বলি—আচ্ছা, এমনও তো হয় যে, বড়বৌ ঘরে এসেছে—ছোট দেওর তখন খুবই ছোট—সেই দেওরও তো বৌর স্বামী হয়ে যায়?

—হ্যাঁ, হয় বৈকি। আমার মাসীর যখন বিয়ে হল, তার ছোট দেওর ছিল। তাকে মাসী নিজের হাতে স্নান করাতো, খাওয়াতো। এ-ই আমাদের রেওয়াজ কিনা, তাই এসব কিছুই অবাক হবার বলে মনে হয় না।

বলি, কোনো বৌ-এর কোনো স্বামীকে হয়তো একটু বেশী ভালো লেগে গেল—তা' যায় তো?

—যায় বৈকি? তবে আমাদের জনসর-বাওয়ারের মেয়েরা এত হুঁশিয়ার যে, তা' কখনো কেউ বাইরে দেখায় না। কেউ বুঝতেই পারবে না কিছু, এমনই সংযত ব্যবহার তাদের।

—স্বামীদেরও তো কোনো বৌকে একটু বেশী ভালো লাগতে পারে?

—তা' লাগেই তো, লাগে।

—কখনো হয়তো সেই বৌকে এটা ওটা সৌখীন জিনিষ উপহার দিল, দেয় তো? তখন অন্য বৌরা ঝগড়া করে না?

—তারা জানবে কি করে? স্বামী লুকিয়ে সুগন্ধি তেলটা, আয়নাটা, চুল বাঁধবার ফিতেটা সহর হতে এনে বৌকে দিল। বৌ সেগুলি লুকিয়ে রাখলো। তারপর হয়তো বাপের বাড়ী গেল। ফিরে এসে বললো যে, এগুলি তাকে বাপের বাড়ী হতে দিয়েছে। মিটে গেল সব গোল।

ঝরণার জল দূর দূর হতে বয়ে আনে মেয়েরা। স্নান এরা করে না, করতে পারে না। দেবকী বলে, রাত্রিতে স্নান করে এরা, গামলায় গরম জল নিয়ে। এক এক রাত্রে পরিবারের দুজন কি তিনজন স্নান করলো। এমনি পালা করে স্নান করে সবাই।

মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা, আঁটসাঁট জ্যাকেট গায়ে, ঘাগড়া ঘুরিয়ে নথ দুলিয়ে চলেছে মেয়েরা এ-পাহাড়ে ও-পাহাড়ে ঘাস কাটতে। যায় আর ফিরে ফিরে চায়, দেবকীকে দেখে, আমাকে দেখে—আবার চলে।

খিলখিল করে হেসে ওঠে দেবকী। বলে, আমিও তো ওদের মতোই ঘাস কাটতাম, যদি না লেখাপড়া শিখতাম। আমার এই খোঁড়া পা'টাই আমার সৌভাগ্য এনে দিয়েছে। আমার দিদি—সে ঠিক এদের মতোই ঘাস কাটছে, জল তুলছে, স্বামীকে নিয়ে ছয় ভাই-এর সংসার করছে।

বিবাহে, উৎসবে, পাঁচ গ্রামের লোক একসঙ্গে হয়, নাচে গায়। একের আনন্দে সবাই যোগ দেয়। কাজে কর্মে একে অন্যের সাহায্যে লাগে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ ঘটলে গ্রামের লোকেরাই তা মিটিয়ে দেয়।

সব ভাইয়ের মিলিত আয় বড় ভাইয়ের হাতেই আসে। সব সন্তান একভাবে বড় হয়। বৌদের এরা আদরে রাখে।

অগাধ বন, অবাধ স্বাধীনতা। প্রিয় প্রেমিকের সাথে মিলতে কোনো বিঘ্ন নেই। স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ জনসর-বাওয়ার।

পাহাড়ী রোদ কড়া রোদ। সূর্য উঠে গেছে মাথার উপরে। আর চলতে পারবো না, এবারে বাড়ী ফিরবো।

দেবকীর দুঃখ, আর ক্রোশ দুই গেলেই ওর দিদির গ্রাম, বড় গ্রাম, সমৃদ্ধিশালী

গ্রাম। সেই গ্রামে গেলে আরো অনেক কিছু দেখতে পেতাম। দেব্‌কী বলে, সেই গ্রামে প্রায় কুড়ি ঘর বসতি, সেখানে সোনার কাজ করার লোক আছে, লোহার কাহার বানিয়া আছে, পণ্ডিত আছে—সব এক জায়গায়।

উৎসাহ ভরে বলে, সেখানে গেলে তোমাকে মেয়েদের নাচ দেখাতে পারতাম। আজ রাত্রিটা সেখানে কাটিয়ে ভোরেই চলে আসতে পারতাম। আমার দিদির বাড়ীতেই থাকবে। বল—যাবে?

হাতে যে সময় নেই, কি করি? পথের ধারের পাহাড়টার এদিকটায় সূর্যের ছায়া পড়েছে। সেই শীতল পাথরে গা' ঠেকিয়ে বসলাম। ফুরফুরে হাওয়া মুখের উপর দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। সামনের ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট ছোট্ট ক্ষেতে গমের পাতাগুলি সবে হাওয়াতে দুলতে শিখেছে। রোদের কিরণ ধরি ধরি করে ছুটে বেড়াচ্ছে কোমল সবুজের গা' বেয়ে।

জনসর-বাওয়ার—তার পথ পাহাড়, বাড়ী বন, নারী-পুরুষ, ঝরণা-পশু সব মিলিয়ে যেন এই সবুজ ক্ষেতে রবির আলোটুকুর মতোই এক অতি কোমল সরল শিশুখেলা।

নীচের পথ হ'তে উঠে আসছে দু'টি প্রাণী—এক পাহাড়ী যুবক ও এক যুবতী রমণী। যুবকের সাদা কম্বলের চাদরে জড়ানো আলগোছে বুকে চেপে ধরা একটি নবজাত শিশু। রোদের তাপ লাগে পাছে, তাই তার চওড়া বুকের সবটা দিয়ে ঢেকে রেখেছে শিশুকে যুবক পিতা। পাহাড়ী বৌ চলেছে পাশে পাশে রঙীন ঘাগ্‌রা দুলিয়ে।

কোন্‌ ভাইয়ের সন্তান জানা নেই, জানবার কৌতূহলও নেই। বংশের সন্তান, পরিবারের একজন। অতি যত্নে, অতি সাবধানে তাকে বুকে তুলে নিয়েছে পুরুষ।

এই হ'ল জনসর-বাওয়ার।

হিমাচল

শতদ্রু নদীর এপার ওপার পাঞ্জাব ও হিমাচল। সুতোভরা মাকুর মতো তাঁতে ঠকাঠক্‌ চলাচলের মতো কয়দিন পাঞ্জাব হিমাচল, হিমাচল পাঞ্জাব করে করে 'আনি'তে এসে থামি। ক্ষণেক শ্বাস নেবার জন্য থামা, একদিনের বাস। পরদিন সকালে ভালো করে রোদ্দুর উঠলে রওনা হব আবার। ধীরে সুস্থে রওনা হব—এইটুকুই যা' মনের আরাম।

'আনি'—পাহাড়ের কোলে একটুখানি সমতল ভূমি। দু'দিকে দু'সারি উঁচু লম্বা পাহাড়, তারি মাঝখানে সরু লম্বা একফালি ভূমি, যেন পাহাড়ের অঞ্জলির ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়া একমুঠো মাটি। এর ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে 'আনি' নদী—পাহাড়ী স্রোতধারা। নদীর নামেই এই ভূমির পরিচয়।

দু'ধারের উঁচু পাহাড়ের সারির ছায়ায় ঢাকা নির্জন স্থান 'আনি'। দিনের দু'প্রহর পার করে সূর্য দেখা দেয় পাহাড়ের মাথায় কিছুক্ষণের জন্য। পরে ওপাশের পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। পূর্ণিমার চাঁদ আড়ালে আড়ালে

ঘোরে, এক সময়ে পাহাড়ের মধ্যিখানের ফাঁকটুকুতে এসেই মুখ লুকোয়। সে হাসিতে আনি উছলে ওঠে তার ভূমি বৃক্ষ নদী শিলাখণ্ড নিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য।

শান্ত নিবিড় আশ্রয় পাহাড়ের পাদভূমিতে। আনি নদীর ক্ষীণধারা উপলখণ্ডে ধাক্কা খেয়ে গুরু গুরু রব তুলছে অবিরাম একছন্দে একসুরে। যেন শিবনাম জপের সাথে তানপুরা বেজে চলেছে দিবারাত্রি। বাইরের কোনো কোলাহল কোনো কলরব বাজে না কানে, বাজে না মনেও। এ যেন সকলের অলক্ষ্যে গোপনে পাতা উমার সাধনার আসনখানি,—এই 'আনি'।

ছোট পরিসর, স্বল্প লোকালয়। আনির ডাকবাংলো হ'তে দেখি সামনে একটি টিলার উপরে দেবদারুর সারি, ঝাউ-এর চূড়া। মনে হ'ল যত্নে লাগানো হয়েছিল এককালে এদের। দেখি, গাছের ভিতর হ'তে বাড়ীর উঁচু চিমনি, চাল। খোঁজ নিই, জানি এখানকার রাজার বাড়ী ওখানে। রাজা মারা গেছেন কয় বছর আগে। রাজার দুই রানী, নিঃসন্তান; তাঁরা থাকেন মাঝে মাঝে এখানে, কখনো সিমলার বাড়ীতে।

এখন আছেন রানীরা এখানে। খবর পাঠিয়ে দেখা করতে আসি। পাহাড়ী রাজবাড়ী দেখবার ঝোঁকই বেশী।

ছোট টিলা; টিলার উপরে সোজা উঠে গেল মোটর। ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে ক্ষুদ্র আকারে রাজবাড়ীর যা' কিছু থাকবার—বারমহল, অন্দর মহল, দরবার, দেউড়ি—সবই আছে। পাথরের বাড়ী। রাজার পুরাতন ম্যানেজার আছেন—দেখাশোনা করেন। জীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ রাজবাড়ী। সামনের দিকে দরবার বৈঠকখানা অঙ্গন আঙিনা। দরজা আর সিঁড়ি পেরিয়ে ভিতর দিকে গেলাম। জাফ্‌রী দেয়াল, পাথরের প্রাচীর, তার আড়ালে রাজার খাস মহল। দাসী চাকরানী নিয়ে রানীরা থাকেন।

বড় রানী এগিয়ে এলেন। আহ্বান করে ঘরে তুললেন। বেশী বয়েস নয় রানীর—আমার চেয়ে অনেক ছোট। সাদা সাজ পরনে। সেদিন পর্যন্ত স্বাধীন ভারতে রাজা এম-পি ছিলেন। রানী শ্রদ্ধাদেবী বললেন,—দিল্লিতে থেকেছি, কত পার্টি কত হৈ-হল্লা। এখানেও কত ধুমধাম। একজনের সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেল। জীবনভরা এত যে হৈ-চৈ সব স্তব্ধ হয়ে গেছে এখন। আমি আর আমার ছোট বোন দুজনে দু'জনের মুখ চেয়ে দিনপাত করছি। এতকাল এক জীবন চালিয়েছি, এখন অন্য জীবন চালাচ্ছি।

উপর থেকে দেখছি কত রকম ফলের গাছ নেমে গেছে নীচ পর্যন্ত। ফল গাছের সখ ছিল রাজার। বহুতর ফলের গাছ পাহাড়ের গায়ে গায়ে, বাগানে। এই ফল বিক্রি করেও কত টাকা আয় হয়। রানী বললেন,—রাজা বলতেন, 'ফল তো বিলানেকে লিয়ে হ্যায়, বেচ্‌নেকে লিয়ে নেহী'। আমরাও তাই বিক্রি আর করি না তাঁর কথা মনে রেখে। আপেল, বাবুগোসা, ন্যাসপাতি তো আছেই, আরো একটা ফল খেতে দিলেন রানী;—নতুন খেলাম, প্রথম দেখলাম, ফলের নাম 'জাপানী ফল'। অতি সুন্দর লাল রঙের ফল। বড় বড় লাল 'পাপ্‌ড়িকা'র (ক্যাপ্‌সিকাম) মতো গড়ন, খেতে অনেকটা পাকা গাবের মতো স্বাদ, চুষে চুষে খেতে হয়।

রানী বেছে বেছে হাতে তুলে দিচ্ছেন, একটা করে ফল চুষছি আর পায়ের কাছে রাখা গামলাতে ফেলে দিচ্ছি।

রানী বললেন—এই যে চারদিকে পাহাড় দেখছেন,—বহুরত্না—বসুন্ধরা; কত

কত সিদ্ধ মহাত্মারা এইসব পাহাড়ে গুপ্ত-বাস করেছেন। জানেন কি, আমাদের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন বাংলাদেশ হ'তে। ভৃংমণি পাল ছিল তাঁর নাম। বালক বয়সে দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন হাঁটতে হাঁটতে ভাগ্য অন্বেষণে। এসে এক কুমোর-বাড়ী আশ্রয় নেন। বৃদ্ধ কুমোর হাঁড়ি গড়ে দেয়, ভৃংমণি পাল মাথায় করে সেই হাঁড়ি নদী পেরিয়ে হাটে বিক্রি করে আসেন। একদিন সন্ধ্যের সময়ে হাট হ'তে বাড়ী ফিরছেন, এমন সময়ে এক বুড়ী বললো—'আমাকে নদী পার করে দাও।' ভৃংমণি বুড়ীকে পিঠে করে নদী পার করে দিলেন। বুড়ী বললো,—'খুব খুসী হলাম তোমার উপরে। তুমি এই পাহাড়ে ওঠো, উঠে যতখানি দৃষ্টি যায় ততখানির মালিক তুমি হবে আমার আশীর্বাদে।' বলে, বুড়ী অদৃশ্য হয়ে গেল। ঐখানে এক মন্দির আছে—দাদির মন্দির; ভৃংমণি পাল ক্লান্ত হয়ে মন্দিরের চাতালে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। এদিকে অপুত্রক রাজা দত্তক নেবে। চারদিকে সুলক্ষণযুক্ত ছেলে দেখে বেড়াচ্ছে রাজমন্ত্রী রাজজ্যোতিষী। খুঁজতে খুঁজতে দেখে দাদির মন্দিরে শুয়ে আছে এক ছেলে, রাজলক্ষণযুক্ত রেখা তার দু'পায়ের তলায়। তারা তাকে তুলে নিয়ে গেল। ভৃংমণি পাল রাজা হলেন। সেই যে বুড়ীর আশীর্বাদ ছিল, যতদূরে চোখ যায় ততখানির মালিক হবেন,—এই পাহাড়ের সারি লাহল হতে লুরি পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব হ'ল।

রানী বললেন,—এই পাহাড়ে পাহাড়ীবাবা ছিলেন—এক মহাসিদ্ধ মহাত্মা বায়বী দেহ নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। লোকে এই দেখছে তাঁকে এখানে, ঐ দেখছে তাঁকে ওখানে। এই পাহাড়ের রাজত্বে সবত্র বিচরণ করতেন তিনি। পাহাড়ী-বাবার কৃপা পেয়েছে বহু বহু লোকে।

'আনি' নদীর ধার ধরে লাল লতা, হলুদ পাতায় ভরা গাছগাছড়া। শরতের রূপ। আনি নদীর জলে কাঠের পুল। জল বেড়েছে বোধহয়। স্রোতে ভেসে আসা কাঠের তক্তা জলের তোড়ে পুলের উপর দিয়ে হুড় হুড় করে পেরিয়ে যায়—পর পর একের পর এক। বেগবতী স্রোত, পাথরে পাথরে ঠোক্কর খেয়ে আটকে থাকে না পথ বন্ধ করে। বন হতে ব্যবসায়ী লোকের কাটা কাঠ এমনি করেই যায় দূরে দূরান্তরে।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। উপরে উঠি। আনি পড়ে থাকে নীচে।

পাহাড়ী প্রদেশ, পাহাড়ের ভিতরে ভিতরে গ্রাম—পাহাড়ের গা বেয়ে।

'চরাই' গ্রাম, চাষী, হরিজনদের গ্রাম। ঘিঞ্জি পল্লী। শীতের দেশ, জংগলের দেশ; শীতে ভয়ে যেন জড়াজড়ি করে আছে সব। সরু পথ, পাহাড় কাটা সিঁড়ি, গা ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ী, ছোট পাহাড়টার তলা হতে উপর পর্যন্ত বাড়ী—গোটা গ্রাম। কাঠের দোতলা বাড়ী, উপরে নীচে দুখানাই ঘর বেশীর ভাগ। নীচের ঘরে থাকে গরু ভেড়া, উপরের ঘরে থাকে সপরিবারে গৃহস্থ। মেঝেতে দরজা;—সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে কাঠের সিন্দুকের ডালার মতো মেঝের দরজাটা ফেলে দিলেই ঘর বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের মেঝেতে আগুন জ্বলে, তার চারদিক ঘিরে শোয় সকলে।

সারা শীতকাল ঘরে বসেই কাটায় প্রায়। পশুর জন্য ঘাস শুকিয়ে রেখে দেয়, মানুষের জন্য দানা জমিয়ে রাখে। কাঠ থাকে, আগুন থাকে, রুটি বানায়, খায়।

ঘরের ভিতর দিয়েই নীচের ঘরে যাবার কাঠের সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গরু ভেড়াকে খেতে দেয়; দুধ দুইয়ে আনে।

'চাবই' 'খানাং' 'সোজা' সব জায়গায় থেমে থেকে দেখে পথ চলি। কত রকম সমস্যা লোকের। প্রচুর সবজি হয় এসব জায়গায়। চাষী হরিজনরা বলে,—গত বছর এত আলু এত মটরশুঁটি হয়েছিল, শেষে ঘরে ঘরে সব পচে গেল। পথঘাটের

সুবিধে নেই যে সহরে কোথাও গিয়ে বিক্রি করে আসবো। ব্যবসায়ীরা এসে আমাদের কাছ হতে সবজি নিয়ে যায় নিজেদের গাড়ী বোঝাই করে। জায়গায় জায়গায় ধস নামলো, তারাও কেউ আর এলো না।

গাঁয়ের তরুণরা ভাবছে কি করবে? ভাবছে যুদ্ধে নাম লেখালে কেমন হয়? কিন্তু তারা যে গ্রাম ছেড়ে জীবনে কোথাও যায়নি কখনো। সবাইকে ছেড়ে, আপন মাটি ছেড়ে থাকতে পারবে তো সেখানে? সরল মনের যুবকদের দু'চোখে জল ভরে আসে।

এরা উলের বোনা জুতো পরে সকলে। লাল কালো নক্সা তুলে মোটা খস্‌খসে উলের জুতো বোনে নিজেরা নিজেদের জন্য ক্রুশ কাঁটা দিয়ে। নরম হয়, টেকসই হয়, ঠাস বুননের উলের জুতো গরমও রাখে পা। পথ চলতে পায়ে ফোসকা পড়ার ভয় নেই। চলতে চলতে জুতো ক্ষয়ে যায়, আবার নতুন বুনে নেয়। নিজেরাই তৈরী করে উল।

'জিলোরী পাস' দশ হাজার ফুট উঁচুতে। ভিজে স্যাঁতসেঁতে জায়গা। শীতে কাঁপতে কাঁপতে বনস্পতি ভরা পাহাড়ে চড়াই উত্‌রাই ভেঙ্গে চলি।

দলে দলে শ'য়ে শ'য়ে ভেড়ার পাল নিয়ে চলেছে পাহাড়ী পুরুষ। এদের পরনে সাদা উলের লম্বা জামা, লম্বা প্যাণ্ট। কোমরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক বোঝা বেতের লম্বা দাঁড় জড়ানো। বলে, বনে জঙ্গলে ঘুরি, পেটটাই আসল। দাঁতাল শুয়োর বুনোজন্তু আক্রমণ করে যদি—পেটটা রক্ষা করতে পারবো। পেটটা ফুটো হল তো প্রাণই গেল। আর, যদি কখনো এমন হয় যে, শিকার করতে করতে বনের ভিতরেই কেটে যায় দু'তিন দিন, তবে কোমরে জড়ানো দাঁড়গুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরো আঁট করে বেঁধে দিই—ক্ষিদের বোধ কমে যায়।

শীত পড়ার মুখে এরা ছাগল ভেড়া নিয়ে নীচে নেমে আসে। ছয় মাস নীচেই থাকে, গরমের সময়ে আবার উঠে যায় পাহাড়ে। নিয়ম—চলতি পথে রাত-বিরেতে গ্রামে যখন আশ্রয় নেয়, সেই গ্রামের লোক এদের থাকা-খাওয়ার ভার নেয়। পরিবর্তে এদের ভেড়া ছাগল তাদের জমিতে চরে বেড়ায়, পশুর মলমূত্রে সে জমি উর্বরা হয়।

'বাঞ্জোর' হতে সকাল নয়টায় রওনা হই। পথে 'মণিকারণ'—তীর্থস্থান; রাজপথ হতে অনেকখানি ভিতরের দিকে। এ পথের খবর সবাই জানে না। বেশী লোক আসে না, বাইরের লোকের ভীড় জমে না তেমন এখানে। বছরের বিশেষ বিশেষ তিথিতে ভীড় যা হয় তা এইসব তল্লাটের লোকেরই ভীড়।

বাঁয়ে পার্বতী নদী রেখে পথ। সুন্দর শোভন নদী। পার্বতীর তীর ধরে অনেকখানি অবধি ছায়াশীতল পরিচ্ছন্ন পথ। তারপর ঢুকলো পথ পাহাড়ের ফাঁকে। যত এগোই তত পথ নির্জন। বড় বড় ঝাউয়ের বন। বনের মধ্যে বনবিভাগের কর্মীদের কয়েক ঘর বসতি, ছোট্ট কয়েকটা গ্রাম, তীর্থপথের দু' চারটা চটি, চায়ের দোকান।

গাঁয়ের লোক বোধহয় সহরের হাটে গিয়েছিল, এখন ঘরে ফিরছে। লোক চলেছে পিঠে ভেড়া ছাগলের চামড়ার বস্তা ভরা মোট নিয়ে। ডাল চাল নুন আটা হবে হয়তো। চামড়াগুলি ছোট ছোট পশুর। হাত পা সমেত সেলাই করা, লোমের দিকটা ভিতরের দিকে। চামড়ার গলায় ফাঁস বেঁধে দড়িটা সামনের দিকে টেনে দু'হাতে ধরে আছে, দেখে মনে হয় ঠুঁটো হাত পা ছাড়িয়ে লোকের পিঠে চড়াও হয়ে বসেছে কবন্ধ পশুটা।

চলতে না পারার পথ, জীপ বলেই পারলো চলতে। অনেকখানি এগিয়ে দিল।

আর না। এবারে পাহাড়ের উপরে সরু চলার পথ, তারপর ঢালু। নীচে জলধারার উপরে সরু পুল পেরিয়ে পাহাড়ের গা ধরে চলতি পথ। আপন শক্তি ব্যবহার করা ছাড়া এপথে আসার অন্য উপায় নেই।

পাহাড়ের ভিতরে পাহাড়ের কোলে লুকনো মণিকারণ—তপ্ত জলের কুণ্ড। তীব্র তপ্ত। টগ্‌বগ শব্দ করে ফোঁটা তুলে ফুটছে জল। সেই জল নানা কুণ্ডে ভর্তি হয়ে পড়ছে নীচে গিয়ে। অবিরাম জলধারায় পাহাড়ের তলা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আছে। নীচে ঝরণার শীতল জলধারায় গরম জল মিশে উষ্ণ নদী বয়ে চলেছে। অনাবৃত অনাদৃত ছিল বহুকাল এই স্থানটি। পরে নানা সম্প্রদায়ের লোকেরা এর পার বাঁধিয়েছে, কুণ্ড বাঁধিয়েছে, ঘর তুলে দিয়েছে তীর্থযাত্রীদের বিশ্রাম নেবার জন্য। গুরুদ্বার হতে সাধু-সেবক রেখেছে। বহুদূরের পথ, তীর্থযাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে আসে। সাধু-সেবক তাদের অন্নব্যঞ্জন দেয়, জল দেয়। তারা খেয়ে তৃপ্তি লাভ করে।

এত যে দুর্গম পথ তবু অবিরাম লোক আসছেই। পাঁচ সাতজন করে দলে দলে কত লোক এলো আমরা থাকতে থাকতেই। গ্রামের লোক এলো, সহরের লোক এলো, সাধুসন্তও এলো কতজন। আমরাও এসেছি।

সবাই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জলে স্নান করছে। যেমন যেমন লোক আসছে, সাধু-সেবক সেইমতো মাথা গুনতি গরম গরম রান্না করে দিচ্ছে। স্নান সেরে তারা গরম ভাত ডাল আলুর ঝোল প্রসাদতুল্য খেয়ে নিচ্ছে।

অভিনব রান্নার কৌশল। এ রান্নায় কাঠ লাগে না, ভাতের হাঁড়ি কালো হয় না, বাসন মাজতে ঘষতে হয় না।

সাধু-সেবক সাদা চাদরের একদিনের খুঁটে আন্দাজ মতো চাল একটু ঢিলে করে বাঁধলেন। বেঁধে সেদিকটা তপ্ত কুণ্ডে ফেলে অন্যদিকটা গাছের ডালে বেঁধে রাখলেন। চৌবাচ্চা মতো কুণ্ডটি, ছোট বড় নানা আকারের পাথরে ভরা। সাধু-সেবক আলুর ঝুড়িটা এনে ঝুড়িটা ডুবজলে পাথরের উপর বসিয়ে দিলেন। জল নুন মিশিয়ে অড়হর ডালের পিতলের হাঁড়িটা হাঁড়ির বুকজলে রাখলেন।

আলু সিদ্ধ হয়ে গেল, ঝুড়ি তুলে নিলেন। খোসাগুলি ছাড়িয়ে ডুমো ডুমো করে তাতে নুন মশলা ঘি জল দিয়ে আর একটা পিতলের হাঁড়িতে করে জলে বসিয়ে দিলেন। জলে নুড়ি পাথর থাকার জন্য প্রয়োজন মতো নুড়ি সরিয়ে ডাল আলুর ঝুড়ি ভাতের জন্য গভীর অগভীর স্থান করে নিয়েছেন।

ভাতটা এতক্ষণে হয়ে গেছে—চাদরের আঁচলটা টেনে তুলে গাছের ডালে লট্‌কিয়ে দিলেন। ভাতের পোঁটলা হতে ফ্যানটা ঝরে পড়লো। ওদিকে ডাল সিদ্ধ হয়ে গেছে, তাতে ঘি মশলা দিয়ে তুলে ঘুঁটে নিলেন। আলুর ঝোলও ফুট খেয়ে তৈরী। এবারে পিতলের থালায় থালায় খাবার বেড়ে সবাইকে খেতে দিলেন। বাসমতি চালের সুগন্ধি সাদা ভাত, খাঁটি ঘি-এ রান্না আলুর ঝোল, অড়হরের ডাল, ক্ষিদের মুখে না হলেও—এ অমৃত।

ঝট্‌পট্‌ হয়ে যাচ্ছে সব। কলের মতো রান্না করে যাচ্ছেন, খাইয়ে যাচ্ছেন সাধু-সেবক দু'চারজন সহকারী নিয়ে। হাসিমুখ, ক্লান্তি নেই।

স্নান করবো। পুরুষের জন্য সুইমিং পুলের মতো বাঁধানো খোলা জায়গা, মেয়েদের জন্য ছাদ দিয়ে দেয়াল দিয়ে ঢাকা কুণ্ড। আসল কুণ্ড হতে জল খানিকটা বয়ে আসার দরুন কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে চৌবাচ্চাগুলিতে এসে পড়েছে। শীতে জড়সড় দেহ, ভেবেছিলাম গরম জলে অনেকক্ষণ গা ডুবিয়ে বসে থাকবো। বন্ধ ঘর বলেই বোধহয় পারলাম না, ভাপে গরমে মাথা ঘুরে উঠলো। এসে উপরের বারান্দায়

শুয়ে পড়লাম।

সুস্থির হয়ে সাধু-সেবকের রান্না ভাত ডাল আলুর ঝোল খেলাম। এ'র সংসার দেখলাম। গুরুদ্বারই বহন করে সকল খরচ, তবু যাত্রীরা যদি কিছু দেয় তাও গ্রহণ করেন।

কুণ্ডের কাছে পাহাড়ের মধ্যেই একটি গুহা, এই গুহাঘরে বাসনপত্র ঠাকুর-দেবতা নিয়ে থাকেন এ'রা। গুহাঘরের ভিতর দিকে আর একটি গুহা, বললেন,—এটি 'ঠাণ্ডিঘর'। শীতকালে আমাদের কারো বুকে ঠাণ্ডা লাগলে একদিন এ ঘরে থাকলেই বুকের সর্দি ভালো হয়ে যায়। বারো মাস থাকি আমরা এখানে, ঠাণ্ডা লাগেই শীতকালে।

গরম জলের দরুণ চারদিকের চাতাল ঘর সব তাপে তাতা। পাহাড় গুহাঘর সবই গরম, তবু গুহাঘরের ভিতরে ধুনি জ্বলে সর্বক্ষণ। গনগন গরম হয়ে আছে গুহাঘর।

পৌরাণিক কালের আখ্যানও আছে জড়িত এই স্থানের সঙ্গে। মণিকারণ তাই তীর্থস্থান।

পাহাড়ীবাবা শুনি রোজ ভোরে স্নান করতে আসতেন এখানে। থাকতেন তিনি শতেক পাহাড় দূরে। অথচ রোজ দেখতে পেত এখানকার লোকে সকাল বেলায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে পথের ঐ মোড়টা হতে পাহাড়ীবাবা হে'টে হে'টে আসছেন মণিকারণে। এসে স্নান করে ফিরে যেতেন। ঐ মোড়টা পর্যন্তই দেখা যেত তাঁকে, তারপর আর কেউ দেখতে পেত না। একদিনও তাঁর আসার অথবা যাবার সময়ের ব্যতিক্রম ঘটত না। কতবার নাকি কত লোকে চেষ্টা করেছে দেখতে যে দূর হতে পাহাড়ীবাবা আসছেন, চেয়ে আছে আগ্রহ ঔৎসুক্য নিয়ে; হঠাৎ দেখতে পায় মোড়ের মাথায় বাবা হে'টে হে'টে এগিয়ে আসছেন। এক পলক আগেও দেখা যায়নি তাঁকে।

গোলাপী কস্‌মস্‌ হাসি ফুটিয়ে তোলে বনের কোণে। রাত্রি নয়টায় এসে পেঁছুই 'মানালী'তে।

অনেক 'হিল ষ্টেশনের' চেয়ে নিরিবিলি মানালী। সমতলভূমির লোক যারা গরমে ছুটি কাটাতে আসে পাহাড়ে, তাদের খুব কম সংখ্যকই আসে এখানে। ভীড় ঠেলে, কাছের স্থান ছেড়ে মানালী আসা—এটা একটা সৌখীন ব্যাপার।

মানালী তাই পরিষ্কার সুন্দর; পথ বন ভীড়হীন। বাজারে কোলাহল নেই, বাড়ীগুলি শান্ত।

মানালীতে আছি গেষ্টহাউসে। এদের প্রায় সবার বাড়ীর আঙিনায়ই গেষ্ট-হাউস। হোটেলের মতো ব্যবস্থা, বাড়ীর লোকেরাই দেখাশোনা করে। আধুনিক অসবাবে সাজানো ঘর।

অনেকদিন আগের বৃটিশ আমলের কথা;—ইংরেজ মেজর রিটায়ার করে আর দেশে ফিরে গেলেন না। এখানেই পাহাড়ে পাহাড়ে বিস্তৃত জমি নিয়ে আপেলের চাষ করে থেকে গেলেন। বাড়ীঘর বানালেন, পাহাড়ী মেয়ে বিয়ে করলেন। তার-পরে তার ছেলেরাও আপেল চাষ নিয়ে এখানেই রইলো, তারাও পাহাড়ী মেয়ে বিয়ে করলো। এখন ভাই-এ ভাই-এ ভাগ হয়ে গেছে বিষয়-সম্পত্তি। বংশ বিস্তার করেছে। মেজরের ছেলের ছেলেরা নানা কাজে বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে, কিছু কিছু এখানেও আছে। সবাই সবার বাড়ীতে 'গেষ্ট হাউস' রেখেছে। বাড়তি একটা

আয় সহজেই হয়ে যায় এতে করে।

মেজরের বড় ছেলের বাড়ী এটা। মাঝখানে আঙিনা, আঙিনার এধারে গেষ্ট হাউস, ওধারে এদের বাড়ী সংসার। সকাল থেকে ওরা গৃহকর্ম করে, আঙিনার পথ ধরে রান্নাবাড়ী যায়, ব্যস্তভাবে নানা কাজে ছুটোছুটি করে। সব দেখি বসে বসে।

আমাদের ঘরের সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে, পিছনে, আঙিনায়—কত আপেল গাছ। এখন আপেলেরই সময়। গাছে গাছে আপেল ধরে আছে সিঁদুরে আমের মতো, তলায় ছড়িয়ে আছে কুল বোড়ইর মতো। এত আপেল গাছ—আপেল গাছের জন্য আলাদা যত্নের তোয়াক্কা নেই। শশার লতাটা তুলে দিয়েছে আপেল গাছেই। আপেল, শশা ঝুলছে আঙিনায় এক সাথে।

বয়সে প্রবীণা একটি স্থূলকায়া, আর বয়সে একটু কম একটি ক্ষীণাঙ্গী—এই দুটি মহিলা বাড়ীতে বেশী ঘোরাঘুরি করেন দেখি, কিন্তু বাড়ীর আসল কর্ত্রীকে বুঝে উঠতে পারি না। সকাল না হ'তে স্থূলকায়া মহিলাটি বাড়ীর চারদিকে ঘুরে গোলাপ, ডালিয়া তুললেন দেখলাম। আঙিনার কোণে আলাদা করে একটি ছোট ঘর। ক্ষীণাঙ্গী মহিলাটিও একগোছা ফুল নিয়ে সেই ঘরের বারান্দায় রেখে দিলেন। এক বালতি জলও রাখলেন। এই মহিলাটিই সারা বাড়ী ছোটাছুটি করেন সারাক্ষণ। লেপ তোষক রোদে দেন, গোয়াল ঘরের দরজা খোলেন, আপেলের ঝুড়ি ঘরে তোলেন। কোমরে চাবি নিয়ে সারাদিন তার বিরাম নেই কাজের।

ছোট ঘরটায় বড় মহিলাটি ঢুকলেন। পায়ে পায়ে আমিও সেখানে গিয়ে দাঁড়াই; একখানা আসন হাতে ছোট মহিলা ছুটে এসে বারান্দায় পেতে দিলেন আমাকে বসতে। বসে পড়লাম।

বড়জন ঘরের তালা খুললেন, বালতির জল দিয়ে ফুলদানীতে জল ভরলেন, ফুল রাখলেন, ধূপ দীপ জ্বালালেন, আসনে বসলেন। বসে পাশের একটা কাঠের বাক্স হ'তে বই বের করে পড়তে লাগলেন।

পুজার ঘর এটি, শুধু বড়জনেরই।

বললেন, আমরা দুইজন একজনের। ও আমার সতীন, আমার ছোট। স্বামী মারা গেছেন অনেকদিন হ'ল। আমার একটিই ছেলে, সে থাকে বাইরে, মিলিটারীতে কাজ করে।

একটু দুঃখী দুঃখী ভাব এর। ইনি হিন্দু, ছোট বৌ ক্রিশ্চান। ছোট বৌরও একটিই পুত্র। সে-ই এখানকার সবকিছু দেখশোনা করে, বিয়ে করেছে স্থানীয় এক মেয়েকে। ছোট গিন্নি খুব খুসী, ছেলের ঘরে চার নাতি-নাত্নি। তার ঘর ভরা।

মানালীতে 'হিড়িম্বা মন্দির' বিখ্যাত। হিড়িম্বা দেবীর প্রসিদ্ধি এ তল্লাট জুড়ে। শুনি তারই রাজত্ব ছিল এখানে।

পাহাড়ের উপরে বনের মধ্যে অতি পুরাতন মন্দির, পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরী। মন্দিরের সামনে কাঠের দরজা, পুজারী পুজা সেরে চলে গেছে ঘরে। দরজা বন্ধ। ঠেলা দিলে ফাঁক হয়ে যায়, নড়বড় করে দরজা, মনে হল আর একটু ঠেলাঠেলি করলেই খুলে যাবে দোর। বাইরে থেকে দেখা যায় না কিছু, কিন্তু কোথায় যে কি একটু আট্কিয়ে আছে, কিছুতেই খোলা গেল না তা।

অগত্যা পুজারীর উদ্দেশেই লোক পাঠানো হল। পুজারীও বাড়ী নেই। পুজারীর স্ত্রী এলেন হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে। দরজার ফাঁক দিয়ে সেই ডাণ্ডা ঢুকিয়ে কি একটা তুললেন, কি একটা ফেললেন,—দরজা খুলে গেল।

মন্দিরের ভিতরে একটা পাহাড়, পাহাড়ের গুহায় হিড়িম্বার বিগ্রহ। পাথরের মূর্তি, ছোট। আসল মূর্তি নিয়ে গেছে কুলুভ্যালিতে, দশরার উৎসবে। কুলুর দশরা উৎসব বিরাট উৎসব। আশেপাশের পাহাড় হতে, গ্রাম হতে তিনশ' দেব-দেবীর বিগ্রহ আসে এই উৎসবে যোগ দিতে। সেই অনুপাতে আসে মানুষ। একদিন গিয়ে থেকে দেখে এসেছি মেলা। কুলুভ্যালির বুকে মস্ত এক খোলা প্রাঙ্গণে জমে এই মেলা।

মেলার প্রধান হলেন 'রামজী'। রামজীর রথ মানুষে ঠেলে নিয়ে এলো। বাদ্য-ভাণ্ড শিঙা সানাই, সাজসজ্জা জলুস হৈ-চৈ—সে এক বিরাট মিছিল। মহা আড়ম্বরে রামজী এলেন। মাঠের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ তাঁবুতে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা—সোনায় রূপোয় জরি ঝালরে ঝলমলে দৃশ্য। পূজারী ব্রাহ্মণের হুড়োহুড়ি, ব্যস্ততা, শান্ত্রীর দল পাহারা দিচ্ছে, ভীড় আগলাচ্ছে, সে এক ব্যাপার।

মাঠ জুড়ে শত শত তাঁবু। অন্যান্য দেবদেবীরা এসেছেন রামজীকে প্রণাম জানাতে। তাদেরও জলুস কিছু কম নয়।

পৌর্ণমাসীতে রাবণ বধ হয়েছিল। সেদিন রামজী ফিরে যাবেন আপন মন্দিরে। রামজী গেলে 'প্রোটোকল' অনুসারে দেবদেবীরাও ফিরবেন আপন আপন মন্দিরে। মেলার কয়দিন সকলের মন্দিরে 'ডুপ্লিকেট' বিগ্রহ বিরাজ করবে।

হিড়িম্বা দেবীর পূজারীর স্ত্রী মাঝবয়সী, শ্যামল রং; স্নিগ্ধশ্রী মুখখানায়। হেসে তার নিজের বাড়ীতে যাবার জন্য আহ্বান জানালেন। বললেন,—এতটা যখন এসেছ—আর একটুও এসো। আমার বাড়ী দেখে যাও।

মনে মনে ইচ্ছেও ছিল এদের বাড়ীর ভিতরে ঢুকবার, এদের গৃহস্থালি দেখবার। নইলে যেন নতুন জায়গা দেখা হয় না পুরোপুরি। নতুন মানুষ জানা যায় না, মনের কাছাকাছি আসে না।

খুসী মনে পূজারীর স্ত্রীর সঙ্গে পথ চলি। এবারে পায়ে হেঁটে চলি। ভেজা ভেজা খড়ের গন্ধ নিয়ে চলি। গৃহস্থের গোয়াল ঘরের পাশ কেটে চলি।

পূজারীর স্ত্রী বলতে বলতে চলেন,—এরা আমাদের আপেল ক্ষেতে মজুর খাটে। এরা চাষী লোক, নিজেদেরও জমি জায়গা আছে। এটি আমার জ্যাঠ্শ্বশুরের ঘর, ছেলেরা সিমলা চণ্ডীগড়ে কাজ করে, বুড়োবুড়ি থাকে শুধু এখানে।

পূজারী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। পাথরে কাঠে তৈরী দোতলা বাড়ী। উপরে নীচে ছয় সাতখানা ঘর, রেলিং ঘেরা বারান্দা। আঙিনায় লম্বা গোয়াল ঘর, ঘাসের ঘর। শুক্নো ঘাস জমিয়ে রাখে সেই ঘরে ছয় মাসের মতো। শীতকালে বরফ পড়ে, সেই সময়ে গরু ছাগল ভেড়া খায়।

একটি গৌরবর্ণের গোলগাল মেয়ে, বয়েস এদের বোঝা ভার, পিঠে একটি শিশু বাঁধা,—কম্বল তোষক রোদে দিচ্ছিল। পূজারীর স্ত্রী তাকে দেখিয়ে বললেন,—এটি আমার সতীন। আমার সন্তান হয় না, অনেক বছর হয়ে গেল; শেষে আমি আমার স্বামীর বিয়ে দিলাম আমার আপন ভাইঝির সঙ্গে। এই আমার ভাইঝি। ভাইঝির ঘরে সন্তান হল, পরে আমারও সন্তান হল। এখন আমরা দুই সতীন স্বামী-পুত্রকন্যা নিয়ে সতেরোজন মানুষ বাড়ীতে।

পূজারীর স্ত্রীর মুখখানি পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে ভরে গেল। বললেন,—এখন আমার ঘর ভরা।

পূজারীর স্ত্রীর আদেশে ছোট সতীন একটা প্লেটে আপেল এনে দিল, ছুরি দিল। পূজারীর স্ত্রী কেটে কেটে দিতে লাগলেন। রসে ভরা তাজা আপেল,—এর স্বাদই আলাদা।

এদের ঘরে রেডিও, সেলাইর মেশিন, টর্চ, বর্ষাতি। এছাড়া পালঙ্ক চেয়ার কুশন টেবিল বাতি। আধুনিক আরামের জিনিষে, গরু-ছাগলে, খেতিখামারে পরিপূর্ণ গৃহস্থালি।

ছোট সতীন-কন্যা কি একটা নিয়ে আবদার করছিল কিছুক্ষণ ধরে। মার কাছে পাত্তা না পেয়ে বড়মার কোল ঘেঁষে এসে কাঁদছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বড়মা স্নিগ্ধ হাসি হেসে স্নেহে আদরে ভুলিয়ে দিলেন তাকে।

বাড়ীর কর্ত্রী বড় সতীন। ছোট সতীন তার আদেশ নির্দেশ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে; দুই সতীনের নির্বিবাদের সংসার।

পূজারীর স্ত্রী জানেন আমরা আছি ব্যারনের বাড়ীতে। তাই হেসে বললেন,—আমরা দুই সতীন লড়াই করি না ব্যারনের দু' বৌ-এর মতো। শান্তিতে আছি আমরা। দেখেশুনে আমিই তো এনেছি ওকে ঘরে। কোঁদল কেন করবো তবে?

পাহাড়ের ঢাল পর্যন্ত—যেখানে জীপ অপেক্ষা করছে সেইখান পর্যন্ত পেঁছে দিলেন আমাকে পূজারীর স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে এসে। এক থলি আপেল দিয়ে দিলেন নিজের বাগানের। গাছভরা জাপানী ফল ঝুলছে, লাল টুকটুকে জাপানী গালার খেলনার মতো। সেদিকে তাকিয়ে বললেন,—এখনো এগুলি পাকেনি ঠিক-মতো, নয়তো তুলে দিতাম। এখন দিলে খেতে পারবে না রেখে দিলে পচে যাবে। আবার এসো, এসে আমার বাড়ীতে আমার সঙ্গে সংসারের একজন হয়ে মিলে-মিশে থেকো—যতদিন তোমার ইচ্ছা।

পূজারীর স্ত্রীর পরনে লম্বা গাউনের মতো ফ্রক, তার উপরে আঁট জ্যাকেট গায়ে। মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা। রুমালের টকটকে হলুদ রংটা পাহাড়ের বাঁক ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ অবধি দেখা গেল। পথের ধারে পাথরটার উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি।

মানালীর চারিদিকে কুলু নদীর জলের নালা কুলকুল করে বইছে। স্ফটিক জল। যার যেমন প্রয়োজন টেনে নিয়েছে নালা কেটে।

মানালীতে আছে এক অতি পুরাতন দেবদারু বন। হলুদ পাতায় ছাওয়া বনভূমি। এ বন একবার লোকে কাটতে আরম্ভ করেছিল; তখন এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট্ ছিলেন এখানে, লোকে বলতো 'পাগ্‌লা সাহেব', সেই পাগ্‌লা সাহেব এ বনে 'এনসিয়েণ্ট মনুমেণ্ট্‌স্ প্রটেক্‌শন অ্যাক্ট' চালু করে দিলেন। এ গাছ কাটা বে-আইনী সাব্যস্ত হ'ল।

বনের গাছের জন্য এই অ্যাক্ট—পাগলা সাহেবের কীর্তিতে আজও লোকে হাসে, আর মনে মনে কৃতজ্ঞ হয়। এভাবে এ বন রক্ষা না পেলে আজ মহীরুহের এই বিশাল রূপের সমাবেশ থাকতো না মানালীতে। কদাচিৎ মেলে এমন বন। জমাট ছায়াচ্ছন্ন বন। দিনের আলো গোধূলি হয়ে ঢোকে ভিতরে।

বনের পাশে ঝরণার জলের ধারার মাঝখানে বড় একটি উপলখণ্ড। জলধারা দু'হাতে পাথরটাকে থাব্‌ড়ে থাব্‌ড়ে চলে যাচ্ছে, জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। শিলার উপরে বসে বসে দেখছি খেলা। নিবিড় বনচ্ছায়ায় কয়েকটি তরুণ-তরুণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। মন্থর গতি তাদের। কখনো তাদের পা ঘাসে পড়ছে, কখনো পাথরে, কখনো বা ছলছল জলধারাতে।

ঝরণার জল ছোট মেয়ের 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' খেলার মতো ছড়িয়ে পড়েছে সারা বনে। সবুজ ঘাস জঙ্গলের ফাঁকে, পাথরের ধারে, ঘন অরণ্যে সাদা জলের রেখাটুকু থেকে থেকে চিক্‌চিক্ করে ওঠে।

মিসেস্ ব্যারন—ছোট গিন্নি আজ বড় ব্যস্ত। কাটা ঘাসগুলি শুকোয়নি কাল

ভালো করে, তাই ঘরে তোলা হয়নি। গত রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঘাসগুলি ভিজেছে। ঐ ঘাস শীতের কয়মাসের জন্য জমিয়ে রাখতে হবে। ঘাস রাখবার জন্যই মস্ত এক ঘর। ঘাসে জল থাকলে বন্ধ ঘরে সব যাবে পচে। দু'দিন আগে কেটে এনেছেন ঘাস। পুত্র আর পুত্রবধু নিয়ে সারাদিনের জন্য গেলেন সহরের বাইরে। লরী বোঝাই করে নিয়ে এলেন কাটা ঘাস।

ছোট গিন্নি খামার বাড়ীর উঠোন জোড়া ঘাসগুলি লম্বা একটা লাঠি দিয়ে উল্টেপাল্টে দিচ্ছেন। তাড়িঘাড়ি করে চলেছেন কাজ। আজ আবার চণ্ডীগড়ের এক মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করেছেন রাত্রে খেতে। উঠোন পেরিয়ে কতবারই ছুটলেন রান্নাঘরের দিকে। তেমনি করে ছুটে এসেই বললেন যে, আমরাও যদি মন্ত্রীর সংগেই খাই তবে এদের শ্রম একটু বাঁচে। নয়তো দু'বার করে আলাদা আলাদা টেবিল সাজাতে হবে, খাবার দিতে হবে,—সময়ও আগু-পিছু হয়ে যাবে।

এই মন্ত্রীকে জানি। যেদিন প্রথম দেখা হয় এ'র মুখ থেকেই শুনেছিলাম কাহিনী। এ'র আপনজনরা সকলে নিহত হয়েছেন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়ে পাঞ্জাবে। তাঁর দাদার স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। দাদা চাইলেন স্ত্রীকে আগে অন্যত্র সরিয়ে দিতে। স্ত্রী রাজী হলেন না স্বামীকে বিপদের মুখে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে। ভাই-এর সঙ্গে ভ্রাতৃবধুও নিহত হলেন।

করুণ মুখে করুণতর হাসি টেনে বলেছিলেন শ্রীপ্রেমসিং প্রেমী—পরিবারের সবাই মারা গেলেন, বেঁচে রইলাম শুধু আমি। বাঁচলাম—তখন আমি জেলে ছিলাম বলে।

মানালী হতেই এক একদিন এক একদিকের পাহাড়ে গ্রাম দেখে আসি। দর্শনীয় মন্দির, কুন্ডও দেখি। বশিষ্ঠ কুন্ড দেখে এলাম একদিন। 'রোটাং পাস' অবধি রাস্তা তৈরী হচ্ছে, তাও দেখতে চলি একদিন। পায়ে চলে, খচ্চরে চেপে যারা যায়—তারা বেশ যায়। জীপের পথ তৈরী হয়নি এখনো সবটা। সবে পাহাড় মাটি কেটে বড় বড় পাথরের খন্ড ফেলা হয়েছে পথে। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে যদি বা উঠতে পারে জীপ—এই ভরসায় চলেছি। কিছু কিছু পায়ে হেঁটে উঠবোও বা না হয়।

দলে দলে তিব্বতীরা পাথর ভাঙছে, পথ কাটছে। পথের ধারে ধারে তাঁবু পড়েছে তাদের। সাদার উপরে নীল কাপড়ের ডোরাকাটা তাঁবু। মেয়েদের পরনে কালো রং-এর লম্বা লম্বা জোব্বা, গলায় বড় বড় দানার রঙীন পাথরের মালা। তাঁবুর আশেপাশে ঘুরছে, বাটি হাতে চা খাচ্ছে, পাথরের উপরে বসে উল বুনছে। দেখে কে না বলবে যে সৌখীন সব দল 'এক্সকারশনে' এসেছে।

তাঁবুর ভিতর ঘরকন্না। তাঁবুতে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ে মাঝখানে দালাইলামার ছবি বসানো, সিংহাসন পাতা। সামনে সারি সারি ছোট ছোট তামার বাটিভরা জল,—তাদের পুজার অর্ঘ্য। দালাইলামাকে মাঝখানে রেখে দু'পাশে এদের বিছানা, গদি, আহারের সামগ্রী। ছোট্ট কয়েক হাত পরিসরে জীবন-ধারণের যাবতীয় কিছু। তারি মধ্যে রাঁধবার উনুন এক কোণে, অবিরত গরম জল ফুটছে হাঁড়িতে।

হাসিমুখ সকলের।

হাসিমুখে দালাইলামার ছবির পিছন হতে একটা টিনের কৌটো বের করে খুলে ধরলো সামনে তাঁবুর কর্তা। লজেন্স ভরা কৌটো, একটা করে লজেন্স তুলে নিলাম আমরা।

রোটাং পাস বারো হাজার উঁচুতে, তারপরে লাহোল, স্পিটি অঞ্চল। এর পরেই

তিব্বতের বর্ডার। যেমন এদিক হতে পথ তৈরী হচ্ছে তেমনি লাহোল, স্পিটি হতেও হচ্ছে পথ। মাঝখানে কিছুটা পথ হেঁটে আসতে-যেতে হয় এখনো, নয়তো খচ্চরে চড়ে। দুর্গম এ পথ।

এই পথেই পাহাড়ের মাথায় রোটাং পাস, মেঘে কুয়াশায় সমাবৃত। তাঁবু ফেলা খান তিন চায়ের দোকান, দোকানের ভিতরে থাকবার একটু স্থান। পান্থজনরা এখানে এসে বিশ্রাম নেয়, চা খায়, রাতবিরেতে জলে ঝড়ে তাঁবুতে আশ্রয় নেয়। তাঁবুর ভিতরে একধারে অতিথিদের জন্য মোটা কম্বলের কার্পেট পাতা। একগাদা কম্বল ভাঁজ করে রাখা, গায়ে দেবার জন্য।

তিন জোড়া তিব্বতী দম্পতি,—স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলেই চালায় দোকান। বছরের প্রায় বেশীর ভাগ মাসই থাকে এরা এখানে। এদের সঙ্গে থাকে এদেরই এক এক দল সন্তান। বছরের এ'মাথায় ও'মাথায় বোধহয় জন্ম এদের—দেখে মনে হয়। শিশুদের নিয়ে কোনোরকম ঝঞ্ঝাট ভাবনা নেই যেন পিতামাতার মনে। তারা আপন-মনে পাহাড়ে খেলে বেড়ায়, ক্ষিদে পেলে তাঁবুতে ঢুকে মোটা একখানা রুটি খেয়ে নেয়; নাকের সর্দি হাত দিয়ে ডলতে ডলতে খাওয়া হয়, খেলা হয়।

মুহুর্মুহুঃ মেঘ আর রোদ্দুর, আলো আর ছায়া—আসছে আর যাচ্ছে। হঠাৎ একটু রোদ উঠলো ঝিলিক দিয়ে। চার-পাঁচ বছরের গুটি পাঁচ-সাত বালক-বালিকা ঘরকন্না খেলতে বসলো খালি পাথরটার উপরে শিশু ভাইবোনগুলিকে কোলে কাঁখে নিয়ে। ছেলেরা ছুটে ছুটে পাহাড়ের ঘাস পাতা ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে আনছে, অর্থাৎ সওদা করে আনছে শাকসব্জী বাজার হ'তে। ওরি মধ্যে বড় মেয়েটি রান্না করছে বসে, বাড়ীর গিন্নি সে। শাক হয়ে গেছে, রুটি বানাচ্ছে। জল দিয়ে মাটিটা মেখে এ'হাতে ও'হাতে থাব্ড়ে রুটি বানিয়ে তাওয়াতে দিল। টিনের কৌটোর ঢাকনার তাওয়া। নুড়ি বসানো উনুনে কাঠটা কাঠিটা একটু ঠেলে দিল, ধূলিমুঠো আগুনে রুটিটা সেঁকলো। পরে উনুনের গা' লাগিয়ে একটার উপর একটা রুটি থাক করে সাজিয়ে রাখলো। প্রতিবারই একখানা করে রুটি রাখে আর উনুন হ'তে ভাঙা চিল্তে টিনের খুন্তিতে করে একটু ছাই পাকা গিন্নির মতো হাতটা একটু ঝাঁকিয়ে ঠিক রুটিটার উপরে ছড়িয়ে দেয়।

রন্ধন পদ্ধতিতে এতটুকু ত্রুটি নেই। এদের মাদেরও দেখলাম, তাঁবুর ভিতরে মোটা মোটা রুটি—এক একটা থালার মতো বড়—বানিয়ে বানিয়ে উনুনের পাশে একের উপর এক থাক করে রাখছে। প্রতি রুটির উপরেই গরম ছাই ছিটোনো। ভাপের বাষ্পে নরম হবে না রুটি, শুক্নো ছাই টেনে নেবে। খাবার সময়ে ঝাড়া দিলেই ছাইটা পড়ে যাবে।

রান্না রান্না খেলা শেষ না হ'তেই ছেলের দল খেলা ফেলে হৈ হৈ করে যে যার তাঁবুর দিকে ছুটলো। মেঘ এলো, গুঁড়ি গুঁড়ি বারিকণা ছড়িয়ে ঢেকে দিল পাহাড়। মেঘ চলে গেল, ছেলের দল হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে ফেলে যাওয়া খেলা নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

আমরা কতটুকু সময়ই বা আছি পাহাড়ের মাথায়, এরি মধ্যে এ রঙ্গ কতবার দেখলাম।

'পাহাড়ের ঢালু গা' ভরা নানা বর্ণের ঘাসফুল আলো করে আছে।

কানে মাথায় লাল ফুদ্নার কদমফুল ঝুলিয়ে কত খচ্চর পথ পার হ'য়ে গেল পিঠে বোঝা নিয়ে।

দলে দলে লোক পাহাড়ের মাথায় উঠে গরম চা খেয়ে আবার চলতে সুরু করলো, কেউ লাহোল আর স্পিটির দিকে, কেউ মানালীমুখী।

আমরা নেমে এলাম।

মানালীতে আজ শেষ দিন। বাড়ীর পাশেই পথ, পথের পাশে মস্ত এক 'চেষ্টনাট্' গাছ। তলায় সারাক্ষণ ছোট ছেলের ভীড়। ধুত্রো গোটার মতো ফলগুলি মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফট্ করে ফাটে, আর ছেলের দল হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে তার উপরে। কে কুড়িয়ে নেবে আগে। ভিতরে বাদাম। কাঁচা-কাঁচা বাদাম খুলে খুলে খায়। গাছের তলায় এ' এক দৃশ্য।

ছোট ব্যারন-গিন্নি আজ আপন নাতি-নাতনীদের নিয়ে চেষ্টনাটের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পিঠে বাঁধা সকলের ছোট নাত্নীটি। একটা করে ফল পড়ছে. ফট্ করে শব্দ হচ্ছে, ব্যারন-গিন্নি ছুটে গিয়ে ফলটা মাড়িয়ে দিচ্ছেন। পায়ের চাপে ফলটা দু' ফাঁক হয়ে গেল। দুটো করেই চেষ্টনাট্ থাকে ভিতরে। তার নাতি-নাত্নীরাই পেল সে ফল। পাড়ার অন্য ছেলেরা খালি ছুটোছুটিই করলো।

মানালীতে ব্যারনদের প্রাধান্য। আপেলের ব্যবসাতেও এদের খ্যাতি।

মানালী হ'তে কুলু আসতে পথে পড়ে 'নগর'। পথ হ'তে অনেকখানি ভিতরে পাহাড় দিয়ে ঘেরা পাহাড়ের অন্তরালে জনবসতি নিয়ে 'নগর'—পাহাড়। সহর হ'তে দূরে অতি নির্জন এক অঞ্চল। চারিদিকের স্তব্ধ পাহাড়ে রামধনুর সাত-রঙের আসা-যাওয়া চলেছে দিনেরাতে চোখের সামনে। রঙে রঙে রঙীন পাহাড়ের মাঝখানে 'নগর' পাহাড়। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দেখতেই হয় রূপের এই ঐশ্বর্যকে।

রং-পাগল পাহাড়-পাগল শিল্পী রোরিক এসে বাড়ী করেছিলেন এই 'নগরে' পাহাড়ের রূপ দেখতে। পাহাড়ে পাহাড়ে এখনও দেখি তাঁর আঁকা ছবি পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে. উন্মুক্ত আকাশের তলে দু'চোখের সামনে, যা' তিনি ক্যানভাসে ধরে ধরে রেখেছেন যত্নে।

পাহাড়ের একধারে অনেকখানি জমি-জায়গা নিয়ে সাজানো সুন্দর বাড়ী আর বাগান করেছিলেন রোরিক। করেছিলেন আপেল বাদাম নাসপাতির বন।

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ দেবীকারাণী থেকেছেন এখানে কিছুকাল। এখন কেউ থাকেন না, শুধু আসেন মাঝে মাঝে। নীচের ঘরে রোরিকের আঁকা ছবি আছে টাঙানো, কিছু দর্শক যারা আসে, দেখে; বাগান বাগিচা ঘোরে। শূন্য পুরী বোবার মতো তাকিয়ে থাকে।

'কেয়ার টেকার' আছে, দেখাশোনা করে। সারি সারি ট্রেতে চেষ্টনাট রোদে শুকোচ্ছে। বাগ-বাগিচা হতে আয়ও হয় বেশ। কয়েক কেজি চেষ্টনাট কিনে নিলাম। শুকনো চেষ্টনাট সিদ্ধ করে মাখন দিয়ে গরম গরম খেতে সুস্বাদ লাগে।

এককালে 'নগরের' এই ঝিমিয়ে পড়া হাল ছিল না। জনমানবে জম্জম্ করতো। রাজা থাকতেন, প্রজা থাকতো, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা থাকতো স্থান।

সেকালের 'নগরের' রাজপ্রাসাদ আছে এখনও ভগ্নদশায়। আগাগোড়া কাঠের তৈরী বিরাট রাজবাড়ী। সদর মহল অন্দর মহল দরবার ঘর, কোর্ট-কাছারি খুপ্রী-খাপ্রি অন্ধি-সন্ধি—কত কী। রাজবাড়ী এখন পি, ডবলিউ, ডি'র গেষ্ট হাউস। উপরতলার কয়েকখানা ঘর বাসোপযোগী করে সাজানো—পুরাতন রাজ-আসবাবপত্র দিয়েই। উপরের ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাজা দর্শন দিতেন প্রজাদের। নীচে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সবুজ ঘাসে ঢাকা। তার পরে পাহাড়ের গা বেয়ে ঢালু বাগান, বাগানের নীচে পথ, পথের পরে শস্য ক্ষেত দূরের পাহাড়ের পা ছোঁওয়া। এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবুজ প্রাঙ্গণের দিকে তাকালে সত্যিই নিজেকে যেন কত বড় মনে হয়।

'নগরে' ত্রিপুরাসুন্দরী. শিব, রাধাকৃষ্ণ, বিষ্ণু—সকলের মন্দির আলাদা

আলাদা। শিবের মন্দির পাথরের, অনেকটা ছোট আকারে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মতো। গায়ে খোদাই নক্সা। ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির কাঠের।

'নগরে' আকাশে ঘাসে পাথরে মাটিতে রং-এর ছড়াছড়ি। সোনার বরণ শস্যে ভরা ক্ষেত দিকে দিকে। কত রং বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। 'নগর' সুন্দর, নগরের সবার বাড়ী সুন্দর।

শর্বরী নদী পেরিয়ে এলাম কুলুতে। নীচে বয়ে চলেছে 'বিয়াস' নদী কুলুভ্যালির ভিতর দিয়ে।

এলাম বিলাসপুরে। বিলাসপুরের রাজার রাজবাড়ী রাজধানী সব এখন জলের তলে। ভাক্‌রা নাঙ্গলের রিজার্ভার সেখানে। মস্ত লেক। অনেকে বলেছিল, রাজবাড়ী ভেঙ্গে তুলে আনতে। দেখা গেল ভেঙ্গে তুলে আনতে যে খরচ পড়বে, তা'তে নতুন জায়গায় নতুন করে রাজবাড়ী তোলা সহজ। সে-বছর বৃষ্টি হয়েছে কম, জল শুকিয়ে গেছে অনেক। রাজবাড়ীর চূড়া দেখা যায়, জল হতে মাথা তুলে আছে লেকের মাঝখানে।

লেকে প্রচুর মাছ। মাছ এখানে সস্তা।

সিমলা এলাম।

গরমকালে বাইরের লোকের যে ভীড় হয় তা' এখন নেই, ভীড় এখানকার লোকেরই। ব্যস্ততা ফল ব্যবসায়ীদের। আপেল চালান দেবার সময় এখন। বাসে লরীতে স্তূপাকার আপেলের বাক্স, চলেছে নীচে। পথে পথে বিরাম নেই মাল ওঠা-নামার।

রোদে আলোয় ফুলে ফলে ঝিক্‌মিক্‌ করে সহর।

সিমলা থেকে এলাম নারকান্দায়।

বারো বছর আগে এসেছিলাম একবার। অভিজিত তখন কিশোর, ছিল সঙ্গে। তখন পথঘাট এত ভালো ছিল না এখানে। সেই সেবারকার রেস্টহাউসে এবারও আছি। সেবার ছিল ছোট একটা ডাকবাংলোর মতো বাড়ী। নীচু স্যাঁতসেঁতে মেঝে। ঝরণার জল, জলের টানাটানি। মনে পড়ে সেবারে খাবার পরে প্লেটগুলি ময়লা একটা ঝাড়ন দিয়েই মুছে মুছে রাখলো পাহাড়ী পাচক—বাথরুমের জানালা দিয়ে দেখলাম ব্যাপার রান্নাঘরের। অভিজিতও দেখলো, দেখে হেসে কুটিকুটি।

এখন সেখানে মস্ত বাড়ী, 'আপটুডেট' সাজানো। ডান্‌লোপিলোর বিছানা, পুরু কার্পেট, কাঁচে ঢাকা লম্বা বারান্দা, বাইরের ঠাণ্ডা ভিতরে ঢুকতে পায় না। সামনে লন। বয় বাবুর্চি—সেই চেহারাই বদলে গেছে আমূল।

নারকান্দায় আলু হ'ত খুব। তখন এখানকার লোক আলু খেতে জানতো না। এখন খায়। এখন সামনের দোকানীদের বালক-বালিকারা বইখাতার ব্যাগ পিঠে ঝুলিয়ে স্কুলে পড়তে যায়।

সেবারে কাছের পাহাড়ের জঙ্গল ছিল আরো ঘন। দিন সাতেকের একটা বাঘের ছানা ধরে এনেছিল জঙ্গল হ'তে কাঠুরে এক। সেই ছানা কাঠের বাক্সে ভরে আমাদের উপহার দিতে এনেছিল এখানকার লোকে। বেড়ালের মতো আকারের সাতদিনের বাঘের বাচ্চার সে কী রাগ, সে কী মুখ খিঁচুনি—ফোঁস-ফোঁস্‌ শ্বাস!

নিতে সাহস পাইনি।

সেবারেই আলাপ হয়েছিল ষ্টোক্‌স্‌দের সঙ্গে। যুবক ষ্টোক্‌স্‌ এসেছিলেন আমেরিকা হতে, পাদ্রীদের সঙ্গে কাজ করতে এখানে। প্রথম 'নন্‌কোঅপারেশন'-এ যোগ দিয়ে জেলে যান। জেল থেকে ফিরে এসে কোটগরেই স্থায়ীভাবে বসবাস

করেন। দেশে আর ফিরে যাননি। আমেরিকা হ'তে আপেলের চারা আনালেন, পাহাড়ের অনেকখানি জমি নিয়ে আপেলের চাষ করলেন। এখানেরই এক পাহাড়ী মেয়ে বিয়ে করলেন। নিজে হিন্দু হলেন। এত গোঁড়া হিন্দু হলেন যে, অচ্ছুতদের সঙ্গে বসে খেতেন না পংক্তিভোজনে।

বেশ কিছুকাল আগে মারা গেছেন তিনি। তাঁর প্রৌঢ়া স্ত্রী—ছিমছিমে লম্বা, টিকোলো নাক মুখ চোখ,—তাঁর বাড়ীর বারান্দায় বসেই দেখেছিলাম তিব্বতী নারী-পুরুষের নাচ; তাঁরাই ব্যবস্থা করেছিলেন এ নাচ দেখাবার। ষ্টোক্‌স্-এর বড় ছেলেও নেচেছিলেন দলে। বড় ছেলে সাজ করেন পাহাড়ীদের মতো, দেখতেও মা'র মতোই—পাহাড়ী। ছোট ছেলে লালচাঁদ ষ্টোক্‌স্ চেহারায় পেয়েছে পিতার দিকটা বেশী।

লালচাঁদের মা-ই বলছিলেন,—আপেল বাগান এখন ছেলেমেয়ে সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। আমারও আছে একটা ভাগ। যে যার বাগান দেখাশোনা করি।

আধুনিক গৃহসজ্জা। বাগান হতেই সকলের প্রচুর আয়। নাতি-নাত্‌নিরা বাইরে পড়ে,—কেউ দেরাদুনে, কেউ দিল্লীতে, কেউ সুদূর বিদেশে। এরাও বছরে দু'বছরে বিদেশ ঘুরে আসে নিজেরা। লালচাঁদের স্ত্রী বিদ্যা কন্‌ভেণ্টে পড়া মেয়ে।

বিদ্যা বললে,—সকালে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আমরা আপেল বাগানে কাজ করতে বেরিয়ে পড়ি। লাঞ্চের সময়টুকু বাদে সারাদিন বাগানে থাকি। মজুরও কাজ করে। তবে আপেল যখন পাড়তে হয় সেই কাজটা আমরা মজুরের হাতে ছাড়ি না, নিজেদের হাতে করি। আপেল ছিঁড়বার সময় বিশেষ সাবধানতা নিতে হয়। নয়তো পরের বারে ফল ধরে না ভালো।

কোটগরেরই মেয়ে বিদ্যা,—শ্রীআমিনচাঁদের মেয়ে। তাঁদেরও বিরাট আপেল ক্ষেত।

ষ্টোক্‌স্‌দের আপেলের জন্য বিখ্যাত এ অঞ্চল। এ আপেলের গাছ এখন প্রতিজনের বাগানে প্রাঙ্গণে। জমাদার মেথর যে, তারও ঘরের পাশে কয়েকটা আপেল গাছ। বছরে হাজার তিনেক টাকা আয় হয় তা হ'তে তাদেরও।

বিদ্যার মা শ্রীমতী আমিনচাঁদ এখন বছরের বেশীর ভাগ সময় থাকেন সিমলায়—মাসোব্রাতে। 'গোল্ডেন ডেলিসাস' আপেলের চাষ শুধু সেখানে। 'বহেনজী' বলে ডাকেন আমাকে, আমিও ডাকি।

এক কথা বলতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ে। সেবারে একবার ছিলাম মাসোব্রাতে, তাঁদের পাশাপাশি এক বাড়ীতে কয়েকদিন। রোজই দেখা হ'ত আমাদের। একমাত্র পুত্র, যুবক পুত্র—ঘরে ফটো রাখা আছে সেই সুদর্শন জোয়ানের। শিকারে গেল, শেষ হয়ে গেল, 'মা' বলে আর ডাকলো না এসে। কচি বৌ, শিশুসন্তান সবে কোলে। তাদের নিয়েই দিন চলছে স্বামী-স্ত্রীর। একমাত্র কন্যা—বিদ্যা।

এবারে সিমলায়, আসবার পথে দেখে এলাম আমিনচাঁদ মৃত্যুশয্যায়। কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ, ডাক্তার, বহেনজী সবাই ঘিরে বসে আছেন। আজ কি কাল শেষ হয়ে আসবে শ্বাস-প্রশ্বাস।

বহেনজী বললেন,—অনেকদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছেন রোগে। কত তো চেষ্টা করলাম, কত চিকিৎসা করালাম। এ কষ্টের হাত থেকে উনি মুক্তি পাবেন এই আমার সান্ত্বনা।

জ্ঞান ছিল আমিনচাঁদের। হাত তুলে নমস্কারের চেষ্টা করলেন। শেষ নমস্কার। নারকান্দায় বসে মনে ভাবছি, কি জানি কি অবস্থা এখন সে বাড়ীর সকলের।

সংবাদ পেতে আরো কয়েকদিন লাগবে সময়। কোটগরে গেলে হয়তো পাবো খবর।

কোটগরে এলাম। শুনলাম, সব শেষ। সেই রাত্রেই থেমে গেছে এতকালের প্রাণের স্পন্দন।

নারকান্দা থেকে 'রামপুর বুসার' হয়ে যাবো কিন্নোরে।

শতদ্রুর পারে পারে পথ ধরে চলেছি। সাথে সাথে শতদ্রুও বয়ে চলেছে পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে স্ফটিক ফোয়ারা তুলে। শতদ্রুর তীরে তীরে যেখানে যতটুকু জমি, সোনার ধানে ভরা সব। আলো হয়ে আছে মাটি থরে থরে। শিউলি ফুলের বোঁটার রঙে রাঙানো শাড়ীখানা যেন মেলে দিয়েছে শুকোতে, বাসন্তী পূর্ণিমাতে পরবে বলে।

সূর্যাস্তের রং ছড়িয়ে গেল পশ্চিম আকাশে। পর্বতমালার শিখরে দেওদার সারি সেই আলো-ভরা আকাশের গায়ে মনে হ'ল সারি সারি জোয়ান মার্চ করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়েছে স্থির হয়ে, দিনের এই সন্ধিক্ষণে।

ধীরে ধীরে এক ফাঁক দিয়ে অস্তরবির রাগ এসে লাগলো হিমাদ্রি তরঙ্গে। যেন নবীন সন্ন্যাসী নতুন গেরুয়া বাসখানি অঙ্গে তুলে নিয়ে স্মিতহাস্যে দাঁড়ালো ক্ষণতরে, তার পরে চলে গেল সংসার ছেড়ে অজানার উদ্দেশে।

সন্ধ্যে হল।

ম্লান আলোয় মলিন হিমশিখর স্তব্ধ হয়ে রইলো।

কিন্নোর

শতদ্রুর তীর ধরে লম্বা ফালি সমতল ভূমি, তার উপর দিকে পথ, তারও উপর দিকে পাহাড়। আজ রাত্রে থাকবো রামপুরে। রামপুর আর কয়েক মাইল দূরে।

পথের নীচের দিকে এক জায়গায় 'নিরত্' মন্দির, লোকেরা বলে 'সুরজ্' মন্দির।

নেমে পড়লাম পথে মন্দির দেখতে। পথ হ'তে আরো নামলাম সমতল ভূমিতে।

কোনো কালে বড় মন্দির ছিল হয়তো এটি। মন্দিরের ভাঙা পাথর ছড়ানো চারদিকে। মন্দির প্রাঙ্গণে সাজিয়ে রেখেছে বেশ কিছু পাথরের মূর্তি যা' ছিল আগে মন্দিরের গায়ে গায়ে মন্দির ঘিরে। মন্দির এখন খানিক পাথরের, খানিক কাঠের। পূজারী ব্রাহ্মণরা কেউ নেই, তারা গেছে হাটে-বাজারে ক্ষেতে সহরে। এক মহিলা এলেন মন্দির দ্বার খুলে দিতে।

চৌকো চৌকো পাথর-ফেলা চত্বর. পাথরের ফাঁকে ফাঁকে আপনা হ'তে হয়েছে অনেকগুলি গাঁদা ফুলের গাছ। রক্তগাঁদা ফুটে আছে গাছ ভ'রে।

মহিলাটির ডান হাতে চাবি, তাই বাঁ হাত দিয়েই একটা রক্তগাঁদা তুলে মন্দিরের দোরে ছুঁড়ে দিলেন; দিয়ে, প্রণাম করে দোর খুলে দিলেন।

দেবীমন্দিরও আছে একই চাতালে। সেখানেও একটি রক্তগাঁদা ছুঁড়ে দিয়ে

দোর খুললেন। ঘুরে ঘুরে মন্দিরের চারদিক দেখালেন।

মন্দির উপলক্ষ করে ছোট একটি বসতি এখানে। বসতির মাঝখানে খোলা জায়গায় একটি বড় চালা তোলা। বিশেষ তিথি, উৎসবে লোক জড়ো হয় এখানে।

এখন এখানে শীত নয় তত। মহিলাটির পরনে সুতির সাজ। পাদ্রীদের মতো লম্বাহাতার গাউন, উপরে জহর কোট, মাথায় চুল ঢেকে রুমাল বাঁধা। মাঝবয়সী সুন্দর হাল্কা গড়নের মহিলা। এই মন্দিরেরই এক পূজারীর স্ত্রী। কাছেই ঘর, আদর করে ডাকলেন। বললেন—বসে যাবে না একটু? বলে, দোতলা কাঠের বাড়ী—বাড়ীর দিকে তাকালেন। ঘরে ঘরে তালা ঝোলা। ঘরের দাওয়া দেখিয়ে দিলেন, বললেন,—বোসো। বসলাম। বললেন,—আমার স্বামী আর সতীন ফেরেনি এখনো ক্ষেত হতে। করুণ হাসি হাসলেন মহিলা। বললেন,—তারা ক্ষেতে যাবার সময়ে ঘরে তালা দিয়ে যায়। আমার সন্তান হ'ল না দেখে স্বামীকে আবার বিয়ে করতে হ'ল।

নিঃসন্তানবতী তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বস্তু—সন্তানবতী গৌরবিনীর কাছে।

মহিলার বড় দুঃখ, বাইরে হ'তেই বিদায় নিতে হল আমাদের। একটু চাও খাওয়াতে পারলেন না। বললেন,—যাবার পথে এই পথ দিয়েই তো ফিরবে, সেদিন যেন বসে একটু চা খেয়ে যেও—বেশ?

পথ হ'তেই উঠে গেছে কয়েক ধাপ সিঁড়ি, পথের উপরেই রামপুরের রেষ্ট হাউস।

ঘরে বসে, বারান্দায় বসে, সিঁড়ির উপরে বসে—সব জায়গা হ'তে দেখা যায় শতদ্রু চলেছে। শোনা যায় তার হাঁকডাক। হিমাচলে বসে দেখি ওপারে পাঞ্জাবের পাহাড়। একই ভঙ্গী, একই রূপ দু'পারের পাহাড়ের।

এখনো বেলা আছে খানিকটা। রামপুর দেখতে বের হই। রামপুররাজার বাড়ী দেখি, ছোট আকারে একাল সেকাল মিলিয়ে বাড়ী, সামনের দিকে অংগনের ধারে কাঠের ছোট বাড়ী একখানা, নানা রঙে নানা নক্সা আঁকা। দেবতার বাড়ী এটি। রাজা এখানে প্রণাম করে ঢোকেন রাজবাড়ীতে, যাবার কালে প্রণাম করে যাত্রা করেন এখান হ'তে।

রামপুরে সারি সারি দোকান পথের দু'ধারে—বাজারে। রামপুর বুসারের টুপী একটি কিনবো অভীকের জন্য। রাস্তা হ'তে বাজারের ভিতর দিয়ে নামতে নামতে অনেকখানি নেমে গেলাম। আলমোড়া ওদিককার মতো পাথরে বাঁধানো বাজারের পথ।

শীতের দেশ। গরম কাপড়, কম্বল, রেজাই এরই দোকান বেশী। তাছাড়াও কমবেশী আছে সব রকমের জিনিষই।

রামপুর বুসারের টুপী এ তল্লাটের সবার মাথায়। সুন্দর টুপী, গরম কাপড়ের টুপী, কপাল ঘিরে থাকে একফালি রঙীন ভেলভেটের পটি। শীত বেশী লাগলে টুপীটা ঘুরিয়ে ভেলভেটের পটিটা নামিয়ে দিলেই ঘাড় কান ঢাকা পড়ে। গাঢ় রঙের লাল নীল রঙীন ভেলভেটের পটিটাই কপালের উপরে এক শোভা। এই টুপীর সৌন্দর্যই এইটুকুর জন্য।

ছোটর উপরে সুন্দর সহর রামপুর। ছোটর মধ্যে আছে সবকিছুই।

পথের ধারেই হাসপাতাল। এ অঞ্চলের যত রোগী, আসে এখানে। আসে গ্রাম-গ্রামান্তর হ'তে, পাহাড়ের পাদদেশ হ'তে, পাহাড়ের চূড়া হ'তে।

একটি পাহাড়ী লোক চলেছে পথ দিয়ে, প্রায় এসে পড়েছে হাসপাতালের কাছাকাছি; চৌদ্দ পনেরো বছরের একটি ছেলে পুঁটলির মতো কাপড় দিয়ে বাঁধা

তার পিঠের উপরে।

ছেলেটির দু'চোখ বোজা, ফোলা। নাক গাল মুখ সবটাই ফোলা। মুখের রং হলদে হয়ে আছে। পুঁটলির বাইরে ছেলেটির মাথা নড়বড় করে নড়ছে চলার ঝাঁকুনিতে।

প্রৌঢ় পথিক লোকটিকে থামায়। লোকটি দাঁড়ায়। পথিক শুধোয়, কি হয়েছে ছেলের?

সে বলে, ঘরের চালে ছুটোছুটি করছিল, খেলছিল জনাকয়েক মিলে। পড়ে গেল নীচে। পাথরের ঘর, পাথরের চাল;—চোট পেয়েছে মাথায়। বেহুঁস হয়ে আছে তিনদিন ধরে।

দূর গ্রাম। কাল বিকেলে রওনা হয়ে আজ বিকেলে এসে পোঁছলো রামপুরে। হাসপাতালে রাখবে, ডাক্তার দেখবে। যদি ভালো হয়ে ওঠে—এই আশা।

—তুমি কে হও এর?

—কেউ না, গাঁয়ের লোক।

লোকটি যেন আর পারে না বইতে। দু'হাত পিঠের দিকে ঘুরিয়ে হাতের উপর পুঁটলির ভারটা রাখলো। পিঠের বোঝা একটুখানি হাল্কা হ'ল।

পথিক পাহাড়ী ছেলেটির কপালে হাত রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখটা দেখলো। মুখে আপসোসসূচক চুক্‌চুক্‌ শব্দ করলো। লোকটিকে বললো—চলে যাও তাড়াতাড়ি। ঐ তো হাসপাতাল। পরে নিজের কপালে হাত দিয়ে বললো—সবই অদৃষ্ট। অদৃষ্টে থাকলে বাঁচবে এ ছেলে।

রেষ্ট হাউসের সামনে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা বড় একটা বৃক্ষ। দীর্ঘ উন্নত তার ভঙ্গী। রিঠা গাছ। এর তলায় এসে বসে রইলাম। চাঁদ উঠলো পাঞ্জাবের পর্বত-মালার আড়াল হ'তে;—আলো পড়লো হিমাচলের পাহাড়ে। আকাশ হাসলো ঝিকিমিকি তারা নিয়ে।

গত ক'বছর হতেই চেষ্টা চলছিল কিন্নোরে আসবার। গত বছর স্বামী এসেওছিলেন অনেকটা পথ,—ফিরে যেতে হ'ল তাঁকে। পথ দুর্গম। কিন্নোরের পরেই তিব্বত—তিব্বতের পশ্চিম দিক। বর্ডার রক্ষা করতে মিলিটারী থেকে প্রস্তুতি চলছে, পথ বানানো হচ্ছে। এখনো থেকে থেকে ধসে পড়ে পথ। অনবরত বোমা ফাটছে, পাহাড় ফাটছে, পাথরের খণ্ড পথে বসানো হচ্ছে। এই পথে শুধু জীপই চলে মাত্র, তাও অতি ভয়ে, অতি সাবধানে।

নেগী খবর নিয়ে এসেছেন, চারদিন আগের খবর—পথ ভালো আছে, ধস নামেনি কোথাও তখন পর্যন্ত।

নেগী কিন্নোরের লোক। এবারে আমাদের কিন্নোর দেখাবেনই—এই তার পণ। স্বামীর দপ্তরে কাজ করেন নেগী, হিমাচলের অফিসের ভার এর উপরে। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র। পুত্রকে সিমলাতে রেখে উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন। তিনটি বিষয় নিয়ে তিনবার এম, এ. পাশ করেছেন। কিন্নোরের পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। এ ঘটনা অল্পই ঘটে কিন্নোরে।

কিন্নোরে এলাম। এই সেই কিন্নোর—সেই কিন্নর-কিন্নরীর দেশ। কিন্নোরের ছেলেদের বলে কিন্নর—মেয়েদের বলে কিন্নরী। শুনেছি অপরূপ রূপসী কিন্নরীরা।

আলো-ঝলমল কিন্নোর দেশ। হীরা মোতি জ্বলে চারিদিকে বরফের চূড়ায় চূড়ায়। আকাশের গা ধরে এ শিখরমালা চলেছে—চলেইছে। এরি গহ্বরে এ-পাহাড়ে ও-পাহাড়ে আড়ালে আবডালে কিন্নোর দেশ ছড়ানো।

প্রথম দেখাই প্রধান দেখা। চোখ ধরে রূপ। মনে আনে খুসী। দু'চোখ মেলে তাকিয়ে আছি—কিন্নরী দেখবো।

পথের মোড় ঘুরতে পথে কাজ করছিল এক কিন্নরী,—আমাদের আসার আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। উন্মুখ আঁখি আমার 'মরি মরি' করে উঠলো।

দুধে-আলতায় ফেটে পড়া রং, কালো চোখ, কালো ভ্রূ, টিকোলো নাক, পাত্‌লা ঠোঁট। কালো চুলের বিনুনী পিঠের উপরে, মাথায় রামপুর বুসারের টুপী। লম্বা দেহে লম্বা কম্বল ঝুলিয়ে পরা—দাঁড়িয়ে আছে যেন পর্বত-অধিশ্বরী।

সার্থক হ'ল দেখা। মন ঠিক করে নিল কিন্নোর সুন্দর, কিন্নোরের সবকিছু সুন্দর।

'সোলডিং' খাদের সামনে গাড়ী থামিয়ে নেগী নেমে পড়লেন, তরতর করে নীচে গিয়ে গেলাস ভরে ঝরণার জল নিয়ে এলেন। বললেন,—সবে বরফ-গলা জল এটা। সুস্বাদু জল। এই জল এ পথে সবাই খায়।

আমরা খেলাম। পিপাসা ঠাণ্ডা হ'ল।

'সুংরি' গ্রামে এলাম। গ্রামের নারীপুরুষ ভীড় করে এগিয়ে এসেছে পথে। জীপ হ'তে নামলাম। দুই কিন্নরী এসে দুই দিকে আমার দুই বাহু হাতে তুলে নিল। পাহাড় ভেঙ্গে পথ চলতে গিয়ে তখন বুঝি আমার দেহের সকল ভার তুলে নিয়েছে দুই কিন্নরী দুই দিক হ'তে। যেন হাওয়ায় ভেসে নীচে নামলাম। গ্রামের লোক চামর ব্যজন করে ঝাঁঝর কাঁসর শিঙগা বাজিয়ে আহ্বান করে সঙ্গে সঙ্গে এলো। কিন্নরীরা গান ধরলো।

গ্রামে ঢুকতে গ্রামের বাইরে পথের উপরে একটি শিবমন্দির। গ্রামের মন্দির এটি। মন্দিরের ছোট প্রাঙ্গণে চাকাহীন রথের মতো কাঠের রেলিং ঘেরা টোপ দেওয়া কাঠের একটি বেদী। নানা কারুকাজ নক্সালতা খোদাই তা'তে। বেদীর থামে থামে ঝুলছে গাঁদা ফুলের মালা। ভিতরে শুভ্র জাজিম পাতা। বসলাম সেই রথে উঠে মুরুব্বি মাতব্বরদের সঙ্গে। বসতেই হ'ল। ভাবলাম, অভীক দেখলে বলতো—যেন রাজারানী বসেছে।

থালায় থালায় লাল লাল আপেল এলো, পাহাড়ী চাপাটি হালুদা এলো, বাটিতে বাটিতে গরম চা এলো। খেতে হ'ল, হাসতে হ'ল, অন্তরের খুসীটা দেখাতে হ'ল। তারাও হাসলো, হাসি দিয়ে অন্তরঙ্গতা জানালো।

যাবো 'নিচার'। এ পথের মাঝে এইটুকু আপ্যায়ন না করে সুংরিবাসী ছাড়তে পারে না। বৃদ্ধ মাতব্বর কিন্নর হেসে হেসে বাংলা-হিন্দিতে মিশিয়ে বলে, আমি ত্রিপুরায় ছিলাম বহু বছর; ত্রিপুরার রাজার দেহরক্ষী ছিলাম। রাজার দেওয়া উপহার এক তলোয়ার আছে আমার কাছে।

সে কুশল প্রশ্ন করে রাজার। বলে, কেমন আছে রাজা এখন?

কোথায় ত্রিপুরা কোথায় কিন্নোর, এত দূর দেশ হ'তে গিয়েছিল তার কর্ম-জীবনে, রাজার বিশ্বস্ত দেহরক্ষী হয়ে।

বৃদ্ধের মুখের বলিরেখাগুলি গভীরতর হয়। হেসে বলে, আজও সব কথা মনে পড়ে আমার। কিছু ভুলি নাই।

দুপুরবেলা, শিবমন্দিরের দ্বার বন্ধ। দেবমন্দিরের নিয়ম,—অসময়ে খুলতে পারে না দ্বার।

ছোট মন্দির। বাংলাদেশের বরের মাথার শোলার মুকুটের মতো থাকে থাকে তিন থাক পাথরের মুকুট বসানো যেন—এমনিই, মন্দিরের চূড়াটি।

বন্ধ দ্বারের বাইরেই প্রণাম রাখলাম আমার।

সুংরি হ'তে আরো তিন মাইল গেলে 'নিচার'। নিচার বড় গ্রাম; কিন্নোর জিলার সাবডিভিশন কাল্পা, নিচার, পু।

নিচারেও বিপুল আয়োজনের অভ্যর্থনা। রাশি রাশি মালা, গাঁদা সেঁওতির; ততোধিক পরিমাণে মালা বাদাম আখরোটের। আখরোট বাদাম সুলগুজার মালারই চল বেশী এদের মধ্যে। ছোট বড় এ-বাদাম ও-বাদাম মিলিয়ে পর পর গাঁথা সুন্দর সাজানো মালা সব। এ-মালা করে রেখে দেয় আগে হ'তে। উৎসবে, আতিথেয়তায় কত লাগে তাদের। নষ্ট হবার নয় এ-মালা।

নিচারে দেবী ঊষার মন্দির।

সন্ধ্যেবেলা মন্দির অঙ্গনে গ্রামের নারীপুরুষ সকলে এসে সমবেত হ'ল।

বাইরের জগতের হাওয়া এসে লাগছে এখানে একটু-আধটু এখন। সেই হাওয়া এরা আরো চায়। স্কুল হচ্ছে. গ্রামসেবিকা আছে, ডাক্তার ঘোরে গ্রাম হ'তে গ্রামে। নানা কর্ম উপলক্ষে সরকারের প্রতিনিধিরা আসেন। এদের কথা এরা বলে ওরা শোনে, ওদের কথা ওরা বলে এরা শোনে। এই আসা-যাওয়ার ঝিলিকটুকু কাঁপন জাগায় হিমেল হাওয়ায়। খুসী হয়ে ওঠে এরা। পরবাসীকে আপন আপন আঙিনায় টেনে নেয় আপন ঘরের কুটুমের মতো করে।

কথাবার্তার পরে পরেই দেবী ঊষার অঙ্গনে কিন্নর-কিন্নরীরা নাচ সুরু করে দিল। নাচে গানে খ্যাতি এদের।

শিশুকাল হ'তে শুনে আসছি কিন্নর-কিন্নরীর কথা। এরা সুরে সুরে ঘোরে, সুরে ঘুমোয় সুরে জাগে।

শুনেছি পাহাড়ের উপরে জোড়া জোড়া কিন্নর-কিন্নরী বীণা হাতে মেঘলোকে উড়ে উড়ে গান গেয়ে বেড়ায়—একথা ছবি হয়ে ছিল এতকাল। ছবি হয়ে ছিল,—পরীর মতো দুদিকে এদের দুটি ডানা; উপর অর্ধ অঙ্গ মানুষের, নিম্ন অর্ধ অঙ্গ পক্ষীর মতো। বিস্ময়ে কত সময়ে চেয়ে থেকেছি মেঘের দিকে কিন্নরী দেখবার আশায়। এতদিনে দেখলাম।

কিন্তু এ কিন্নরীদের সে পক্ষীপুচ্ছ এখন আর নেই। সবটাই এদের মানুষের রূপ। মোটা কম্বলে গা ঢাকা সবার। তবু কিন্নরীদের এই সাজের মতো সাজ আর দেখিনি কোথাও। তাকিয়ে থাকি এদের সাজের দিকে।

লম্বায় চওড়ায় মস্ত কালো কম্বলখানি বাঁদিক হ'তে অঙ্গ ঘুরিয়ে এনেও বাকি থাকে আধখানা কম্বল। সেই আধখানা পিছন দিকে থাকে থাকে কুঁচিয়ে কোমরবন্ধ দিয়ে কষে বেঁধে ছেড়ে দিয়েছে পিছনে। গোড়ালি ঢেকে লম্বা কুঁচোনো কম্বলের ভাজের উপর কোমর ঢেকে পড়ে রইল উপরের কুঁচোনো অংশটা। সেকালের বিদেশী মেয়েদের 'ক্রিপোলিন' সাজের মতো পিছন দিকে উঁচু হওয়া এ-সাজের বাহার। কালো কম্বলের পাল্লা জুড়ে চওড়া করে রঙীন উলের নক্সা বোনা। যে যার কম্বল নিজের ঘরে বোনে। সখ করে আপন আপন নক্সা তোলে, সুন্দর করে। কোমর থেকে পা পর্যন্ত পিছন দিকে দুথাকে এই নক্সা সমানভাবে নেমে পড়ে। বহুদূর হ'তে জ্বলজ্বল করে। লম্বা মেয়েদের আরো দীর্ঘাঙ্গী দেখায় এতে করে। এরা নাচে, চলে; পিছনে রঙীন আঁচলের ভারী কম্বলের বোঝা ধীর তালে দুলে দুলে আছড়ে পড়ে গোড়ালির উপরে। রানীর পদক্ষেপের মতো গর্বভরা গাম্ভীর্য সে দোলায়।

কিন্নরীদের গায়ে আঁটসাঁট কাটের গরম জ্যাকেট। পিঠে ফেলা তিনকোনা স্কার্ফ, এটিও নানা রঙে নক্সা তোলা, উলের বোনা। সবার পায়ে মোজার উপর পা

ঢাকা চামড়ার জুতো। শীতের দেশ, খালি পায়ে থাকে না কেউ। গলায় চাঁদি, পুঁতির মালা, কানে মাক্‌ড়ি, নাকে নথ, কালো চুলের বিনুনীতে রঙীন ফুদ্‌না ঝোলা,—আর মাথায় সবার সেই বিখ্যাত বুসার টুপী, ফর্সা কপাল ঘিরে লাল নীল ভেলভেটের পটি বসানো।

কিন্নররা নাচলো। কিন্নরীরা নাচলো। কিন্নর-কিন্নরী সবাই একসঙ্গে মিলে-মিশে নাচলো। কিন্নর-কিন্নরীরা নারীপুরুষ আলাদা সারি বেঁধে মুখোমুখি হয়ে নাচলো।

কিন্নরীদের পিঠে সন্তান বাঁধা। সব কটিই কচি শিশু নয়। চার পাঁচ বছর পর্যন্ত মা দিদিমা বহন করে শিশুকে। ছেড়ে দেয় না ইচ্ছেমতো চলতে তাকে।

আজ পূর্ণিমা রাত। চারিদিকে নীরব নিথর পাইন দেওদার, ঘন কালো, প্রহরীর মতো। কালো মন্দির, মন্দিরের চাতাল। আঙিনাটুকুতে কেবল ফুটফুটে চাঁদের আলো। তারি উপরে কালো সমুদ্রের ঢেউ ধীরে ধীরে দুলছে;—কিন্নর-কিন্নরীরা নাচছে।

রাত অনেকটা হ'ল, ঘরে ফিরলাম।

বুসারের রাজবাড়ী; বৃটিশ আমলে থাকতো এ বাড়ীতে জেলার কর্মকর্তারা। বড় বড় ঘর, খড়খড়ি, কাঁচের জানালা, চিম্‌নি, ফায়ার প্লেস—সবকিছুই আছে,—সবকিছু প'ড়ো। পেট্রোমাক্স জ্বলছে ঘরে বাইরে কয়েকটা। কাঠকয়লার উনুন এনে রেখেছে বিছানার কাছে—ঘর বিছানা গরম হবে। রান্নাঘরে কলরব চলছে এখনো।

শোবার ঘরের পাশে কাঁচের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ঘরের গরম হাওয়া বাষ্প হয়ে জমেছে কাঁচে। হাত দিয়ে খানিকটা কাঁচ মুছে ফেললাম।

আকাশে পূর্ণশশী আলোর মুকুট পরিয়ে রেখেছে সারি সারি হিমাদ্রিতে।

সকালবেলা পায়ে চলা পথ ধরে পাহাড়ের গা' ধরে চলেছি, কিন্নরদের বাসবসতি একটু চোখের দেখা দেখতে। সময় বেশী নেই হাতে। সঙ্গে গ্রামসেবিকা, নেগী, আরো কয়েকজন।

ভিজে ঘাসে শাড়ী ভিজে যাচ্ছে। কারো শশালতার মাচানের নীচ দিয়ে, কারো সরষে ক্ষেত টপকে কেদোদানার ক্ষেত পেরিয়ে, ভুট্টা গাছের ছড়িয়ে পড়া লম্বা লম্বা পাতা দু'হাতে সরিয়ে পাথরে নুড়িতে হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলেছি।

পথের ধারের একটা বাড়ীর দোতলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল এক কিন্নরী আমাদের সাড়া পেয়ে। বোধহয় ঘুম হ'তে উঠেছে সবে, এখনো দিনের পুরোসাজ অঙ্গে তোলেনি। রাত্রিবাস শুধু কালো কম্বলখানি গায়ে জড়ানো। ডানবাহু ডান কাঁধ অনাবৃত। কাঁচা সোনায় ভোরের আলো ঠিক্‌রে পড়া কাঁধ—এমন জেল্লা গাত্রবর্ণে।

কিন্নরী কাঠের রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে আমাদের ডাকলো ঘরে।

বাইরের দিকেই কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে ঘরেরই মতো একটি ঢাকা বারান্দা। বারান্দার পরে একখানা ঘর। ঘরের মাঝখানে কাঠের আগুন, এ আগুন জ্বলে দিবারাত্রি। আগুন ঘিরে বসে, খায়; আগুন ঘিরেই শুয়ে পড়ে, ঘুমোয়।

কাঠের বাড়ী, আগুন নিয়ে থাকতে হয় সর্বক্ষণ। কখন কোন সময়ে আগুন ধরে যায়—তাই খাদ্যদ্রব্য—গমদানা এরা রাখে না ঘরে। বাড়ীর কাছেই থামের উপরে ছোট্ট একটা কুঠ্‌রি তুলে যে যার ক্ষেতের শস্যদানা নিজ নিজ কুঠ্‌রিতে রেখে দেয়। ঘর পুড়ে যায় তো ঘর তোলা যাবে নতুন করে। গমদানা পুড়ে গেলে গৃহস্থকে মরতে হবে পুত্রকন্যা নিয়ে অনাহারে। কারো কুঠ্‌রিতে তালা থাকে,

কারো থাকে না। কেউ কারো জিনিসে হাত দেয় না।

গরু ছাগল ভেড়া থাকে একতলার ঘরে।

এই সকালেই গৃহস্থ এক ঝুড়ি 'চুলী'—বুনো এপ্রিকট নিয়ে এলো বন হ'তে পিঠে করে। শীতকাল আসছে। তখন মদের কত দরকার। বরফের ঠাণ্ডা কি শুধু আগুনে কাটে? বড় বড় কাঠের জালায় প্লাম খোবানী ভরে বন্ধ করে রাখে। মাস দুই গেলে ফলগুলি গলে যায়। আগুনের উপরে হাঁড়িতে সেগুলি ফোটায়; হাঁড়ির মুখের লম্বা কাঠের চোঙা বেয়ে বাষ্প হয়ে ঝরে পড়ে রস। সারা শীত-কালটা আগুনের ধারে বসে বসে স্ত্রীপুরুষ তা' পান করে। আঙুরের মদ কিন্নোরে প্রসিদ্ধ, খুব কড়া। আঙুরের মদকে বলে এরা 'অঙুরী'।

শীতের প্রস্তুতি চলছে ঘরে ঘরে। 'রেগ্' 'জংলী-খানুর' 'ঢাংকর' 'সেগু' রোদে শুকিয়ে রাখছে গৃহিণীরা। ঘরের চালে, আঙিনায় থরে থরে রঙ-বেরঙের দানা। কুলুতে দেখলাম কাছে দূরে প্রতি ঘরের চাল হলুদ রঙের। ভুট্টা শুকোচ্ছে চালে চালে সবার।

নিচারের স্কুলে ছেলেদের সাথে মেয়েরাও পড়ছে কয়েকজন। দূর দূর পাহাড় হ'তে আসে কয়েকটি মেয়ে। মেয়েদের নামগুলি বড় সুন্দর,—দেবন্তীদেবী, যুমপতি দেবী, দেবজ্ঞানী দেবী, বিশ্বমোহিনী দেবী—এই রকম সব নাম।

আবার 'সাংরা' গ্রাম পেরিয়ে চললাম। আজ পথ খালি, মন্দিরের প্রাঙ্গণ খালি। দুপুরের রোদ জ্বলজ্বল করছে গাছে পাথরে। গাঁয়ের পুরুষ-নারী গেছে শস্য ক্ষেতে। ঘরে ঘরে দরজায় শিকল তোলা। সেদিনের মুখর গ্রাম আজ নিশ্চল।

'কারচাম্' গ্রামে 'বাস্পা' নদী এসে মিশেছে শতদ্রুতে। দুই নদীর সঙ্গমস্থল। নামার মুখে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। দুই-ই উদ্দাম। সংঘর্ষে আস্ফালনে তুমুল হুহুঙ্কার। এ হুঙ্কার পাষাণে পর্বতে ধাক্কা খেয়ে বজ্রগর্জনে ভরে তোলে আকাশ-বাতাস।

দুই দিকের পাহাড়ের জোড়ের মুখে দেখা যায় কৈলাসের চূড়া সম্মুখে।

সঙ্গমের তীরে রেষ্ট হাউস। ছোট পুল পেরিয়ে এবারে সোজা পর্বতের গা' বেয়ে উঠতে থাকে জীপ। সরু সঙ্কীর্ণ পথ। কোন মতে জীপ চলাচলের পথ। একপাশে সোজা খাড়া পর্বত, আর একপাশে সোজা গভীর খাদ। যতই এগোই—খাদ গভীর হ'তে গভীরতর হ'তে থাকে।

পাহাড় ফাটানো পথ। 'পড়ো-পড়ো' হয়ে ঝুলছে মাথার উপরে পাহাড়ের অংশ। ভাবি, একটা যদি খুলে পড়ে—ধূলিসাৎ হবে জীপ। খণ্ড খণ্ড পাথর ফেলা পথ, ভাবি, একবার যদি চাকা হড়কায়—পড়বো গিয়ে সোজা সেই খাদে,—শতদ্রুর জলে।

দেখি দু' হাঁটু শক্ত হয়ে আছে, যেন পায়ের চাপে জীপখানাকে স্থির রাখতে চাইছে। দৃষ্টি তুলে ধরি ওপারের পর্বত গাত্রে। স্তব্ধবাক্ স্থির দেওদার—যেন ঋষিকুল সব, মাথার উপরে জোড়হাত তুলে স্তব করছে অসীমের।

বিকেলে এসে পেঁছিই কাল্পা। কিন্নোরের রাজধানী কাল্পা। সতেরোটি গ্রাম কিন্নোরে। মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে গ্রাম। আড়াই হাজার তিন হাজার লোক নিয়ে রাজধানী। পাহাড়ী রাজধানী,—না সহর, না গ্রাম,—দুই-এর মাঝামাঝি।

কিন্নোরে পাথর কণ্ঠ মিলিয়ে বাড়ী। চাল সবটাই কাঠের। এখানে 'মনসুন' ঢুকতে পায় না পাহাড়ের জন্য। বৃষ্টি হয় না বলতে গেলে, তাই বহু বাড়ীতে কাঠের চালের উপরে মাটি ঢালা পুরু করে।

কাল্পার কাছেই 'চিনি'। পুরানো গ্রাম। গ্রাম হিসেবে বড় গ্রাম। গ্রামের

মাঝখানে গায়ে গায়ে লাগা জড়ো হওয়া বাড়ী পথ দোকান মন্দির নিয়ে জনবসতি। গ্রামের ধারে হরিজন পল্লী—নেমে গেছে পর পর পাহাড়ের গা' ধরে। একজনের আঙিনা নীচের জনের ঘরের ছাদ। আর তার আঙিনা তার নীচের জনের ছাদ। হরিজনরা থাকে গ্রামের এক পাশে।

হরিজন তাঁতী ঘরে বসে উলের চাদর বুনছে তাঁতে। অবসর সময়ের কাজ তার। রঙীন উল দিয়ে নক্সা তোলা মেয়েদের চাদর বুনতে সেরা সে কয়েকখানি গ্রামের মধ্যে। আমিনা—ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী বলে,—তবে, একে দিয়ে কাজ করানো মুশকিল। সেবারে কমলাদেবী এসেছিলেন। একটা চাদরের অর্ডার দিয়ে গেলেন। এই সেই চাদর। এ' কয় বছর তাঁতেই পড়ে আছে। তাড়া দিয়েও পারি না। বকলে হাসে, মদ খেয়ে ভোঁ হয়ে থাকে।

এইসব চাদরের বেশ দাম। বেচলে টাকা রোজগার করতে পারে—কিন্তু করে না তা'। তেমন তাগিদই নেই। আমিনা করিয়েছিল একখানা, একশ' পঁচাত্তর টাকা লেগেছিল চাদরখানার জন্য।

কিন্নোরের মেয়েদের সাজ, গহনা সাজিয়ে রেখেছে একটি ঘরে গ্রাম পঞ্চায়েত, আমাদের দেখাবার জন্য। নিত্যকার পোষাক—সবগুলিই দামী।

মেয়েরা পড়ে 'ধরু',—বড় কম্বল। তিন বছরে এমনি কম্বল দু'খানা লাগে এক একজনের। দোকানে কিনতে দাম লাগে একশ' টাকা এক একখানার। গায়ে দেয় 'চোলি'—,জ্যাকেট; দাম পঞ্চাশ টাকা। এও তিন বছরে দু'টি লাগে। 'ঠেপং'—টুপী, পাঁচ টাকা করে দাম, বছরে একটা লাগে। চাদর যেখানা গায়ের উপরে পরে—একখানি পঞ্চান্ন টাকা। 'গাচি'—কোমরে জড়ায়, দাম পঁয়তাল্লিশ টাকা। জুতো বছরে লাগে দুই জোড়া, জোড়ার দাম পনেরো টাকা। জুতো ও টুপী এ দুটো কিনতেই হয় এদের। অন্য সব যে পারে কেনে, যে পারে ঘরে বোনে।

ছেলেদের সাজ—'ছপ্‌টা'—উলের লম্বা কোট। উলের বোনা কাপড়ের ঢিলে চুড়িদার। আর 'নালা'—কোমরে বাঁধবার।

বিছানা—'খর্‌চা'—ছাগলের কম্বল। পাঁচ বছর টেকে—ত্রিশ টাকা দাম। দড়ির সতরঞ্চি ছয় টাকা করে। বিছানায় খুব বেশী খরচ নেই এদের।

বলেছিল নিচারের গ্রামসেবিকা,—যে কম্বলখানা পরে থাকে মেয়েরা, রাত্রে সেখানাই খুলে অর্ধেকে শোয়, অর্ধেক গায়ে ঢাকা দেয়।

গ্রামের মাঝখানে নারায়ণের মন্দির, পাথরের।

'চিনি' গ্রাম। মনে পড়ে বারো বছর আগে সেই সেবারে নারকান্দায় বসে বসে দেখছিলাম—পাহাড়ী বন্ধু বলছিলেন দূরের পাহাড় দেখিয়ে যে,—ঐ যে মেঘে ঢাকলো পাহাড়, তার পরের পাহাড়টা 'চিনি'। পাহাড়ের উপরে উপরে পায়ে চলা পথ, এ পথে আসা-যাওয়া কঠিন। আমাদের আসা হ'ল না সেবারে। 'চিনি'তে আঙুর হয় অপর্যাপ্ত। 'চিনি'র আঙুর পচে গলে যায়। চার আনা করে কিসমিসের সের।

এখন 'চিনি'র আঙুর পচে না। চার আনায় একসের কিস্‌মিস্‌ আর পাওয়া যায় না। মিলিটারীর লোক এসে গেছে, অঙুরী তাদের লাগে। পথ হয়ে গেছে, গাড়ী বোঝাই আঙুর বাইরে চলে যায়।

চিনিতে 'ব্লক' বিভাগ হ'তে চাষ হয়। জামাইকে খেতে দেবার মতো বড় বগী-থালার মতো ঘেরের বাঁধাকপি তুলে আনলো একটা এক কিন্নর।

চিনির বালিকা, কিশোরীরা এখন স্কুলে পড়ে, হাতমুখ ধোয়, দাঁত মাজে। পুরুষরা বাইরে যায়, সিমলা চন্ডীগড়ে কাজ করে।

শশীবালা, দোরামদাসী, ভাগপুরীদেবী তিন কিশোরী পথের ধারের বড় পাথরটার উপরে বসেছিল, আমাদের দেখে তিন কিশোরী লজ্জায় জড়াজড়ি করতে লাগল। একই মাটির মানুষ নেগী, সে জানে এদের ভঙ্গী ভাব। জীপ হ'তে নেমে মেয়ে তিনটির কাছ হ'তে হাসতে হাসতে নিয়ে এলো তিন টুপী ভরা পাকা খোবানী। বাটির মতো এ টুপী কাজেও লাগায় এরা। কিশোরীরা ফল পেড়ে বসে বসে খাচ্ছে। অন্য লোকে দেখে ফেলল—এই তাদের লজ্জা। নেগী টুপী তিনটা খালি করে ওদের ফেরত দিল। ওরা ছুটে পালাল। অদৃশ্য জায়গা হ'তে ঝরণার মতো খিলখিল হাসির ঝঙ্কার উঠতে লাগল।

'ব্লক' হতে কাজ হচ্ছে 'দুনী' গ্রামে। ছেলেদের নিয়ে 'কারপেন্ট্রি' ক্লাশ হচ্ছে, মেয়েদের নিয়ে সেলাইর ক্লাশ। ছোটদের জন্য স্কুল হয়েছে।

'দুনী' গ্রামে এক বৌদ্ধ মন্দির। মন্দিরে কাঠের রঙীন বুদ্ধমূর্তি, লতাপাতা, রঙীন কাপড়ের টুকরো। ফুল, ধূপ, সারি সারি বাটিভরা জল। 'নান্' আছে দশজন এই মন্দিরে। তিনজন বুড়ী,—বুড়ীরা আছে মন্দিরে, অন্যরা গেছে ক্ষেতে কাজ করতে।

বুড়ী নান্‌রা হাতে দিলেন আশীর্বাদী ফুল। মাথায় ছোঁয়ালেন রঙীন কাপড়ের টুক্‌রো।

গ্রামের মধ্যে গ্রামের সঙ্গেই মিলেমিশে মন্দির,—বড় ভালো লাগল। কিন্নোর-বাসীরা কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ, কিছু হিন্দু। তবে, বৌদ্ধ হিন্দু নিয়ে তফাত করে না কিছু। হিন্দুরাও বৌদ্ধ মন্দিরে পূজা দেয়, বৌদ্ধরাও আসে হিন্দু মন্দিরে পূজা দিতে।

এখানকার মেয়েরা 'নান্' হয় অনেকে। অর্থাৎ হতেই হয়।

কিন্নোরে ভূমি কম। শস্য উৎপাদন পরিমিত। সমাজবিধিতে লোকসংখ্যা তাই নিয়ন্ত্রিত।

বিবাহ শুধু পরিবারের বড় ভাই-ই করে। তারপর বৌ ঘরে এনে আর একটা অনুষ্ঠান হয়। তখন আর সব ভাইয়েরা হলুদ চাদর গায়ে দিয়ে বরের সাজ প'রে সারি বেঁধে বসে,—একটা 'বণ্ড্' হয় যে, এই মেয়ে হ'ল সকল ভাইদের পত্নী। যদি কোনো ভাই ছেড়ে যায়, তবে স্ত্রীকে এতো টাকা খেসারত দেবে। যদি বৌ চ'লে যায় তবে সবাইকে অতো অতো টাকা দিতে হবে।

এইভাবে এক ক'নে সকল ভাইয়ের স্ত্রী হ'ল।

এক পত্নীর গর্ভের সন্তান সংখ্যা চার পাঁচ সাতের মধ্যেই সীমিত রইল। নয়তো সাত ভাই-এর সাত স্ত্রী হলে, চারটি করে সন্তান হলেও আঠাশটি সন্তান হ'ত। তাদের বংশ আবার সেইভাবে বাড়তে বাড়তে যেত। আর এই ব্যবস্থায় পরিবারের সংখ্যা বংশানুক্রমে প্রায় একই থেকে গেল।

স্ত্রীই বাড়ীর কর্ত্রী। বাড়ীতে স্থায়ীভাবে থাকে সে-ই। স্বামীরা থাকে বাড়ীতে পালা করে, কাজকর্ম ভাগাভাগি করে নিয়ে। একজন স্বামীকে বাড়ীতে থাকতেই হয়, ক্ষেত-খামারের কাজ দেখাশোনা করতে। অন্য স্বামীরা গরমে চলে যায় ছাগল ভেড়া গরু নিয়ে পাহাড়ের মাথায়। সেখানেই কয়েকমাস থাকে ছোট ছোট ডেরা বানিয়ে। গরু ছাগলের দল আপন মনে চরে বেড়ায়। প্রচুর ঘাস তখন সেসব জায়গায়। গরু মানে প্রায় সবই ইয়াক, আবার ইয়াকে গরুতে মিলে হয়েছে 'জো'—ষাঁড়, জোমো—গাই। প্রচুর দুধ দেয় এরা। এই কয়মাস স্বামীরা সেই দুধের গাদা গাদা মাখন তোলে, ঘোল জ্বাল দিয়ে ছানা ছেঁকে ডেলা ডেলা পনীর শুকিয়ে রাখে। যখন নেমে আসে তখন মন মন নিয়ে আসে মাখন পনীর।

কিন্নোরের সব মেয়েরাই তাই স্বামী পায় না সবাই।

একটিই যখন বৌ ঘরে আনা যায়, তখন দেখেশুনে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী কন্যাকেই পছন্দ করে আনে। অন্য মেয়েরা বেশীর ভাগ বাপের বাড়ীতেই আইবুড়ো হয়ে থাকে, নয়তো বৌদ্ধ মন্দিরে 'নান্' হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে কুমারী মেয়ের সন্তান হ'লে মেয়ের মা শিশুটিকে আপন সন্তানের সঙ্গেই মিলিয়ে মিশিয়ে রেখে দেয়।

বৌদ্ধ মন্দিরের পাশে, উঠোনে লম্বা বেঞ্চির উপরে ফল খাবার সাজিয়ে রেখেছে। খেতে হবে। অতিথি আমরা, না খেয়ে যাবো—সে কেমন কথা? ফলের অভাব নেই এদেশে; আপেল নাসপাতি বাবুগোসা—কত কত। 'ওগ্লা' দানার আটা দিয়ে বানিয়েছে 'পল্টু'—জিলাপীর মতো, তবে নোন্তা আর আকারে বড়। বানিয়েছে আটার বড় বড় মাল্পোয়া—নোন্তা। চিনি গুড়ের বালাই নেই এদের। আছে প্রচুর মধু—গাওয়া ঘি-এর মতো দানাদার মধু। বাটি ভরে ভরে মধু দিয়েছে। সেই মধুতে পল্টু ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেলাম। চমৎকার আস্বাদ। ঘরের তৈরী খাঁটি ঘি-এ ভাজা সব।

ফল হ'তে সিলগুজা বার করার কায়দা নাকি বিশেষ রকম। ছোট্ট ছোট্ট লম্বাটে গড়নের সিলগুজা, সৌখীন বাদাম। এই সিলগুজার গাছ কিন্নোর ছাড়া হয় না কোথাও। একটি লোক সিলগুজা বার করার কায়দা দেখাতে সামনে এসে বসল। ঝাউ গাছের মতো গাছ, ঝাউ ফলের মতো ফল। একটা ফল দা দিয়ে এককোপে দু'ভাগ করে চার ভাগ করল, পর্পর্ করে এক একটা ভাগ বেঁকিয়ে সিলগুজা-গুলি বের করে নিল। একটা পুরো ফলে একমুঠো সিলগুজা বের হ'ল। এই ফলে কষ বেশী, হাত কালো হয়ে যায়। কেটেই ত্বরিতগতিতে বাদাম বের করে নেবার এই কায়দা তাই।

পল্টু খেলাম, চাপাটির মতো মালপোয়াও খেলাম; কিন্তু হালুয়ার মতো নরম পদার্থটা আর খেতে পারলাম না। এটাতে একটু বেশী রকমের কটু গন্ধ ঘি-এর। অথচ এই গন্ধটাই এদের বেশী প্রিয়। তাজা ঘি খায় না এরা। নেগীর কাছে শুনেছি,—ঐ যে এত মন মন মাখন পনীর নিয়ে নামে লোকে পাহাড় হ'তে, সেই মাখন গরম করে ঘি বানিয়ে বড় বড় কাঠের হাঁড়িতে রেখে দেয় ঢেলে। তিন চার পাঁচ বছর পার করে খায় সে ঘি।

আখরোট বাদামেও পুরোনো একটা গন্ধ। কত বছরের এগুলি—কি জানি।

দুনী গ্রাম খানিক ঘুরে ঘুরে দেখি। ঝরণা নালা ডিঙিয়ে এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরি।

গ্রামের এক বড়লোকের বাড়ী, বড় বাড়ী, পাথরে গাঁথা দোতলা বাড়ী। নীচের তলায় ঘাস দানা পশু, উপর তলায় থাকে গৃহস্থরা। বাড়ীর কর্ত্রী লম্বা ছিপ্ছিপে তরুণী। পিছনে কোমর হ'তে লম্বা কম্বলের ঢেউ দুলিয়ে ঘুরছে রানীর মতো এ-ঘর ও-ঘর। শীতের দেশ। ছোট ছোট ঘর, ঘরগুলি ঘিরে ঢাকা বারান্দা। এলোমেলো ছড়ানো, ধুলোয় বালিতে মাখামাখি। ঘরে পথে তফাত নেই, পথটাই যেন উঠে এসেছে উপরে। এসব এরা নোংরা বলে মনে করে না। বন কি কেউ ঝাঁট দেয়? পাহাড় কি কেউ ধুয়ে মুছে রাখে? মাটি-কালি, জীবনেরই অঙ্গ এগুলি।

গৃহস্বামী আমাদের দেখে হেসে ঘরে ঢুকল। তরুণীটি এগিয়ে এলো। হাতে উল বোনার কাঠি, মোজা বুনছে স্বামীর জন্য। ছোট ছোট দু'টি শিশু ঘরে। তারা ইচ্ছে মতো ময়লা করছে ঘর বারান্দা।

পাঁচ ভাই এরা। রূপবতী সকল কিন্নরীই,—এই তরুণী আরো রূপসী। ছোট ভাইকে এখন বাড়ীতে রেখে অন্য ভাইরা পাহাড়ে গেছে, ক্ষেতে গেছে।

তরুণী সীতামণিদেবী একডালা আখরোট এনে ধরল, বলল,—খাও, সংগে নিয়ে যাও, চলতে চলতে খাবে।

খানিকটা খাড়াই ভেঙে তবে পথ। জীপ অপেক্ষা করছে সেখানে। সীতামণি আপ্যায়নের ভঙ্গীতে আমার ডান বাহু তুলে নিল তার বাম বাহুতে। বেশ বুঝতে পারলাম আমার দেহের অনেকখানি ভার সে তুলে নিল নিজের উপরে;—খাড়াইটুকু পার করে দিল। আমার কষ্ট কম হল—সীতামণির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরল। মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসল। টুকটুকে গাল দু'খানি উঁচু হয়ে উঠল। চেপে চেপে কয়েকটা বড় বড় শ্বাস-প্রশ্বাস নিল।

ঋজু ঝাউ গাছটির মতো তন্বী দেহখানি বনের ধারে দাঁড়িয়ে রইল।

আমরা জীপে উঠলাম।

কাল্পা নয় হাজার দু'শ' ফুট উঁচু সমুদ্র হতে। প্রায় হাতের নাগালে হিম-শিখর শ্রেণী। কিন্তু একটু রোদ উঠলেই গরম লাগে। কাল বিকেলে মেঘলা করল, রাত্রে শীতে কাঁপলাম—আগুনের 'আংটা' কাছে নিয়ে রইলাম। আজ ভোরে রোদ উঠেছে, বরফের চূড়াগুলি চক্চক্ করছে, রোদের 'ওম্'—গায়ে চাদর না জড়িয়েও বেশ আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছি। চারদিক হতে ঝরনার কলকলানি শুনতে পাচ্ছি।

কাল্পা হতে দেখা যায় 'কিন্নোর-কৈলাস'-এর চূড়া। এই নামই এই শিখরের। এর কথা কত শুনেছি, বিলাসপুরেও বন্ধুপত্নী বলে দিলেন,—কিন্নোরে যাচ্ছ, কিন্নোর-কৈলাস দেখতে পাবে। দেখবে ক্ষণে ক্ষণে তার রঙ বদলায়। এক রঙ থাকে না বেশীক্ষণ।

আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিন্নোর-কৈলাস। হিমগিরির ভীড়ের মাঝখানে একটি শিখর, যেন একটি মন্দির-শীর্ষ। লোকে বলে 'শিবলিঙ্গ'। এর গায়ে বরফ জমে না। ক্রিস্টেলের পাথরখণ্ডের মতো দেখতে। সূর্যের রঙ ক্ষণে ক্ষণে ধরে নেয় তার গায়ে নানা বর্ণে।

নতুন গড়ছে পথ। তাই ধরে তিব্বতমুখী আরো কিছুটা এগিয়ে আসি। আর নিরাপদ পথ নেই জীপের জন্য। এগোবার চেষ্টা না করাই ভালো। পিছু হটি।

এপারে 'আরাংঝোলা', ওপারে 'রিব্বা'। এতটা যদি এসেছি—নেগীর সখ 'রিব্বাতে'ও যাই, ওপারে নেগীর বাড়ী। জীপের পথ তো নয়, পায়ে চলে নামতে হবে অনেকখানি নীচে। শতদ্রু পেরিয়ে ওপারে আবার উঠতে হবে অনেকখানি উপরে। খাদে খরস্রোতা শতদ্রু, তার উপরে গাছ আর তক্তা ফেলা ছোট্ট পুল। সেই পুলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। উপর হতে ছোট্ট পুল আরো ছোট্ট দেখায়—যেন খেলনার পুল। ঐ পুল দিয়ে পার হতে হবে ভেবে ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠি। এপার হতেই তাকিয়ে থাকি ওপারের 'রিব্বা'র দিকে। কয়েকখানা বাড়ী, কয়েকটা ক্ষেত দেখা যায় এপার হতে। দেখা যায় আঙুরের মাচান। রিব্বায় আঙুর অঙুরীর ছড়াছড়ি—ঢালাঢালি। এ অঞ্চলের অঙুরী বিখ্যাত।

গেস্ট হাউসে ফিরে এসে নেগী চুপিচুপি একটা বোতল বের করে। বলে, সাহেবের জন্য নমুনা এনেছি একটু, কিন্তু ভয়ে বলতে পারছি না।

নেগী আমাকে সরাসরি 'মা' বলেই ডাকে প্রথম থেকে। তাই যা আমার স্বামীকে বলতে পারে না—আমাকে বলে সহজেই।

নেগী বোতলটি টেবিলের উপরে রাখল। সাদা বোতলে যেন টলটলে কলের জল ভরা। স্ফটিক বর্ণ অঙুরী। নির্মল অঙুরী।

দশরার মেলা হয় কিন্নোরে। বিশেষ মেলা। এই মেলায় গ্রাম গ্রামান্তরের লোক আসে। পাহাড়ের উপরে মেলা হয়। লোকেরা অস্থায়ী ডেরা বাঁধে, কয়দিন থাকে। দেব-বিগ্রহও আনে অনেকে। সবাই এই কয়দিন প্রাণভরে ফলের তৈরী মদ খায়, নাচে গায়—হৈ-হুল্লোড়ে দিন-রাত কাটায়। নেগী হাসে, বলে,—এই মেলায় বহু বিবাহও হয়ে যায়। 'লাভ ম্যারেজ'ও হয়, আবার ভাগিয়েও নিয়ে যায় অনেকে।

খাদ্যদ্রব্য যেমন এরা আলাদা করে রাখে, তেমনি মাংসও রাখে। মাংস রাখে বরফের পাহাড়ে।

শীতকালে বরফের পাহাড়ে ছোট ছোট কুঠ্‌রী বানায়,—যার যেমন অবস্থা সেই বুঝে কুঠ্‌রীর আকার হয়। ধনীরা পঞ্চাশ-ষাটটা ছাগল ভেড়া কেটে থান থান মাংস কুঠ্‌রীতে বন্ধ করে রেখে দেয়। নভেম্বরে রাখে, মার্চ মাসে নিয়ে আসে। সারা বছর এই মাংস খায়। মাংসগুলি শুকিয়ে বিস্কুটের মতো হয়ে থাকে। কাঁচা কাঁচা, তেমনিও খাওয়া যায়; আবার চাল ও মাংস একসঙ্গে সিদ্ধ করে, সামান্য নুন দেয়,—ভাত সিদ্ধ হয়ে ঘন ঘন হলে তাও খায়। মাংসে অনেক চর্বি থাকে। ভেড়া বক্‌রীর পেটের চর্বিগুলি টুক্‌রো টুক্‌রো করে আটার গুলির মধ্যে দিয়ে একটু নুন মিশিয়ে জলে সিদ্ধ করে খায়। মশলা বেশী খায় না এরা। ভাজাভুজিও তেমন না। সিদ্ধ জিনিষই খায় বেশীর ভাগ। সালগমের সাথে পনীরের গোল্লা সিদ্ধ করে; এও একটা উপাদেয় খাদ্য এদের।

বিয়েতে যে ভোজ হয় তাতে মাংসই প্রধান। সের সের মতো চাক চাক মাংস প্রচুর জলে সিদ্ধ করে। তাতে নুন আর নামমাত্র মশলা দেয়। কানা-উঁচু থালায় মাংসের সেই জল দিয়ে ভাত মেখে গ্রাসে গ্রাসে মাংস মুখে দিয়ে খায়।

লঙ্কা এরা ছোঁয় না। নুন চা খায় মাখন দিয়ে,—তিব্বতীদের মতো।

ক্ষেতের সব কাজই করে এদের মেয়েরা, কেবল লাঙলটা শুধু ধরে ছেলেরা। এ কাজ মেয়েদের নয়, নিষেধ। ধনীরা বাড়ীতে ক্ষেতের কাজের জন্য চাকর দাসী রাখে টাকা দিয়ে কিনে। এখানকার ধনীরা—সব ছিল 'ট্রেডার'; তিব্বতের সঙ্গে উলের কারবার করত। এরা নোটের টাকাকে মূল্য দেয় না,—সোনা রুপোর অলঙ্কার গড়িয়ে রাখে সম্পদ স্বরূপ।

মেয়েরা হাসিখুসী। কুমারী নারীর মনে খুব যে একটা দুঃখ—তা' নেই। আরাংঝোলায় গ্রাম-মোড়লের মেয়েটি—বেশ বয়স্কা কুমারী, মা'র ঘরে হেসে-খেলে আছে। জিজ্ঞেস করি, বিয়ে না হওয়ার জন্য মন বিষণ্ণ হয় নাকি? সে আরো এক গাল হেসে বললে,—বাপ্‌রে, বিয়ে হলে বড় খাটুনি। একা ঘরের বৌকে ক্ষেত সংসার সবকিছু সামলাতে হয়। এই-ই ভালো আছি।

এদের যেমন কুমারীদের সংখ্যা বেশী, তেমনি কুমারীদের প্রতি কড়া নিয়ম রাখেনি সমাজ। কুমারীরা খুসীতেই আছে।

পথের দু'ধারে ঝাউ গাছের মতোই সিলগুজার গাছ। পাতা দিয়ে চেনা যায় না তফাতটা,—তফাত এর গায়ের বর্ণে। গায়ের বাকলে যেন রুপোর পাতের আভা। গাছে গাছে ফল ধরে আছে, লোকেরা পাড়ছে। এই ফল হতে সিলগুজা বের করে রাখবে। ব্যবসায়ীরা এসে কিনে নিয়ে যাবে। মোটা দাম পায় এরা। আরো মোটা দাম পায় ব্যবসায়ীরা এ বেচে।

কল্‌পা ছাড়বো, কিন্নোর ছাড়বো। বসে আছি আজ সকাল হতে কাঁচঢাকা বারান্দায়। বসে বসে ভাবছি, কতখানি দেখলে দেখা সম্পূর্ণ হয়। সবটা দেখাই কি দেখা? না তো। সবেরই যে একটু আড়াল দরকার। একটু দূর আর একটু আড়াল না হলে যেন ঠিক রূপটি প্রকাশ পায় না।

এই যে সামনে অতি কাছে একসারি পরিষ্কার তুষারশৃঙ্গ,—মনে হচ্ছে এক ছুটে এর মাথায় উঠে যেতে পারি। যেই মেঘে ঢাকলো সব,—যে হিমাদ্রিমালা উন্মুক্ত বক্ষ বিস্তার করে দাঁড়িয়েছিল—পলকে যেন কোন ঊর্ধ্বলোকে উঠে গেল। মেঘ নড়ছে, চলছে. মেঘের ভিতর হ'তে ক্ষণে ক্ষণে এক একটা হিমশিখর যেন মহা-সাগরে ডুব দিয়ে দিয়ে মাথা তুলছে। ভাবছি—এই-ই বুঝিবা এর শেষ সারি, দেখি তার উপরে আর এক সারি মাথা তুলল। তার উপরে আরো হিমাদ্রি জাগল; জাগল, ডুবল, জাগল। অসীম আকাশে কোন্ অদৃশ্যলোকের ইসারা ফুটে উঠল।

কিন্নোর হতে যাবার পথে ভীমাকালী দর্শন করে যাই ইচ্ছা এদের। বলে, ভীমাকালী—জাগ্রত দেবী। এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেবী।

'সারাহান্স্'-র ভীমাকালীর মন্দির। পাথরের চত্বরের উপরে বড় মন্দির। তোরণ, প্রাঙ্গণ সিঁড়ি অনেকখানি অতিক্রম করে তবে মন্দির। পাথরের মজবুত গাঁথনি। প্রায় চারতলা অবধি ভিতর গাঁথনিই। তার উপরে মন্দির।

রুপোর ফটকে লম্বা লোহার শিকল আট্কানো। ঐশ্বর্যময়ী দেবী, তাই সাবধানে রক্ষা করে মন্দির। যদি লোভে পড়ে চোর আসে কখনো, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে শিকলে বাঁধা ঘণ্টাটা বেজে উঠবে সরবে মন্দিরের উপরে।

সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠে তিনতলায় ভীমাকালী দর্শন করি। পূজারী বলেন, - দেবীর এই এক রূপ আর-এক রূপ আছে গুপ্তদেবী রূপে। পাতালেশ্বরীও বলে থাকি তাঁকে। এই পাতালেশ্বরীই আছেন গুপ্তরূপে এই মন্দিরে।

পূজারীই নিয়ে চললেন আমাদের। সিঁড়ি ধরে ঘুরে ঘুরে কোন তলায় এলাম—কি জানি। ঘেরা বারান্দা, ঘর, ঘরের মধ্যে ঘর;—গুপ্তদেবী আছেন এখানে বেদীর উপরে বসে। প্রায় অন্ধকার ঘর,—দেবীর রূপে দেবীর সাজে দেবীর অলঙ্কারে আলো-ঝিকিমিকি ঘর। আসল দেবী ইনিই। পূজারী আমাদের দিয়ে অঞ্জলি দেওয়ালেন, মন্ত্র পড়ালেন।

পূজারী বললেন, অহিরাবণ পাতালে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে পাতালেশ্বরীর কাছে বলি দিচ্ছিল, এমন সময়ে হনুমান গিয়ে তাদের উদ্ধার করে আনে।

মন্দিরের চত্বর ঘিরে দুর্গের মতো দেয়াল। দেয়ালে খুপ্রী খুপ্রী ঘর; কতক আছে, কতক ভেঙে পড়ছে,—ভেঙে গেছে। পূজারী ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছেন আর বলছেন,—বাণাসুরের রাজত্ব ছিল এটা। তখন হতে প্রতি বছর নরবলি হত এখানে। সেদিন পর্যন্ত হত;—আইনের কড়াক্কড়িতে প্রকাশ্যে আর নরবলি হত না। তবে দেবীর নামে একটি 'নর'কে উৎসর্গ করে এখান হতে নীচে ফেলে দেওয়া হ'ত। বলে, একটি খুপ্রী ঘরে পাথরচাপা সুড়ঙ্গ দেখালেন।

সোজা এক কালো সুড়ঙ্গ। পূজারী বললেন,—এর নীচে ঝরণা আছে, কুণ্ডে ফেলে দিয়ে সুড়ঙ্গে আবার এমনি করে পাথর চাপা দিয়ে দিত। বর্ষাকালে ঝরণার টানে সবকিছু ধুয়ে কোথায় চলে যেত।

—এখন ?

পূজারী হাসেন। এখন আর হয় না নরবলি।

—দেবী ?

—দেবী তো খুসী আছেন বলেই মনে হয়।

সারাহান্স্ একটি নগর। এই নগর বাজার-বসতিতে পূর্ণ। রামপুর রাজার বাড়ীও আছে একটি এখানে। মন্দিরের কাছেই বাড়ী।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে সারাহান্সের জনসমাবেশ হয়েছে। স্বামী বসলেন তাদের

নিয়ে কথাবার্তা বলতে। ততক্ষণে আমি মন্দিরকে কেন্দ্র করে সব একবার ঘুরে দেখে এলাম। মন্দির প্রাঙ্গণের এক ফটক দিয়ে ঢুকে আর এক ফটক দিয়ে বেরিয়ে এলাম। আর একবার এসে দাঁড়ালাম মন্দিরের সামনে। মন্দিরের মাথায় সোনার দাঁড়ে সোনার চাঁদ, সোনার কলসী। দূরের আকাশে একটি তারা।

কেরেলা

শুধু মনীষীদা'র সঙ্গে দেখা করতেই মাদ্রাজে নামলাম। আবার ট্রেনে উঠলাম।

এদিকটায় এখন বর্ষা। চারিদিকে জল জমেছে। ঘোলাটে আকাশ হ'তে বৃষ্টি ঝরছে। তারি মধ্যে ধোপী ঘাটে কাপড় কাচছে, চাষী মাঠে হাল চালাচ্ছে, মোষের দল নিয়ে রাখাল চলেছে, হাঁসের ঝাঁক জলাভূমিতে। ছেলে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর, মেয়েরা জলের কলসী মাথায় দ্রুত পা' ফেলে চলেছে, ঘরের দাওয়ায় শিশু কাঁখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মা। বর্ষার জলধারার ভিতর দিয়ে মেয়েদের রঙীন শাড়ী রঙীন কাঁচুলি দেখাচ্ছে যেন জলে ফুটে থাকা নানা রঙের কুমুদ কহ্লার।

কার্তিক মাস যায় যায়, অগ্রহায়ণ এলো বলে; এই সময়ে এখানে বর্ষা নামে। রিমঝিম্ ঝিম্‌ঝিম্—ঝরঝর ঝম্‌ঝম্—কেবলি শব্দ উঠছে পড়ছে।

রাত ভোর হ'ল। ট্রেনের কামরার জানালা খুলে দিতে চোখ জুড়িয়ে গেল। বর্ষায় ধোওয়া কচি ধানের সবুজ, শস্য ক্ষেতের সবুজ,—সবুজ নারকেল গাছ, সবুজ বনবনানী, সবুজ পাহাড় শ্রেণী;—নিকটে দূরে সব সবুজে সবুজ। স্থির জলে সবুজ গাছের ছায়া। লাল মাটি—কড়া মাটি, সবুজে আজ তার বুক ঠাণ্ডা।

গাছের ছায়ায় ছায়ায় চাষীর ঘর; লাল টালির চাল, চুণে লেপা শুভ্র দেয়াল,—সবুজের মাঝে মাঝে যেন চন্দন কুম্‌কুম্ কপালে লেপা সাদা ধুতিপরা শুচিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ এক একটি।

ষ্টেশনে ষ্টেশনে কলা পাতায় মোড়া ঈড্‌লি, পিতলের বাটিতে পিতলের গ্লাশ ভরা তৈরী করা গরম কফি উপুড় করা। গ্লাশটা ওঠালে গ্লাশের কফিতে বাটি ভরে যায়। ম্যাজিক যেন। গ্লাশভরা কফি বাটি দিয়ে ঢেকে উল্টে রাখার সঙ্গে সঙ্গে 'এয়ারটাইট' হয়ে যায়, কফি বেরিয়ে আসে না। ধুলোবালি পড়ে না, জুড়িয়ে যায় না;—পরিচ্ছন্ন গ্লাশ বাটি।

কচি কলাপাতার প্যাকেটে মাখা দইভাত, সম্বরভাত, তেঁতুলভাত বিক্রি হচ্ছে ষ্টেশনে। আর বিক্রি হচ্ছে খোঁপায় দিতে গোলাপী গোলাপের গোড়ে মালা।

আঙুর এক টাকা করে কেজি। ক্ষেতে ক্ষেতে আঙ্গুরলতা মাচার উপরে লতানো। দিকে দিকে কলাবাগান, হৃষ্টপুষ্ট বেঁটে বেঁটে কলা গাছে ভরা।

রঙীন শাড়ীর দেশ বদলে গিয়ে সাদা সাজের দেশ হয়ে গেছে কখন যেন। মেয়েরা পরেছে সাদা লুঙ্গি, সাদা ব্লাউজ, পাটকরা চাদর কাঁধে। ছেলেদের পরনেও সাদা লুঙ্গি—ধব্‌ধবে সাদা।

পুরাতন পাথরের মূর্তিতে যেমন দেখি, তেমনি মেয়েদের কানের বড় বড় ফুটোতে নিরেট সোনার মাক্‌ড়ি।

ক্ষেতে কাজ করছে মেয়েরাই বেশী। ধান লাগানো, গোড়া খ‍ুঁড়ে দেওয়া, আগাছা তোলা, 'ট্যাপিওকা'র মূলে মাটি উঁচু করে দেওয়া,—কত কাজ করে চলেছে সকলে।

বেলা পড়ে আসছে। গৃহস্থের বাড়ীতে দড়িতে মেলে দেওয়া সাদা কাপড় হাওয়ায় দুলছে। উঠোনে মেয়েরা একে অন্যের চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছে, কোনো কোনো ঘরে রান্না চাপিয়েছে—ধোঁওয়া উঠছে চাল ফুঁড়ে! উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ ছোটরা যে যার আঙিনায় জড়ো হয়েছে।

যেদিকে তাকাই সবুজের পটভূমিতে ছবি এক একখানি।

জল, ধানক্ষেত—তারি মাঝে গ্রাম;—এযে আমার চেনা জায়গা। ঘরের পিছন দিয়ে ঐ যে মাটিতে পায়ে চলার রেখাটি,—ও যে আমার চেনা পথ। ঐ যে মেয়েটি যাচ্ছে সাজি হাতে—ও তো আমিই। মামাবাড়ীর পশ্চিম পাড়ার চৌধুরীদের বাড়ী চলেছি অতসী ফুল আনতে,—সন্ধ্যেবেলায় লাগবে 'তারাব্রতে'।

এমনি সবুজ, এমনি নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম, এমনি স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া,—বহুকালের দূরে সরে যাওয়া আমার মামাবাড়ী ফিরে পাই। কেবল থান ধুতি পরা আমার মা—তিনি নেই।

অস্তরবির লাল আভা আকাশ জুড়ে। নারকেল গাছের ঝিরঝিরে পাতা জাফ্‌রি কেটে রেখেছে আকাশের গায়ে। সেই জাফ্‌রির ফাঁকে ফাঁকে সূর্যাস্তের রং সামিয়ানা টানিয়ে রেখেছে গ্রামের উপরে।

ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বললো। গাছ গ্রাম মানুষ সব ডুবে গেল অন্ধকারে। কেবল দীপশিখাগুলি ঘন আঁধারে অমাবস্যার আকাশ ভরা তারার মতো ফুটে রইল।

ত্রিবান্দ্রাম এলাম। রাজভবন, তাপনিয়ন্ত্রিত ঘর—অঘোরে ঘুমোলাম সারারাত।

ভোরে স্নান সেরে 'পদ্মনাভম্' মন্দিরে এলাম। নয়শ' বছরের পুরাতন মন্দির। চারদিকে চার সিংহদ্বার। পূর্বদিকের প্রধান তোরণটি রাজার জন্য। রাজা আসেন এই পথ দিয়ে প্রতিদিন প্রাতে পদ্মনাভন্‌জীকে দর্শন করতে। এই দ্বার বন্ধই থাকে সারাক্ষণ। রাজার আগমন উপলক্ষে খোলা হয় কেবল। সাততলা তোরণ। আগাগোড়া পাথরে খোদাই নানা মূর্তি নানা কারুকাজময়। মাথায় সাতটি সোনার ঘট। তোরণই যখন এমন, মন্দিরও তেমনিই হবে।

পশ্চিম দ্বার—পিছনের দ্বার,—সর্বসাধারণের দ্বার। এই দ্বার দিয়েই ভিতরে ঢুকি। প্রথমেই দুই দিকে দুই বিরাট দীপস্তম্ভ, পাথরের। গোড়া হ'তে মাথা পর্যন্ত বড় হ'তে হ'তে ছোট হয়ে উঠেছে পর পর পাথরের থালার সারি। থালা ঘিরে প্রদীপ,—খোদাই করা। এই দীপগুলি জ্বলে যখন, সোনার ঝাউ গাছ হয়ে শোভা পায় দু'দিকের দুই দীপস্তম্ভ।

সব নিয়ে বড় মন্দির হলেও আসল বিগ্রহের মন্দিরখানি ছোট্ট। একখানি গোটা পাথরের চাতালের উপরে মন্দিরখানি। সামনে দাঁড়িয়ে দেখবার স্থান অতিশয় সংকীর্ণ। তিনটি দরজা দিয়ে তিন ভাগে তিন দফায় দেখতে হয় বিগ্রহ মূর্তি। পদ্মনাভন্‌, অনন্তনাগের উপরে বিষ্ণুর শায়িত মূর্তি। প্রথম দরজার সামনে এলে দেখা যায় বিরাট এক কালো পাথরের বাহু মাটির দিকে অঙ্গুলি হেলিয়ে এগিয়ে আছে। শয্যা হ'তে হাতখানি বাইরে বের করা। এটি পদ্মনাভনের দক্ষিণ হস্ত। কাঁধ হ'তে আঙুল পর্যন্ত রত্নালঙ্কার ও ফুলের মালায় ভরা। হাতে ফুলের হাত-পদ্ম, সোনার বলয়, কঙ্কণ;—দক্ষিণী রমণীর কোমরবন্ধ হয়, এত বড় কঙ্কণ। কব্জি অবধি সোনার জামা। সোনায় পাথরে ঝলমল করে হাতখানি।

মন্দিরের ভিতরে টিমটিমে প্রদীপশিখা,—এই আলোতে চোখে আরো অন্ধকার লাগে সব। মনে হয়, অন্ধকার গুহা হ'তে বেরিয়ে আসা অতি বিরাট কালো বাহুর থাবা একখানা। এই কি সব?

পণ্ডিত বললেন,—তা' নয়। এবারে পাশের এই থামটার গায়ে গা চেপে দাঁড়াও, চোখের উপর হাত রেখে আলো আড়াল কর;—এবারে দেখতে থাকো। ঐ যে উপর দিয়ে অন্ধকারে একটি মালা এলানো আছে—তা' হচ্ছে পদ্মনাভনজীর কপাল। ঐ কপাল লক্ষ্য করে মুখ দেখতে চেষ্টা কর।

দেখি, শোওয়া অবস্থায় মুখের একটি পাশ। নাকের ডগা, ঠোঁট, থুতি—উঁচু জায়গাগুলিতে একটুখানি আলোর আভা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আছে—ছবির 'হাইলাইটের' মতো। বিরাট মুখ, অতি সুন্দর মুখ—মুখের গড়ন।

পণ্ডিত বললেন,—এবারে এসো এই মাঝের দরজার সামনে দাঁড়াও। এই মাঝের দরজাই বিশেষ দরজা। এখান হতেই দেখতে পাওয়া যায় নারায়ণের নাভি-মণ্ডল। এই নাভিমণ্ডল হতেই ব্রহ্মা উৎপন্ন হলেন। ঐ দেখ ফুলের মালা মূর্তির উপরে বুক হতে নাভিমণ্ডল হয়ে পেটের উপর পর্যন্ত।

সাদা লম্বা গোড়ে মালা বিগ্রহের বুক হ'তে কোমরে এসে একটু নেমেছে, পেটের দিকে উঠেছে, নাভির কাছে হেলেছে;—মালার এই ঢেউ-খেলানো নিশানা নিয়ে অন্ধকার মন্দিরে দেবতার দেহ অবয়বের সন্ধান খুঁজে পাই।

তৃতীয় দরজায় ফুলের মালায় ঢাকা জানু, হাঁটু ও চরণ দু'খানি।

তিন পাক খাওয়া অনন্তনাগের উপরে বিষ্ণু শয়নে। তিন দরজার ঘরজোড়া আঠারো ফুট লম্বা কালো পাথরের বিগ্রহ।

বিগ্রহ মন্দিরের সামনে সোনার স্তম্ভ, মন্দির-দেবতার পতাকা ওড়ে এতে।

একপাশে হনুমান করজোড়ে দাঁড়িয়ে। শালপ্রাংশু মহাভুজ; কালো পাথরের বিশাল দেহ।

বীর হনুমানজীর মূর্তিতে সিঁদুর লেপে, এই-ই দেখেছি। এখানে মাখন মাথায়। পুরু মাখন দিয়ে হনুমানজীর কালো মুখ সাদা করে রেখেছে। গলায় সাদা মাখনের মোটা পৈতে। দু'পা ঢাকা তাল তাল মাখনে।

এদেশ গরম দেশ। পণ্ডিত বললেন,—ঘরে মাখন রাখি, গলে যায়। কিন্তু এই হনুমানজীর মাখন সারাদিন এমনি থাকে, পোকা পিঁপড়ে লাগে না, এক ফোঁটা গলে না।

হনুমানজীর গলা হতে পা ছুঁয়ে ঝুলছে দেড় মানুষ সমান লম্বা জেমন্তীর হলুদ গোড়ে মালা একখানি।

দোরের একদিকে হনুমানজী, একদিকে গরুড়। দেয়ালে, থামে দেবদেবীর মূর্তি-কাহিনী। বিরাট নটরাজ; একপাশে মহাবিষ্ণু তবলা বাজাচ্ছেন, একপাশে ব্রহ্মা করতাল ধরেছেন—শিব তাণ্ডব নৃত্য করছেন। এমন বাদ্যকর না হলে শিবের তাল ধরবে কে?

পাথরে খোদাই নানা মূর্তিতে রামায়ণের কাহিনী। একটি চাতাল ঘিরে নানা দেবদেবী, যেন তাদের দরবার বসেছে এখানে। একসঙ্গে পাঁচ-ছয়টা সরু সরু থাম, এই রকম থামের গোছা চাতালের চার কোণে। 'মিউজিক্যাল' থাম। এক একটা থামের গায়ে এক এক রকম নক্সা খোদা। সেই খাঁজখোঁজের দরুন থামের গায়ে আঘাত করলে এক একটা হতে এক এক সুরে শব্দ হয়। পণ্ডিত থাম-গুলির গায়ে চাঁটি মেরে মেরে একটি পুরো 'গত্'ই বাজিয়ে ফেললেন।

মন্দিরের দেয়াল ঘেরা সারি সারি প্রদীপ; চল্লিশ হাজার প্রদীপ এইসব

সারিতে। মন্দিরের আঙিনা ঘিরে পাথরের 'করিডোর', করিডোরে সারি সারি থাম। প্রতিটি থামের গোড়ায় একটি করে নারীমূর্তি, বুকের কাছে অঞ্জলি-বদ্ধ হাতে একটি করে প্রদীপ। প্রদীপ, নারী, থাম—সব একটা পাথর থেকেই খোদাই করা। প্রদীপ হাতে নারীর সংখ্যাও তিনশ'র বেশী।

মাসের মধ্যে বিশেষ তিথিতে বিশেষ উপলক্ষে তেরদিন সব বাতিগুলি জ্বলে। আঠারো টিন নারকেল তেল লাগে সেদিন। অন্যান্য দিন লাগে তিন টিন করে তেল।

করিডোর ধরে পূব তোরণে আসি। ধবধবে সাদা বালি তুলে ফেলছে পথ হতে।

রাজা যেখান দিয়ে যান লাল শালু পেতে দেওয়া হয় পথে; কিন্তু এখানে আসেন দেবদর্শনে, ধুলো মাড়িয়ে। তোরণ হতে মন্দির পর্যন্ত যে পথে রাজা আসেন, সেই পাথরে তৈরী পথে, করিডোরে, চাতালে রোজ সাদা বালি বিছিয়ে দেওয়া হয়। রাজা আসেন, দেবদর্শন করে চলে যান; সঙ্গে সঙ্গে বালি তুলে সাফ করে ফেলা হয়। আবার পরদিন নতুন করে নতুন আনা বালি বিছানো হয়। এই সাদা বালি কেবল এখানেই সমুদ্রের ধারে মেলে, আর কোথাও নয়। খড়িমাটি গুঁড়োর মতো সাদা বালি।

মন্দির দেখলাম, মন্দির প্রদক্ষিণ করলাম।

যেখানে মন্দিরের ভিতরে পদ্মনাভনের পা দেয়াল দুখানি ছুঁয়ে আছে, সেই দেয়ালের বাইরের দিকে চরণ বরাবর দুটি প্রদীপ জ্বলে বাইরে। অখণ্ড প্রদীপ। এই প্রদীপ যদি নিভে যায় কোনো কারণে, সবাই মেনে নেয় রাজপরিবারে কোনো বিপদ আসছে ঘনিয়ে।

রাজবংশে কুলদেবতা পদ্মনাভন্‌জী।

শুনলাম আজই এক তিথি আছে, সন্ধ্যেয় সব বাতি জ্বলবে মন্দিরে।

বিকেলে 'ভেলানাদ' গ্রামে এলাম। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী দেশে-বিদেশে ছড়ানো। 'আমাদের শান্তিনিকেতন, সে যে সব হতে আপন',—এ গান সকলের প্রাণের কথা। কতকাল আগের ছাত্র সেই আগের মতোই ছুটে কাছে আসে। যেমন আমরা যাই আমাদের গুরুর কাছে।

বিশ্বনাথন প্রিয় ছাত্র স্বামীর। ভেলানাদ গ্রামে বাড়ী। এখানে শান্তি-নিকেতনের কথা মনে রেখে স্কুল করেছে একটি, নিজের বসতবাড়ী ক্ষেত জমি আর গ্রামের বালক-বালিকা একসঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে।

বিশ্বনাথনের স্ত্রীও যোগ দিয়েছে স্বামীর কাজে। নিজের রান্নাঘরে স্কুলের সকলের রান্না হয়, নিজ সন্তানের পাশে স্কুলের ছেলেরা ঘুমোয়। খেলতে খেলতে জামা ছিঁড়ে গেলে তার ঘরেই জমা হয় মেরামতের জন্য।

মাত্র কয়েকটি ছেলে নিয়ে আরম্ভ করেছিল স্কুল, এখন বেশ বড় হয়ে উঠছে। আশেপাশের গ্রাম হতেও ছেলেরা আসছে পড়তে।

এখানকার মাটি লাল মাটি, অনেকটা শান্তিনিকেতনের মতো। স্কুলের জমি এখন দিন দিনই বাড়ছে, অন্যরাও জমি দিচ্ছে। ছেলেরা চাষ করছে, বাগান করছে। তারা তাঁত বোনে, ছবি আঁকে। গাছতলায় ক্লাশ হয়, সারাদিন খোলা আকাশের নীচে কাটায়। চালাঘরে ঘুমোয়।

আমেরিকা হতেও কয়েকজন বন্ধু টাকায় ও শ্রমে এগিয়ে এসেছেন বিশ্বনাথনকে সাহায্য করতে।

তাড়াতাড়ি ফিরবো ত্রিবান্দ্রামে। বিশ্বনাথন বাধা দেয়, বলে, দুটো আম চারা

লাগাতে হবে আমাদের দু'জনকে স্কুল প্রাঙ্গণে। বিশ্বনাথন হাসে, বলে, 'দেখবো কার আম গাছে বেশী ফল ধরে'। সেই আগের মতোই মিটিমিটি হাসি হেসে বলে,— অনিলদার চেয়ে রানীদির গাছেই বেশী আম ধরবে, বেশী মিষ্টি হবে।

মনে পড়ল ত্রিবীর কথা। আলমোড়ার পাণ্ডে পরিবারের ছেলে, পিতা ছিলেন রামপুর নবাবের মন্ত্রী। গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ, সুপুরুষ ত্রিবী। পিতার মৃত্যুর পর কিছুদিন পিতার জায়গায় কাজ করে, পরে পুলিসের কাজে যোগ দেয়, এস, পি হয়।

সুযোগ সুবিধে পেলেই আসত, আমাদের সঙ্গে দেখা করে যেত। তাদের অনিলদাকে তারা ভালোও বাসত যেমন, ভয়ও করত। সেসব গল্প করে হাসাহাসি করত।

সেই ত্রিবী বিয়ে করলো, ছেলে হ'ল, মেয়ে হ'ল। ছেলের নাম রাখলো অনিল, মেয়ের নাম রাখল রানী। ত্রিবী হাসে আর ফিসফিস করে বলে,—ইচ্ছেমতো ছেলেটাকে ধরে মারি।

—আর মেয়েকে?

ত্রিবী তার অনিলদার দিকে তাকিয়ে খল্‌খল্‌ করে হাসে, বলে, মেয়েটাকে খুব আদর করি।

গুরু-শিষ্যের এই সম্বন্ধ বড় মধুর। শান্তিনিকেতনের এই রকম মধুর স্মৃতিতে আমাদের বুক ভরা।

বিশ্বনাথন্‌ ছাড়ে না। তার স্কুলের ছেলেমেয়েরা সেজে বসে আছে, তারা নাচবে, গাইবে, নাটক করবে। দেখে যেতে হবে।

কিন্তু আমার যে ত্রিবান্দ্রামে ফিরবার তাড়া আছে।

কচি মনে ব্যথাও দিতে পারি না। তাদের নাচ দেখি, গান শুনি, হাসি, হাত-তালি দিই। শেষে রান্নাঘরে চাটাইর উপর বসে সিদ্ধ ট্যাপিওকা খেয়ে রওনা হই।

বাইশ মাইল পথ। ড্রাইভারকে বলি তাড়াতাড়ি করে চালাতে। বেগে গাড়ী ছুটল।

আজ আমাকে দেখতেই হবে দীপোৎসব। চল্লিশ হাজার দীপমালা মন্দির ঘিরে—না জানি সে কেমন দেখতে। না জানি কী শোভা ধরে দীপস্তম্ভ থাকে থাকে থালাভরা দীপিকাসহ।

আর,—আর সেই সারি সারি প্রস্তর-রমণী—যারা বক্ষোপরে তুলে ধরে আছে প্রদীপখানি, সেই দীপ্ত প্রদীপের দ্যুতি পড়বে তাদের মুখে, কপালে, চুলে,— পড়বে পীনপয়োধর 'পরে। শত শত অহল্যা আজ জেগে উঠবে আপন আপন বুকের দীপশিখা নিয়ে।

এ দেখতেই হবে।

ত্রিবান্দ্রামে ঢুকে গাড়ী সোজা মন্দিরমুখী যেতে বলি।

সেই পিছনের ফটক-এ এলাম।

এক এক করে বেরিয়ে আসছে পূজারী ব্রাহ্মণরা সারাদিনের কর্মক্লান্ত দেহ নিয়ে। সময় হয়ে গেছে, মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে। বাতি নিভে গেছে। আজকের মতো সব সারা। কাল ভোরে আবার জাগবে মানুষ নিয়ে মন্দির। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় কাজ চলে মন্দিরের।

আবার—আবার কবে জ্বলবে বাতি?

পণ্ডিত আঙ্গুল নেড়ে গুণে গুণে হিসাব করে বললেন,—আবার ছয়দিনের দিন।

সেদিন তো থাকবো না এখানে।

অন্ধকার মন নিয়ে মন্দিরের দিকে তাকালাম,—মন্দির অন্ধকার।

কেরেলার রাজধানী ত্রিবান্দ্রাম। বড় সহর; কিন্তু সহরের ঔদ্ধত্য নেই এর। মাথা খাড়া করে কোনো প্রাসাদ সুর কেটে দেয়নি আচম্‌কা। কোনো ইমারত হাত-পা ছড়িয়ে ভীড় ঠেলে ফাঁকা স্থান বের করে নেয়নি নিজের জন্য। পাকা বাড়ী, টালির ঘর, পাতার কুটির—সবই যেন একই ছায়ার তলায়। একই আম কাঁঠাল সুপারি কলা নারকেল গাছ সবার আঙিনায়, গা লাগালাগি প্রতিবেশী সবাই। এক কোমল আচ্ছাদন ক্ষেত, পথ, বাড়ী,—সবকিছুর উপরে।

সকালে তেলেজলে স্নান করে ভিজে চুল পিঠে ফেলে, কপালে কুম্‌কুম্‌ চন্দন, মাথায় প্রসাদী ফুল নিয়ে চলেছে মেয়েরা স্কুলে কলেজে। যেন গৃহলক্ষ্মীরা চলেছে। অন্দরের লক্ষ্মীশ্রী পথে পথে ছড়িয়ে পড়েছে।

পথ চলে গেছে সহর হতে সহরতলীতে, নগরে গ্রামে সোজা একটানা দু'ধারে বসতি রেখে। কোথায় সহরের শেষ, কোথায় গ্রামের সুরু—ধরা যায় না। জমি ফেলে রাখেনি কেউ। মাথা গুঁজবার ঘরটুকু বাদে সব মাটিটুকু খাদ্য উৎপাদনে লাগানো। তাই কারো তেমন বিরাট বাড়ী নেই।

ফুলেরও সেই বাহার নেই কারো বাড়ীতে। যেখানে মাটির এত আদর, মুখের আহার জোগায় মাটি, সেই মাটি নিয়ে সখ করা যায় না। তবু আছে বৈকি ফুল, জবা স্থলপদ্ম করবী গোলঞ্চ আছে কিছু কিছু গৃহস্থের বাড়ীর দেয়াল ঘেঁষে।

জমি একটুও খালি রাখেনি এরা। নারকেল সুপারি কলা সোজা উপরে তোলা, নীচে ধান ট্যাপিওকা। সুপারি গাছের কাণ্ডটাও বৃথা যেতে দেয়নি, গাছের গায়ে তুলে দিয়েছে গোলমরিচের লতা। কালোমরিচ,—এরা বলে কালো সোনা। এই কালো মরিচ এদেশে প্রচুর হয়, অনায়াসে হয়, যত্রতত্র হয়; কালো মরিচ বিদেশে রপ্তানী করে বহু টাকা পায় এদেশের লোক। ধনী দরিদ্র প্রতি বাড়ীতেই হয় কালো মরিচ।

উদার আকাশ এখানে নেই। যেখানে একটু খোলা আকাশ, তার তলায় ধানক্ষেত। নয়তো শুধুই নারকেল সুপারি কলাপাতায়, বৃক্ষপল্লবে আলো-ঝিলিমিলি খেলা কেরেলা জুড়ে। সকাল-সন্ধ্যার সূর্য জানি লম্বা ছায়া ফেলে জড়জীব সকলের উপরে, কিন্তু এখানে তা হয় না। কোন ছায়া যে কোন সময়কার বুঝবার উপায় নেই। পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়া আলোছায়ায় একই আলপনা আঁকা বনে নগরে।

সীমান্তে আকাশ,—সেও এখানে নেই। নারকেল পাতা চারদিকে বাহু মেলে আঙ্গুল নেড়ে কথাকলি নাচ নেচে চলেছে আকাশের গায়ে। এ ভাষা হাতছানি দেয় অবিরত।

পথে যানবাহনের ভীড় নেই। যন্ত্রের কোলাহল নেই। পায়ে হেঁটে চলেছে নাগরিক নারী-পুরুষ। পরিষ্কার পথ। একটি কাগজের টুকরো নেই পড়ে কোথাও। কাগজের ব্যবহারও কম এখানে। বাজার করলে সওদাপত্র নারকেল পাতায় বোনা ঠোঙা ভরে খদ্দেরের হাতে তুলে দেয় দোকানীরা। কাগজের ঠোঙার বদলে নারকেল পাতার ঠোঙার চল এখানে। গ্রামের মেয়েরা নারকেল পাতায় বোনা ডালার মতো ছোট ছোট টুক্‌রী আনে মাথায় করে, তার মধ্যে চাল-টেপিওকা কিনে নিয়ে যায় ঘরে।

নারকেল পাতার বহু ব্যবহার কেরেলায়। নারকেল পাতায় বোনা শিকের ঝোলে

রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ি। নারকেল পাতার ছোট বড় তালাই বুনে তাতে শোয় বসে লোকে। গরুর গাড়ীর 'ছই' নারকেল পাতার। খোলা গরুর গাড়ীতে কাঁচা নারকেল পাতায় বোনা সবুজ সবুজ ঝুরি ভরা—কলার গাড়ীতে কলা, বালির গাড়ীতে বালি, নারকেল পাতায় বোনা ঘরের বেড়া, ঘরের চাল। খড় দিয়ে ঘর ছায় না, খড়টুকু রেখে দেয় গরু-বাছুরের জন্য। গোচারণের ভূমি নেই যথেষ্ট করেলায়, তাই খড়টুকু রাখে সেই কারণে।

তারপর আরো আছে,—নতুন বাড়ী তৈরী করে যখন কেউ, নানা লোকের নানা নজর, কুনজরে বাড়ী তুলতে বাধা না পড়ে—তেতলা চারতলা অবধি বাড়ী চারদিক হতে ঘিরে ঢেকে দেয় এই নারকেল পাতার বুনানি দিয়েই। নৌকোর পাল তাও নারকেল পাতার। ইঁট বালি বোঝাই ভারী ভারী নৌকো, মস্ত তার পাল আকাশের গায়ে,—এই নারকেল পাতার মিহি চাটাই জুড়ে জুড়েই তৈরী সেই পাল।

আমাদের ওদিকে খাবারের দোকান মানেই মিষ্টির দোকান, কত রকমের মিঠাই মণ্ডা গ্লাশকেসে ভরা। এখানে দোকানে দোকানে ঝোলে কাঁদি কাঁদি কলা। মিষ্টির দোকান কৈ দেখলাম না তো একটিও। ছোট বড় হরেক রকমের কলা। এরা বড় কলাকে বলে 'বানানা'—বানানা ভেজে খায়, সিদ্ধ করে খায়, তরকারী বানিয়ে খায়। এরা বলে, দুটো কলা সিদ্ধ একটা মুরগীর ডিমের সমান পুষ্টিকর।

আর, ছোট কলাকে বলে 'প্ল্যানটেন', এ কলা পাকিয়ে খায়।

'পুথেনকেনেন' গ্রাম, নারকেল বনের ভিতরে গ্রাম। বালিমেশানো লাল মাটির পথ। অনেকখানি পথ হাঁটতে হল—বড় রাস্তা হতে নেমে। ভিজে ভিজে মাটি, বানিয়ে খায়। দুটো কলা সিদ্ধ নাকি একটা মুরগীর ডিমের সমান পুষ্টিকর।

পুথেনকেনেন-এ শ্রীআইয়ানকালির একটি মূর্তি স্থাপনায় পৌরোহিত্য করলেন স্বামী, মূর্তির ঢাকনা খুললেন। সমাজসেবক হরিজন আইয়ানকালি হরিজনদের উন্নতির জন্য সারাজীবন কাজ করে গেছেন। দেশের লোক, গ্রামের লোক সেকথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে রাখতে চায় যুগ যুগ ধরে।

গ্রামের প্রান্তে সমুদ্রের ধারে ছোট একটি পার্ক করে মূর্তি স্থাপনা হল। শ্রদ্ধা জানানো হল। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন। যত গ্রামের লোক এসেছে, কত কন্যা বধূ, বালক-বালিকা শিশু। গ্রামের উৎসব, সানাই বাজছে, লাউড্‌স্পিকার চলছে, পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। ছোটখাটো একটা মেলা বসে গেছে। পাড়ার ছেলেরা থিয়েটার করবে রাত আর একটু ঘন হলে।

যে পথ দিয়ে এসেছিলাম, সেই পথেই ফিরি। নারকেল পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির জল হাত দিয়ে তুলে নিয়ে আর একবার কপালে বুলোই,—ঠাণ্ডা।

'ভারকালা'য় জনার্দন মন্দির। শুনি, পাণ্ডুরাজা ত্রেতা যুগে এ মন্দির স্থাপন করেছিলেন।

পণ্ডিত বললেন,—এককালে ব্রহ্মা একবার এখানে হবন করছেন; যতলোক আসছে, যে যা চাইছে ধনরত্ন দান করছেন। লক্ষ লক্ষ লোক আসছে, খাচ্ছে, দান নিয়ে যাচ্ছে। দু'হাতে দান দিচ্ছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার মনে অহংকার এলো—কারো বাসনা অপূর্ণ রাখবেন না।

অহঙ্কার হওয়া মাত্র দর্পহারী নারায়ণ এলেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে। বললেন, তিনদিন অনাহারী আছি, আমাকে আহার দাও।

ব্রাহ্মণকে আসন পেতে পাতা বিছিয়ে ভাত পরিবেশন করা হ'ল। ব্রাহ্মণ আসনে বসে ডান হাতে জল নিলেন আচমন করবেন,—পাতের ভাত অদৃশ্য। লক্ষ লোকের তৈরী খাদ্য রান্নাঘরে অদৃশ্য। ব্রাহ্মণ জল হাতে নিয়েই আছেন, আচমন করলেই খেতে হবে। বললেন,—খাবার দাও।

ব্রহ্মা তখন দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন স্বয়ং নারায়ণ এসেছেন ব্রাহ্মণের রূপ ধরে। ব্রহ্মা লুটিয়ে পড়লেন নারায়ণের পদতলে।

পণ্ডিত বললেন, হাতে সেই আচমনের জল নেবার ভঙ্গীতে নারায়ণ এখানে জন-অসুর-হন্তা জনার্দন নামে মন্দিরের ভিতরে। আর পাথরে খোদাই ব্রহ্মার লুটিয়ে পড়া প্রণাম মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে।

লক্ষাধিক প্রদীপ মন্দিরে, দেয়ালের গায়ে।

স্ত্রীলোকদের জন্য তেমন কোনো কড়াক্কড়ি নেই। শাড়ী পরেই আসে তারা। পুরুষদের প্যাণ্ট পাজামা পরে ঢোকা নিষেধ। এমন কি কাছা দিয়ে কাপড় পরেও মানা। বিশেষ ব্যবস্থা আছে; পণ্ডিত স্বামীকে নিয়ে গেলেন মন্দিরের অফিস ঘরে। লুঙ্গির মতো করে পরবার জন্য তাঁকে ধুতি দিলেন একটা, আর 'অংগ বস্ত্রম্' দিলেন চাদরের মতো কাঁধে রাখতে।

আগে মন্দির পরিক্রমা করে তবে ঢুকতে হয় মন্দিরে।

মন্দির প্রাঙ্গণে বাঁধানো এক চাতালে বহু নাগমূর্তি। পণ্ডিত বললেন, লোকের 'নাগদোষ' ঘটলে পাথরে একটি নাগমূর্তি করে এখানে পুজো দেয়। জমিতে নাগের উপদ্রব, কিংবা ঘরে নাগের বাসা—এইসবই নাগদোষ।

ছোট অনুচ্চ মন্দির, ভিতরে জনার্দন। সারা অঙ্গে শ্বেত চন্দন। পঞ্চ প্রদীপের দীপ্ত জ্যোতিতে শ্বেত অঙ্গ উদ্ভাসিত।

প্রতিদিন দর্শনার্থীদের হাতে আশীর্বাদী ফুল-তুলসীর সঙ্গে এই প্রসাদী বাসি চন্দন কিছুটা করে দিয়ে দেন পুজারীরা, সুগন্ধি আতর মেশানো সুরভিত চন্দন।

সমুদ্রের ধারে মন্দির। সমুদ্রের তীরে বালির মধ্যেই খাবার জলের ঝরণা কয়েকটা।

এখান হতে কিছু দূরে 'শিবগিরি';—মহাত্মা শ্রীনারায়ণস্বামীর সমাধি। একটু উঁচু টিলা। ভক্তরা এই টিলায় সমাধির উপরে মন্দির তুলেছে। গুরু নারায়ণ-স্বামীর নামে দিকে দিকে স্কুল হাসপাতাল হয়েছে। হরিজনদের তিনি সমানভাবে স্থান দিয়েছেন সর্বত্র। বলেছেন,—একই গাছে আলাদা আলাদা পাতা, কিন্তু তারা একই গাছের পাতা।

তাঁর নামে এক হরিজন স্কুলে এলাম। একশ' হরিজন ছাত্রছাত্রী পড়ে এখানে।

নারকেল এদেশে শুভচিহ্ন, কাঁদি সমেত নারকেল ঝুলিয়েছে ফটকের দুদিকে। নারকেলের ছড়া সাজিয়ে রেখেছে পাত্রে, স্কুলে ঢুকবার মুখে। মেয়েরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে অতিথি সংবর্ধনায়, হাতে তাদের থালাভরা চাল, চালের উপরে আধখানা নারকেল। নারকেলমালায় তেল-পলতে দিয়ে দীপ জ্বালা। ধান-গুচ্ছের মতো ঘন সবুজ রঙের সুপারির কচি ছড়াও রাখা আছে থালায় থালায়।

তারা গান গাইল, উলু দিল। তাদের মঙ্গলধ্বনি ও মঙ্গলচিহ্নে মন ভরে গেল।

ত্রিবান্দ্রামকে কেন্দ্র করে কাছাকাছি নানা গ্রামে আসছি, আবার ফিরে যাচ্ছি; এই চললো এ কয়দিন। এইবার ত্রিবান্দ্রাম ছাড়বার পালা।

ত্রিবান্দ্রাম হতে দশ মাইল দূরে 'কোবালাম্ বীচ্'। অতি সুন্দর বীচ্, এই

বীচ্ না দেখে কেউ ছাড়ে না ত্রিবান্দ্রাম।

কোবালাম্ বীচ—সমুদ্র এখানে খানিকটা এগিয়ে এসে অর্ধচন্দ্রাকারে তীর ছুঁয়ে আছে। ঢেউগুলিও আসছে তেমনিতরো অর্ধচন্দ্রাকারে, এসে তীরে ভেঙে পড়ছে রেখায় রেখা মিলিয়ে। অচঞ্চল ঢেউ। ধীরে—অতি ধীরে একটি ঢেউ এলো, ভেঙে পড়লো, পায়ের বালি ভিজিয়ে দিল। আবার একটি আসছে, এলো, পার ভিজিয়ে দিল। আবার একটি ঢেউ ঐ দূরে উঠল, দূর হতে অর্ধচন্দ্রাকারে ফুলে উঠল, মন্থর গতিতে এগোতে লাগলো। হুড়মুড় করে নয়। শান্ত পায়ে নীরবে এগিয়ে আসে, পায়ের কাছে এসে সাদা ফেনা ছড়িয়ে ভেঙে পড়ে। সেই তখনি একটু মৃদু গুঞ্জন তোলে। যেন প্রণামী মন্ত্র পড়ে একখানি কুন্দকলির শুভ্র মালা রেখে যায় ধরণীর পদপ্রান্তে।

কন্যাকুমারীকা

ভোরে রওনা হলাম। কন্যাকুমারিকায় যাবো। পথে পদ্মনাভম্‌পুর—ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ছিল আগে। রাজবাড়ী এখন শূন্য। দরজা খোলা, সবাই এসে ঢোকে, দেখে, এঘর ওঘর ঘুরে বেড়ায়। যে রাজ-অট্টালিকায় প্রবেশের অধিকার ছিল না জনতার, সেখানে আজ সকলের পদধূলি ওড়ে।

চীন দেশের বাড়ীর মতো আঙিনার পর আঙিনা। আঙিনা ঘিরে ঘর, তারপর আবার আঙিনা আবার ঘর। এর যেন শেষ নেই। লাল টালির চাল আঙিনা ঘিরে কেবলি যেন বাড়তে বাড়তে চলেছে। সামনে পিছনে ডাইনে বামে যেদিকে তাকানো যায়—যেন আরো আছে—এই ভাব। রাজবাড়ীর আড়ম্বর—ধনের জোর জনের জোর দুই-ই লাগে।

ঘরগুলি ছোট ছোট। বড় ঘরের তেমন রেওয়াজও নেই এদিকে।

রাজা ছিলেন সর্বজনপ্রিয়, থাকতেন সাদাসিধে ভাবে। বিলাস-ব্যসন এমনিতেই নেই কেরেলায়। রাজার ছবি আছে ঘরে,—পরনে কেরেলার চওড়া জরির পাড় ধুতি লুঙ্গির মতো করে, খালি গা';—এক বাঁধ তৈরীর কাজ চলছে, মিস্ত্রি মজুর কাজ করছে—রাজা দেখছেন দাঁড়িয়ে। মাথায় কেবল রাজছত্র ধরে আছে প্রহরী—এইটুকুই যা রাজার পরিচয়।

সুন্দরম্ এখানকারই লোক, বলে, রাজা নিজে দেখতেন সব কাজ এইভাবে। সকল কাজে যত্ন নিতেন।

কোচিন, ত্রিবাঙ্কুরের রাজারা পণ্ডিত ছিলেন, সদাশয় ছিলেন। সহজ জীবন-যাত্রা ছিল তাঁদের। বিলাতি বিলাস কিছু ছিল না। এখনো এদেশে নেই বললেই হয়। দেখে চোখে আরাম লাগে।

রাজারানীর থাকবার মহল সবচেয়ে উঁচু, তেতলা, চারতলা। অন্য মহলগুলি একতলা, দোতলা।

ঘর হতে ঘরে মেঝে ফুঁড়ে উঠতে হয়। মেঝেতে দরজা। কাঠের উঁচু ধাপের সিঁড়ি দরজার মুখে। দরজা মেঝেতে ফেলে দিলেই পথ বন্ধ উপর তলায় যাবার।

দোতলায় রাজার শোবার ঘর। ঘরে একটি কাঠের পালঙ্ক ছোট ছোট হরেক রকমের কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরী। রোগনাশক চৌষট্টিখানা ঔষধি কাঠের টুকরো এগুলি। রাজদেহে ব্যাধি না লাগে কোনো। এই ঘরের উপরে তেতলায় আর একখানি ঘর। ঘরে আর একখানি পালঙ্ক, এটি রাজার 'উপবাস গৃহ'। ব্রত উপবাসের দিন শুচিশুদ্ধ মন নিয়ে এঘরে কাটাতেন দিন। এর উপরে আর একটি ঘর, এঘরে পিতলে মোড়া পালঙ্ক। এটি প্রার্থনা ঘর—পুজা ঘর। এই পালংকে বিগ্রহ দেবতা থাকতেন। ঘরের দেয়ালে নানা দেবদেবীর দেয়ালচিত্র। একটি ঝোলা প্রদীপ এখনো জ্বলে এই শূন্য ঘরে।

রানীর মহল খালি।

রাজপ্রাসাদ—সব টালির ছাদ। সরু সরু বারান্দা, ছোট ছোট ঘর, নানা লেবেলের মেঝে, ধাপ ধাপ সিঁড়ি,—ঘুরে ঘুরে ধাঁধা লাগে।

এরি মধ্যে অপেক্ষাকৃত লম্বা ঘরে তোষাখানা, অস্ত্রাগার। নীচের তলায় পাথরের থামে ঘেরা নাচের আসর, রাজরানী অন্তঃপুরনারীদের জন্য পাশে ছোট্ট ছোট্ট ঘর কাঠের জাফ্‌রি দেওয়া।

হাজার ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে খাওয়াতেন রাজা। সেই ঘর প্রকাণ্ড।

আড়ম্বরবিহীন রাজপ্রাসাদ। কয়েকখানা পালঙ্ক, খানকয়েক ছবি, লাল টালির চাল, পাথরের থাম, কয়েকটি আলোকবাহিনীর প্রস্তরমূর্তি;—আর আছে লাল কালো পঙ্কের মেঝে, আয়নার মতো চকচক করছে আজও। পিছলে পড়ি ভয় জাগে মনে পা' ফেলতে গিয়ে।

পরিচ্ছন্ন সাদা মাটির অঙ্গন। প্রাসাদের দোর গোড়ায় জীর্ণ একটি চামেলী লতায় গোটা কয়েক কুঁড়ি, ফুল। ফুল কুঁড়ি দুই-ই তুলে নিই হাত বাড়িয়ে, রেখে দিই যত্নে। দিনের কুঁড়ি দিনশেষে আপনিই ফুটবে ঠিক সময়ে।

কেরেলা ছাড়িয়ে মাদ্রাজ প্রদেশে এলাম। কন্যাকুমারিকার কাছে 'শুচিন্দ্রম' মন্দির, মন্দিরের দেউড়ীতে এসে গাড়ী থামল।

কাহিনী আছে, পুরাকালে এখানে দেবী অনসূয়া এক বৃক্ষের তলায় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজনকে তিন শিশুরূপে দোলনায় দুলিয়েছিলেন।—এ এক আখ্যান। ইন্দ্র এই পবিত্র দৃশ্য একদিন দেখতে পান। তাঁর কলঙ্কিত দেহ শুচি হয়ে যায়। তাই এই মন্দিরের নাম হয়েছে 'শুচিন্দ্রম্'।

কালো পাথরের মন্দিরের মধ্যে যেন কালো পাথরের গাছ হয়ে মিশে আছে এক অতি পুরাতন গাছ। মন্দিরের মধ্যে গাছের গুঁড়ি, মন্দির ছাপিয়ে ঊর্ধ্বে তার ডাল।

পণ্ডিত বললেন,—এই সেই বৃক্ষ। এই মন্দিরে ব্রহ্মা, শিব আলাদা মন্দিরে, মাথায় সোনার ষোল শশিকলা, সাপের ফণা। বিষ্ণু সারা অঙ্গে চন্দন মেখে রঙ বদলে জমজমাট। তারও মন্দির আলাদা। এই একই শুচিন্দ্রম্ মন্দিরে ছড়িয়ে আছে তিন দেবতার মন্দির।

পাথরের থাম, পাথরের করিডোর, পাথরের উঠোন, পাথরের মণ্ডপ, পাথরের মূর্তি; এক একজনের মন্দির নিয়ে যেন এক একটা তল্লাট। পণ্ডিতের সঙ্গে ছুটে ছুটে ঘুরছি।

দু'কোণে 'মিউজিক্যাল থাম', একটা পাথর হতে বত্রিশটা থাম কাটা। পণ্ডিত তা'তে থাবড়ে থাবড়ে বাজিয়ে সেতার শুনিয়ে দিলেন।

এক জায়গায় পাথরের এক বিরাট হনুমানজী করজোড়ে দাঁড়িয়ে। আঠারো ফুট লম্বা, তেমনি বিশাল দেহ। মন্দিরে ঢুকবার মুখে দেউড়িতে এক দোকানী

এসে দ্যুটো গোলাপজলের বোতল আমার হাতে ধরিয়ে দিল। বলল—এই গোলাপজল লাগবে মন্দিরে। নিয়ম।

পণ্ডিত আমার হাত হতে বোতল দ্যুটো নিয়ে হনুমানজীর পাশে রাখা মই বেয়ে উঠে গোলাপজলটা হনুমানজীর মাথায় ঢেলে দিলেন। গোলাপজল হনুমানের করজোড় করা বাহুর কনুই বেয়ে ঝরে পড়ল। পণ্ডিত সেই জল হাতে নিয়ে আমার মাথায় দিলেন, নিজের মাথায় দিলেন। আশীর্বাদী জল।

ফিরে আবার আসি বিষ্ণু মন্দিরে আর একবার দেখতে। মন্দিরে দূরে বিষ্ণু বরাবর গরুড় দাঁড়িয়ে। গরুড়ের একপাশে রাজারানী—যে রাজা করেছেন এই মন্দির, অন্য পাশে রাজভ্রাতা; কালো পাথরের মানুষ-প্রমাণ এক নিকষকালো মূর্তি। টানা চক্ষু, তীক্ষ্ন নাসিকা, বিস্তৃত বক্ষ, সিংহকটি কোমর,—ঠোঁটে কানে কপালে হাতে, ভঙ্গীতে ভাবে কোথাও একটু খুঁত নেই শিল্পে। তেল চকচকে অঙ্গ, মন্দিরের প্রদীপশিখার আলো পড়েছে বক্ষে চিবুকে, পড়েছে কপালে নাসিকাগ্রে। অপরূপ—অপরূপ।

শিল্পীর আরো বিশেষ চাতুর্য দেখাতে পণ্ডিত একটা লিকলিকে নারকেল কাঠি হাতে নিয়ে বললেন,—'এই দেখ',—বলে কাঠিটা রাজভ্রাতার এক কানে ঢুকিয়ে দিলেন, আর এক কান দিয়ে কাঠিটা বেরিয়ে পড়লো। ডান নাসারন্ধ্রে দিলেন—বাঁ কান দিয়ে বের হ'ল; বাঁ নাসারন্ধ্রে দিলেন—ডান কান দিয়ে বের হ'ল।

আমার দু'কানের ভিতর সুড়সুড় করে উঠল, আঙ্গুল দিয়ে কান নাড়া দিলাম।

কন্যাকুমারিকায় এলাম।

তিনদিক হতে তিন সাগর এসে মিলেছে এখানে। অঞ্জলিবন্ধ করপ্রান্তের মতো ভারতের মাটি এই দক্ষিণ দিকে এসে শেষ হয়েছে সাগরজল ছুঁয়ে। এই সাগর-সঙ্গমের মুখে কন্যাকুমারী,—চিরকুমারী হাতে মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

কন্যাকুমারীর মন্দির; সন্ধ্যারতির দীপ জ্বললো মন্দিরে। ছোট গর্ভগৃহ, দ্বারে দ্বারে দ্বার ঘিরে শিকলের ঝোলানো প্রদীপের মালা; গর্ভগৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপ। সেই আলোয় জ্বলে উঠল কন্যাকুমারীর মাথার পিছনের স্ফটিক পদ্ম; জ্বলে উঠল তার নাকে হীরের নোলক নাকছাবি—আগুনের দুই টুকরো হয়ে।

কালো পাথরের মূর্তি, চন্দনে চন্দনে গোরচনা গৌরী। ছোট মেয়েটি, কনের বেশে মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে—মহাদেব আসবেন, মালাটি তাঁর গলায় পরিয়ে দেবে। হাসি-হাসি মুখ।

বড়দি বলেছিলেন কাহিনী,—বিবাহলগ্ন উপস্থিত। বর আসবেন। বালিকা গৌরী কনের সাজে মালা হাতে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছেন এসে। ওদিকে দেবতারা দেখলেন সমূহবিপদ। মহাদেবকে তখন তাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। এখন যদি বিয়ে করেন মহাদেব তবে গৌরীকে নিয়ে কিছুকাল তো ভুলে থাকবেন সব।

ছল করে দেবতারা মহাদেবকে আটকে রাখলেন। লগ্নের সময় বয়ে গেল। কন্যা কুমারী রয়ে গেলেন। তাই কন্যাকুমারী নাম গৌরীর এই রূপের।

কিন্তু মহাকালের লগ্ন বয়ে যাবার নয়। তিনি আসছেন, চিরকাল ধরে তিনি আসছেন। চিরকাল ধরে গৌরী অপেক্ষা করছেন। তাই এ হাতের মালা শুকোয় না কখনো। হাসি মিলায় না।

যারা আসে সবাই একটি করে মালা দিয়ে যায় কন্যাকুমারীর হাতে। আমার কুন্দ কনকাম্বরের মালাখানিও মিলিয়ে দিলাম তার হাতের মালার সাথে—মহা-

কালের গলায় দিতে।

শ্নেছি জলদস্যুরা একবার এসেছিল কন্যার লোভে, পারেনি নিতে। সেই হতে কুমারীকন্যার দ্বারে আরো তালা পড়ে, চারিধারের পাথরের প্রাচীর আরো উঁচু হয়, আরো সতর্ক পাহারা দেয় পূজারী—প্রহরীরা।

কন্যাকুমারীর মন্দিরের কাছে 'বিবেকানন্দ পাহাড়'; তীর হতে একটু দূরে জলের মধ্যে জেগে থাকা একটি ছোট পাহাড়। ভাঁটার সময়ে লোকে সাঁতরে যায়, জোয়ারে এটুকু পথেই এলোমেলো ঢেউ, ভয় পায়।

বিবেকানন্দ এই পাহাড়ে বসে ধ্যান করতেন, করে তৃপ্ত হতেন—খুশী হতেন। এই পাহাড়ে সেই স্মৃতিতে মন্দির হবে একটি। তীরে বালুরাশির উপরে বড় বড় চালার নীচে দলে দলে শিল্পী বসে গেছে পাথরের থাম কাটতে, ছাদ কাটতে, থামের গায়ে নক্সা খুঁড়তে।

লোহার বাটালী ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয়ে যায় পাথরে গড়ন কাটতে। এক চালায় লম্বা কামারশালা, উনুনে উনুনে আগুন। লোহার বাটালী গরম হচ্ছে, লাল লোহা পিটিয়ে ঘষে আবার তাতে ধার আনছে।

নারীপুরুষ ছেলেমেয়ে মিলে মস্ত এক ভীড় লেগে গেছে এই কাজে। চারদিকে পাথরের ধুলো উড়ছে, পাথর খুদে নারকেলের ছোবড়া দিয়ে গুঁড়ো সরিয়ে ফেলছে গা' হতে—সেই ধুলো। একমনে কাজ করে চলেছে শিল্পী;—লতা, হাতীর সারি, পদ্ম ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে পাথরের গায়ে। মন্দিরের সব পাথর আলাদা আলাদা কাটা, খোদাই হয়ে তৈরী হয়ে পাহাড়ের উপরে যে যার জায়গা নিয়ে বসবে. একটি পূর্ণ মন্দির হবে। সেদিনের সেই আগমনীর সুর এখানে।

এইভাবেই এই সমারোহেই সব মন্দির উঠেছে ভারতে। এই কলরব, আয়োজন, ব্যস্ততা, আগ্রহ সব স্তব্ধ হয়ে যায় দেবতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। তখন শুধু এক ঘণ্টাধ্বনি একটিই শব্দ তোলে কেবল।

সমুদ্রের তীরে কোথাও লাল বালি, কোথাও কালো বালি, কোথাও গোবিন্দভোগ চালের মতো বালি। বড়দি বলেছিলেন,—মনের দুঃখে গৌরীর বিয়ের ভোজ্য দ্রব্য তখন সব সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলিই লাল কালো সাদা রঙের বালি হয়ে আছে। সমুদ্র কি পারে হজম করতে, তীরে এনে তুলে তুলে রাখছে সেই রান্নাকরা চাল-ডালের সকল দানা।

তীর্থযাত্রীর ভীড় সমুদ্রের তীরে। সবাই এই বালি নিয়ে যায়, দেশে প্রিয়-পরিজনদের দেখায়। গান্ধীঘাটের কাছে একদল দক্ষিণী মহিলা থলি ভরে ভরে বালি নিচ্ছে, জলের কাছে ভিজে যাওয়া চকচকে রঙীন বালি, ভাবি, এত বালি দিয়ে কি করবে এরা? নমুনার জন্য কতটুকু আর লাগে?

এক মহিলা হেসে বললেন, সোনার অলঙ্কার পরিষ্কার করতে এ বালি খুব ভালো।

সমুদ্রতীরে একেবারে জলের উপরে গান্ধীঘাট—মন্দির একটি গান্ধীর নামে। স্থপতির স্থাপত্য—ছাদে এক স্থানে একটি ছিদ্র, দোসরা অক্টোবর গান্ধীর জন্মলগ্নে সূর্য সেই সময়ে ঠিক এইখানিতে এসে সোজা আলো ফেলে নীচে,—এই ছিদ্রপথ দিয়ে।

হাওয়ার বিরতি নেই কন্যাকুমারিকায়। কখনো হাওয়া বয় বঙ্গোপসাগর হতে, কখনো হাওয়া বয় আরব সাগর হতে, কখনো হাওয়া বয় ভারত মহাসাগর হতে।

ঠাঁই বদলাতে হয় না। এই সমুদ্রতীরে যে কোনো এক জায়গায় বসেই দেখা

যায় পশ্চিম আকাশে সমুদ্রের জলে ঐ সূর্য ডুবল, পূবের আকাশে জল থেকে ঐ চাঁদ উঠল।

....

(পেরিয়ার বাঁধ)

....

চলতে চলতে দেখা, দু' চোখ দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলা,—এইটুকু যা জানাজানি। এই জানাজানির ভালো-লাগাটুকুই আমার ডালায় তুলে নিয়ে চলেছি।

কেরেলার মেয়েরা সকলেই কেশবতী, কিন্তু কেশের বিন্যাস নেই এদের। তেল-চুকচুকে কালো চুলের রাশি পিঠ ছাপিয়ে পড়ে থাকে। কেউবা একটি বিনুনী ঝুলিয়ে রাখে, কেউ হাতে জড়িয়ে শক্ত একটা খোঁপা বাঁধে। দিনশেষে বসে আয়না সামনে রেখে সিঁথির দু'পাশে চুলের ঢেউ খেলিয়ে পরিপাটি করে বিনুনী করে সোনার ফুলে রুপোর ফুলে সাজিয়ে কেউ বাঁধে না কবরী নিত্য নতুন ছাঁদে, নিত্য নতুন নামে।

পথে একদল বালিকা, বোধহয় মন্দির হতে এলো, মাথার উপরে প্রসাদী পুষ্পমালা জড়িয়ে রেখেছে লক্ষ্ণৌর সাদা চিকণের টুপীর মতো। লম্বা ঘাগ্‌রা আর কোমর অবধি কাঁচুলি ব্লাউজ বালিকাদের পরনে।

মাদ্রাজের ওদিকের মেয়েদের মতো কেরেলার রমণীদের খোঁপায় ফুলের মালা পরবার রেওয়াজ নেই। প্রসাদী ফুল মাথার উপরেই রাখে বেশীর ভাগ।

বড় মেয়েদের হাত প্রায়ই খালি। গলায় একটি শুধু সোনার সরু হার। কানে সোনার ফুল;—পুরাতনীদের কান ঝোলা—ভারী গহণার ভারে।

আর কয়েক বছর আগেও কেরেলার মেয়েরা দেহের উপরোর্ধ্বে পরতো না কিছু। একখানি সাদা লুঙ্গি ও গামছার মতো একটি সাদা চাদর কাঁধে ফেলা—এই ছিল তাদের সাজ। দেহ সম্বন্ধে উদাসীন ছিল নারীরা। এখন একটা করে সাদা ব্লাউজ গায়ে দিচ্ছে সকলে। আইন করে এর চালু করা হয়েছে।

'কোট্টাইয়াম' হতে প্রায় সত্তর মাইল দূরে 'পেরিয়ার বাঁধ'।

পথে এক বেসিক স্কুল; ছোট ছোট বালকরা—পাঁচ-ছয় বছর হতে আট-নয় বছরের ছাত্র সব। দু'বছর এখানে পড়বে, পরে উঁচু স্কুলে যাবে। আবার এদের জায়গায় ত্রিশটি নতুন ছাত্র আসবে। 'অ, আ' হতে সুরু করে, দু'বছরে গড়গড় করে ছোট হরফের ছাপানো কাহিনী পড়ে যায়। হাতের লেখা খাতার টানা লাইনের এদিক ওদিক হয়নি কারুর। যত্নে লেখাপড়া শেখান শিক্ষক।

এরা আদিবাসী, এরা হরিজন সন্তান।—কি খেতে ভালোবাসে?

বললে—'পিল্লাই'। মানে—দুধ।

দুধ মিষ্টি খাবার জন্য টাকা দেওয়া হল।

বেতের এক একটা ছোট চৌকো ঝুড়িই এদের বাক্স। নিজ নিজ কাপড় ও জামাখানি রাখে তাতে। একটি মাদুর বিছিয়ে শোয়। ক্লাশ শেষ হল, ছেলেরা সবাই রান্নাঘরে যে যার থালা নিয়ে বসলো, টেপিওকা খাবে—বিকেলের জলখাবার।

পাহাড়ী এলাকা; ছোট ছোট পাহাড়। সবচেয়ে উঁচু যদি হয় তো চার হাজার

ফুট হবে। সবুজ পাহাড়। কোথাও রবার, ইউকেলিপটাস, কোথাও চায়ের ঘন সবুজ ঝোপ এ-পাহাড় হতে নেমে উঠে গেছে ও-পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত। এলাম পেরিয়ার ফরেষ্ট রেষ্ট-হাউসে। এখান হতে মোটর বোটে আরো আড়াই মাইল গিয়ে এলাম বাঁধের মাঝে, দ্বীপের উপরে, অরণ্যের ভিতরে 'অরণ্য নিবাস'-এ।

পেরিয়ার নদীতে বাঁধ দিয়ে লেক তৈরী হয়েছে,—প্রকান্ড লেক। নদীর জল পথ না পেয়ে থিতিয়ে আছে মাইল মাইল জায়গা জুড়ে। অরণ্যে ভরা পাহাড়গুলি আলাদা আলাদা দ্বীপ হয়ে জাগছে লেকের জলে। কতশত বনস্পতি ডুবেছে জলের তলায়, তাদের সেই শত শত কান্ড ভগ্নস্তূপের থামের মতো মাথা তুলে আছে এধারে ওধারে জলের উপরে। যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের মহলগুলির নিশানা দিচ্ছে।

অরণ্য নিবাসের বাড়ীটার চারিদিকে খাদ কাটা, বুনো হাতী আটকাবার জন্য। খাদের কাছে সিঁড়ির মুখে হাতী এসে ঘুরে গেছে গতরাত্রেও, চিহ্ন রেখে গেছে। হাতীর জন্যই সাবধানে থাকতে হয় এ অরণ্যে।

অরণ্যরক্ষী বলে, কয়দিন হ'ল একটা গুন্ডা হাতী কেবলি ঘুরে বেড়াচ্ছে একা একা এ-পাহাড়ে সে-পাহাড়ে।

হাতীরা দল বেঁধে থাকে, একা থাকে না। যে একা থাকে সে তার ক্ষ্যাপামির দোষেই থাকে। একক হাতী দেখলেই তাই ভয় পায় লোকে। কোনদিক দিয়ে কখন এসে দলেমলে দিয়ে যাবে ঠিক কি তার!

দেহ বড় ক্লান্ত অনবরত ঘোরাঘুরিতে। বিশ্রাম নিতে খাবার পর দুপুরে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখা যায় ফুলভরা শিমুলগাছের ডাল একটা।

সবুজের দেশ, অন্য রং নজরে পড়ে না। ফুল খুব কম। পেরিয়ারে আসতে পাহাড়ে উঠে পেলাম সূর্যমুখী ফুলের মতো হলুদ ফুলের ঝোপ, শিমুল কয়েকটা। পেরিয়ারের অরণ্যনিবাসে এসে পেলাম কিছু শীতের দেশের মরসুমী ফুল, আর গাছে গাছে আগুন ধরে আছে টুকটুকে লাল 'স্পেথোডিয়া'।

সখ করে করেছে বাগান এই পাহাড়ে, সখ করে করা এই অরণ্যনিবাস। যে আসবে চতুর্দিকে খাদ কাটা নিবাসে আরাম করে নিশ্চিন্তে বসে—বনের পশু বনে ঘুরবে—এরা দেখবে।

'হাতী হাতী' বলে চেঁচিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল চৌকিদার। উঠে বাইরে এলাম।

পাশের পাহাড়ে জলের ধারে একদল হাতী বেরিয়ে আসছে বন হতে। এক দুই করে গুনতে গুনতে ষোলটা হাতী খোলা জায়গায় রোদে এসে দাঁড়াল। তিনটি হাতীর সঙ্গে তিনটি শিশু হাতী। একটি অতিশয় শিশু, কেবলি মা'র পেটের তলায় লুকিয়ে থাকছে।

হাতীরা যেন হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। কাছাকাছিই পা' তুলে পা ফেলে একটু আগুপিছু করলো, বসলো, দু'কান ঝাপটিয়ে হাওয়া খেল, ঘুরল ফিরল;—ধীরে ধীরে পাহাড়ের ওধারের ঢালুতে গিয়ে জটলা করল।

বাঁধে মোটর লঞ্চ আছে, নৌকো আছে। দর্শকরা আসে। নৌকো করে, লঞ্চ করে বাঁধ ঘুরে বেড়ায়। দ্বীপে দ্বীপে জন্তুজানোয়ার চলে ফেরে, নৌকোয় বসেই দেখে তাদের।

লঞ্চের ছাদের উপরে চেয়ার পেতে বসেছি। আকাশ জল পাহাড়, কোনাটাতে আর আড়াল নেই। জলের উপরে গাছে ভরা পাহাড়, ঘাসে ভরা পাহাড়: আবার

শুধুই পাহাড়—যেন শেওলায় ঢাকা বিরাট আকারের কাছিম এক একটি। এইসব পাহাড়গুলিতে আছে বাইসন, সম্বর, হাতী, হরিণ, বাঘ, কুকুর, বুনো শুয়োর।

দৃষ্টি প্রখর করে আছি, কিছুই দেখি না। পাহাড়ের পর পাহাড় ছাড়িয়ে চলেছি। একটি মাত্র নিরীহ সম্বর দেখলাম, দাঁড়িয়েছিল শিং ছড়িয়ে; ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আর বেশী দূর যাওয়া বিপজ্জনক। অরণ্যরক্ষী স্টিম লঞ্চ ঘোরাবার অনুমতি চাইল।

হঠাৎ আবার 'হাতী-হাতী' রব উঠল। দেখি একটা বড় হাতী জলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে।

এখানকার লোকেরা যারা লঞ্চ নৌকো চালায়, তারা বনের পশুর খবর রাখে। বলল,—এই সেই পাগলা হাতীটা।

—কিন্তু এখানে সে করছে কি?

তারা বলল,—ও সাঁতরে ওপার হবে। 'রাখো রাখো, লঞ্চ থামিয়ে দাও, দেখতে দাও হাতীর সাঁতার'—বলতে বলতেই দেখি হাতীটা জলের ধারে এসে পা' দিয়ে মাটিটা চেপে চেপে দেখছে, দেখে এগিয়ে এসে জলে গা' ডুবিয়ে দিল। হাতী সাঁতার কাটতে লাগল।

এতখানি দেহ সবটা জলের নীচে। কেবল জলে ভেজা কালো কপালটুকু ভেসে রইল জলের উপরে আর শুঁড়ের ডগাটুকু। হাতী সাঁতার কাটছে, এগিয়ে চলছে। যে পাহাড়ের দিকে হাতী সাঁতরে উঠবে মনে হচ্ছে, লঞ্চ আস্তে আস্তে এগিয়ে সেই পাহাড়ের কাছাকাছি এসে থেমে রইল।

সবই দেখতে পাচ্ছি উপরে বসে। হাতীর কপাল এক একবার করে ডুবছে, যেন ডুব সাঁতার দিয়ে নিল একটু। শুঁড়ও তলিয়ে যাচ্ছে,—আবার সাপের ফনার মতো জেগে উঠছে জলে। জল কেটে কেটে চলেছে হাতি। জলের উপরে রেখা ফেলে।

এপারের পাহাড়ে ছিল একদল হাতী জলের কাছাকাছি। চারটে বড় হাতী, সংগে তাদের চার শিশু। শিশুরা শুঁড় দিয়ে কচি ঘাস উপড়ে খাচ্ছে; ঘাসের গোড়ায় মাটি উঠছে, ঘাস উল্টেপাল্টে ঝেড়ে নিচ্ছে। একটি বাচ্চা হাতী আবার ডান পা তুলে পায়ের নখের উপর ঘাসের গোছা আছড়ে নিল মা'র দেখাদেখি।

যেন সার্কাসের তৈরী হাতী, খেলা দেখাচ্ছে সামনে দাঁড়িয়ে। সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটা মা'র পেটের তলায় ঢুকে লম্বা শুঁড়টা উল্টে দুধ খেয়ে নিল খানিক।

ওদিকে গুণ্ডা হাতী মাঝামাঝি পথে।

এপারের হাতীরা বোধহয় বুঝতে পারল কিছু, মা হাতীগুলি এগিয়ে এসে সারি দিয়ে দাঁড়াল। বাচ্চাগুলি মা'দের গা' ঘেঁষে রইল। যেন ওরা অপেক্ষা করছে এমনি ভঙ্গী। টের পেয়েছে হাতীটার আসার।

কুড়ি মিনিট লাগল গুণ্ডা হাতীর জল পেরিয়ে আসতে। প্রায় দু' ফার্লং পথ। পারে এসে জলের নীচে পায়ে মাটি ঠেকতেই হাতীটা বসে পড়ল। বড় ক্লান্ত হয়েছে সে। এতখানি দেহ নিয়ে এতটা পথ সাঁতরে আসা কম কথা নয়। শুঁড়ে জল ভরে মুখে পুরে পুরে কয়েকবার জল খেল। তারপর জল হ'তে উঠল। এক-পা দু-পা করে ধীরে ধীরে থেমে থেমে এগুল। হাতীটা দলের কাছাকাছি হলে, দল হতে একটি হাতী এগিয়ে এলো। ক্ষেপা হাতী শুঁড় বুলিয়ে দিল হাতীটার গায়ে। কি কথা হল তাদের কি জানি, অন্য একটা হাতীও এগিয়ে

এলো। ক্ষেপা হাতী এর গায়েও শুঁড় বুলিয়ে দিল। পরে অন্য দুটো হাতীও এলো, মা'দের পায়ে পায়ে বাচ্চারাও এলো। ক্ষেপা হাতী ছোট বড় সবার গা-ই শুঁড় দিয়ে ছুঁয়ে দিল। হাতীরাও শুঁড় তুলল, শব্দ করল। যেন সবার সঙ্গে পরিচয় জানাজানি হল।

—কই, লড়াই তো করল না ক্ষেপা হাতী কারো সঙ্গে?

অরণ্যরক্ষী বলল, অন্য পুরুষ হাতী কাছে নেই, তাহলে ভীষণ কাণ্ড হ'ত।

আর দেরী করা চলে না। হাতীর সাঁতার দেখেছি, মন খুসী, এবারে ফেরা যাক। যাবার আগে আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি। ভিজে গায়ের ধূসর কালো ক্ষেপা হাতীটা এবারে হাতীদের পিছন দিকে রেখে ঘুরে দাঁড়াল—যেন এবারে চলতে সুরু করবে। তাই করল; একাকী মন্থরগতিতে টলতে টলতে ঘন বনের দিকে চলতে লাগলো।

অরণ্যনিবাসে ফিরে চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করি—সেই যে দুপুরবেলা হাতীর দল বেরিয়েছিল তারা কতক্ষণ ছিল ওখানে?

পাহাড়টার পাশেই আর একটা পাহাড়, মাঝখানে অল্প একটু জলপথ। চৌকিদার সেই দিকটা দেখিয়ে বলল—কিছু আগে হাতীর দল ঐ পাহাড়টাতে চলে গেল।

—সেই শিশু হাতীটা কি করে সাঁতরে গেল?

চৌকিদার স্নেহমাখানো হাসি হেসে বলল,—মা, তা' যদি দেখতেন! সকলের দেখাদেখি সেও তো জলে নামল, সাঁতার তো ভালো জানে না। ওর মা পিছন হতে শুঁড় দিয়ে ঠেলে ঠেলে তাকে ওপারে নিয়ে তুলল। চৌকিদার আরো বলল, হাতীর মা'র শিশুকে সাঁতার শেখানো—এ দেখতে বড় মজার। গরমের দিনে এই পাশের জল প্রায় শুকিয়ে যায়, হাতী তার বাচ্চা নিয়ে হাঁটুজলে নামে, বাচ্চাকে নামায়। তারপর শুঁড় দিয়ে তাকে উল্টেপাল্টে সাঁতার শেখায়। বড় সুন্দর লাগে দেখতে তখন। গরমের সময়ে পাহাড়ের এই যে লম্বা ঘাস, এ একটিও থাকে না, সব মরে যায়। তখন কেবল জলের ধারে ধারে ঘাস খেয়ে বেড়ায় হাতীরা। সে সময়ে হাতীর স্নান, হাতীর সাঁতার খুব দেখা যায়। জলের কাছাকাছি থাকে সর্বক্ষণ।

খোলা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছি। জল, জলে বনের ছায়া, সব মিলিয়ে এলো। বনের রাত, অল্পেতেই মনে হয় গভীর রাত।

মশা ছেঁকে ধরেছে অনেকদিন পরে। পাহাড়ী জায়গা, শীতও কিছুটা। উঠে ঘরে এলাম। বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। বাতি জ্বলছে ঘরে। ঘরের আলো বাইরের পতঙ্গ টেনে আনছে ভিতরে। নিস্তব্ধ রাত্রি। পতঙ্গের সূক্ষ্ম ডানায় যেন সাগরের তোলপাড়। বাতি নিবিয়ে দিলাম।

মুন্নার যাবো, ভোর ভোর রওনা হতে হবে। পায়ে পায়ে বন পার হচ্ছি। পথে নেমে মোটরে উঠব।

পাতাবিহীন একটা গাছের মগডালে একটা যেন কালো হাঁড়ি বসানো। অত উঁচুতে ওটা কিসের হাঁড়ি? দেখি একটা কালো হনুমান দু' হাঁটুতে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে বসে। লম্বা লেজটা সোজা ঝুলছে দু'হাত।

দিনভরই আজ চলতি পথে থাকতে হবে। এবারে দেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে ফিরছি। তবুও কতটুকু আর দেখতে পারছি, কতটুকুই বা জানতে পারছি।

'এডাপ্পালায়াম্—অরণ্যনিবাস' হতে মাইল পাঁচেক দূরে 'কুমুলি'। অনেক আদিবাসী বাড়ী বানিয়ে বসেছে এখানে। চাষের জমি পেয়েছে। ছেলেরা লেখাপড়া শিখছে।

ছোটদের বোর্ডিং স্কুল আছে একটা এখানে। এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করে যাবে দূরের হাইস্কুলে। আদিবাসী মেয়েদের হোস্টেলও আছে একটা, কস্তুরবা সমিতি থেকে করা। কার্তিয়ানী, সবোজাম্মা এরা দু'জন ক্লাশ নাইনে পড়ে, এখান হতে দু'মাইল দূরের স্কুলে যায় রোজ হেঁটে।

মাটির মেঝে, বাঁশের বেড়া, পাতার চালের হোস্টেল ঘর। নিজেরাই রাঁধে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘর লেপে; পরে বইখাতা নিয়ে পড়তে চলে। প্রদীপের আলোতে পড়ে, মাদুর বিছিয়ে ঘুমোয়। দিনের কোনো অংশ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিলাসব্যসনে ব্যয়িত হয় না। যে মাটির সন্তান, সেই মাটির সঙ্গে মিলেমিশে থাকার শিক্ষাই যেন গোটা কেরেলার শিক্ষা। হরিজন, আদিবাসী বলে আলাদা কিছু নয়।

আদিবাসী নেতা রূপোবাঁধানো 'এগোনী'র এক ছড়ি হাতে এগিয়ে এলো; নেতা বলে রাজার স্বীকৃতিস্বরূপ 'এমব্ল্যাম' দেওয়া,—রাজার কাছ হতে পাওয়া। রাজপুরস্কার এ ছড়ি। এগোনীর কালো কাঠ চিকচিক করছে নেতার দেহের মতোই।

নেতা জেদ ধরল তাঁর গাঁয়ে নিয়ে যাবে আমাদের।

উঁচুনীচু পাথর, মাটি, ঘাসের উপর দিয়ে পায়ে-চলা-পথ। সরু পথ। পাশাপাশি হাঁটা চলে না, পর পর চলতে হয় পথে। অনেকখানি পথ, দুপুরবেলা,—ভয় পাই সে পথে জঙ্গলে ঢুকতে। একবার ঢুকলে কখন বেরিয়ে আসতে পারব তার ঠিক কি? এতখানি পথ যেতেই তো অনেকটা সময় লাগবে। তারপর গিয়েই কি আর ফিরে আসা যায় দু' দণ্ড তাদের দাওয়ায় না বসে? আজ আবার যেতে হবে আমাদের আরো সত্তর মাইল দূরে। সময় বেশী নেই হাতে।

নেতার সঙ্গে রফা হয় স্বামীর, মাঝপথ পর্যন্ত গিয়ে প্রথম যে আদিবাসীর গ্রামটা পাবো, সেটা দেখেই ফিরবো।

চললাম। নেতা আগে আগে, আমরা পর পর। কিছু পোড়াপাতা ও ছাই পথের ধারে পড়ে আছে। নেতা বলল, ক'দিন আগে একটা পাগলা হাতী এসেছিল বন হতে। ঘরের লোকেরা ঘরে আগুন ধরিয়ে ছুটে পালায়। হাতী জঙ্গল দুমড়ে ধানক্ষেত দলে চলে যায়।

এখনো রয়েছে হাতীর পায়ে থেঁতলানো ঘাসগুলি মাটির গায়ে চেপটে। ও আর উঠবে না কখনো। নতুনরা আসবে।

এই আদিবাসীদের ঘর বেশ বড়। ভিত গাঁথা নয়; ভূমির উপরেই আড়ে-বহরে বড় একটা দোচালা ঘর বাঁশের বেড়া দেওয়া। ঘরের ভিতরে বেড়া দিয়ে দিয়ে পার্টিশনের মতো করা। সেগুলিকে যদি ঘর বলি, তবে একটা দোচালার মধ্যে ঐরকম চারখানা পাঁচখানা ঘর। একটা ঘরে কিছু কাঠ রাখা, একটা ঘরে মাচা—মাচার নীচে আগুন—মাচার উপরে ধান শুকোচ্ছে আগুনের তাপে। আর ঘরগুলি খালিই সব, কোণায় একটা দুটো হাঁড়ি। তবু, এত বড় ঘরের প্রয়োজন বোধহয় আপন আপন সংসার রক্ষা করতে। বেড়া ঘেরা সীমানাখানিই এদের ঘর, মাঠ, দাওয়া আঙিনা সব।

ছোট ছোট পাহাড়ে ভরা দেশ কেরেলা। একটু উঁচুনীচু ঢেউ তোলা তোলা পথ, যেন অভিমানে ফুলে ওঠা ছোট্ট আদুরে মেয়েটির ঠোঁট। এতে আরো সুন্দর লাগে দেশ।

মসৃণ সবুজে ভরা পাহাড়;—ভরা নদীতে দুলে ওঠা তরঙ্গের মালা। এ তরঙ্গ সাগরের তরঙ্গ নয়, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়বে সে ভয় নেই। পাহাড়ের উপর দিয়ে পথ। ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন দুলে দুলে চলেছি। পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে চলেছে মোটর,—তর্জন-গর্জন কিছু নেই তার।

পাহাড়ে বনের বৃক্ষছায়ায় ছোট এলাচির বন। এদিকটায় টোপিওকা ধানক্ষেত নেই, কেবল ছোট এলাচি আর চা।

এখানকার ঘরের চাল শুকনো ঘাসে ছাওয়া। গরু চরে পাহাড়ে। লম্বা কাঁচ ঘাস যেখানে সেখানে। দু'পাশে বহু বাঁশ ঝাড়। বাড়ী, চাটাই, ঝুড়ি—সবই বাঁশের এখানে। বাঁশপাতা খেতে বনের হাতী আসে প্রায়ই। হাতী রুষ্ট না হলে আঘাত করে না কাউকে।

পথে স্পেথোডিয়া রডোডেনড্রনের মতো আলো করেছে পথ। বহু রঙের বনফুলে পাথরের গা ছাওয়া। 'সিলভার ওক'-এর পাতা হাওয়ায় উল্টেপাল্টে রুপোলী চমক লাগায়। পাহাড়ের চূড়ায় রোদ্দুর উঁকি মারে।

আকাশ আজ অপরাজিতা-নীল। যুঁই-সাদা মেঘ ভেসে চলেছে থরে থরে। মুন্নার বড় সুন্দর।

মুন্নার একটি পাহাড়ী তল্লাট। অল্প কিছু বন বনস্পতি, বাকী সব চা। নিষ্কলুষ সবুজ। কয়েকটি পাহাড় মিলে একটি ছবি।

চা বাগান নিয়ে বিদেশীরাই থাকতো এখানে। থাকতো নির্বাসিত হয়ে কিন্তু নিজ দেশের পরিবেশ টেনে আনতে জানতো সুদূর প্রবাসে।

মুন্নারে 'মধুপাটি' বাঁধের জলের তোড়ে হাইড্রোইলেকট্রিক-এ আলো পায় গোটা কেরেলা। এ বছর সর্বত্র বর্ষা কম হয়েছে, বছরে যা বৃষ্টি হয় তার অর্ধেক হয়নি এবারে। বাঁধের জল কমে গেছে অনেকখানি। পেরিয়ার বাঁধেও দেখে এলাম কুড়ি হাত জল কম।

ঘরে পথে আলোর তেজ কমে যাচ্ছে। তিনটির জায়গায় একটি বাতি জ্বালায় লোকে। পাখা বন্ধ, ঠান্ডাঘরের মেশিন বন্ধ। ভাবছে সবাই, চাষের অবস্থা এবারে কি হবে ক্ষেতে ক্ষেতে?

বহু গ্রাম সহর পেরিয়ে 'ভাইকম্' আসি। এখানে সেই প্রসিদ্ধ পুরাতন শিব মন্দির। এই মন্দির শঙ্করাচার্য স্থাপন করেছিলেন। এই মন্দিরেই সেই বিখ্যাত

সত্যাগ্রহ হয়েছিল উনিশ-বাইশ সালে। হরিজনদের ঢুকতে দিতে হবে মন্দিরে, দেবদাসী প্রথা তুলে দিতে হবে। গান্ধীজীর এক ভক্ত এই সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব করেছিলেন। কাগজে কাগজে তখনকার দিনে এই সত্যাগ্রহ নিয়ে কত আন্দোলন!

সমুদ্রের ধারে ভাইকম সহর। অনেকখানি চত্বর নিয়ে মন্দির। বালির প্রাঙ্গণে পাথরে বাঁধানো পথ চারদিক ঘিরে, তার মাঝখানে মন্দির। মন্দিরের চাল শোলার মুকুটের মতো বৃহৎ একটি লাল রঙের চূড়া। মন্দিরের বাইরের দেয়াল ঘিরে নানা দেবদেবীর নানা কাহিনীর রঙীন ছবি আঁকা। মন্দিরের সামনে সোনার স্তম্ভ, চূড়ায় সোনার কলসী। ভিতরে শিবঠাকুর, শিরে সোনার চাঁদ, কপালে সোনার ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় ফুলের মালা।

দীপস্তম্ভ, প্রদীপবৃক্ষ, শিঙ্গা, কাঁসর সব সজাগ; আরতির সময় এখন।

'আরণাকুলামে' এলাম। কোচিন লেকের মাঝখানে দ্বীপে 'বোলঘাটি প্যালেসে' থাকবো কয়দিন।

স্টীম লঞ্চে চললাম।

আরব সাগরের জল ঢুকে নাম নিয়েছে কোচিন লেক। লেকের একপারে বন্দর, আর পারে সহর। 'আরণাকুলাম' রাজধানী ছিল আগে কোচিন-এর। কোচিন এখন কেরেলায় মিশে গেছে।

দু'তীরে যেন নানা রঙের বাতির দীপাবলী। বাতির বিম্বিত আলো রামধনু-খেলা খেলছে লেকের জলে।

....

(আরণাকুলাম্)

....

ভোর হচ্ছে; খড়খড়ির বড় বড় জানালাগুলি খোলা। শুয়ে শুয়ে চোখ মেলে দেখছি বাইরে ধীরে ধীরে আলো ফুটছে। সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটা স্পষ্ট ফুটে উঠল। সমুদ্রের হাওয়ায় তার ডাল দুলছে, পাতা দুলছে। নবারুণের আলো এসে পড়ল তাদের গায়ে। থরে থরে সবুজ থালায় সোনার বাতি জ্বালিয়ে কৃষ্ণচূড়া দাঁড়াল আরতি কালের দীপস্তম্ভ হয়ে দেবতার দুয়ারে।

উঠে পড়লাম।

নীচে এলাম।

নীচে বাগান, বাঁধানো ঘাট। আমের বোলে ছেয়ে আছে গাছ, গুটিও ধরেছে কয়েকটা। কষি কষি আম, এই নতুন আমের টক ডাল অপূর্ব বস্তু।

মাছ ধরছে জেলেরা হালকা লম্বা নৌকো নিয়ে, দ্বীপের ধারে ধারে। তিন নৌকো বোঝাই মাছ এসে লাগল ঘাটে। ভেটকী, চাঁদা, খোরসুলা বাটার মতো মাছই বেশী। সবে ধরা মাছ, যেন রূপোর জলে চুবিয়ে তোলা।

এই মাছ এই দ্বীপটাতেই বিক্রি হয়ে যাবে। সহরে আর যেতে হবে না।

আরব সাগরের 'ব্যাকওয়াটারে' কোচিন লেক। লেকের মাঝে লম্বা একটা সরু দ্বীপ; চওড়ায় এক ফার্লং, লম্বায় সাড়ে তিন মাইল। এই দ্বীপটুকুতেই বসবাস

ষোল হাজার লোকের।

এই দ্বীপের সামনে—একেবারে মুখটাতে 'বোলঘাটি প্যালেস'। ডাচ্‌রা তৈরী করেছিল তাদের কালে সতেরোশ' চুয়াল্লিশ সালে। সে আমলের বাড়ী, বিরাট বাড়ী, বিরাট ঘর। ঘরে ঘরে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। ঘরের চেয়ে বড় চারদিকের খড়খড়ি দেওয়া বারান্দা। ইচ্ছে মতো খড়খড়ির পাল্লাগুলি জানালার মতো সব খুলে দাও—চারদিক উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আবার জল ঝড় এলে বন্ধ করে দাও, দিয়ে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঝড়ের লীলা দেখ—কোনো ক্ষতি নেই। ঘরগুলি ঘর বলে মনে হয় না। সব ঘরেই মনে হয় যেন ভাসছি জলের উপরে।

লঞ্চে করে নৌকো করে তীরের সহরে যেতে হয়, সেইভাবে দ্বীপে ফিরতেও হয়। এই দ্বীপে আসা-যাওয়ার জন্য সেতু বানিয়ে নষ্ট করেনি দ্বীপটি কেউ কখনো: পর পর নানা দলই তো এসেছে এখানে প্রভুত্ব করতে।

মাঝখানে দ্বীপ রেখে কোচিন লেকের এক তীরে আরণাকুলাম, অন্য তীরে কোচিন বন্দর। আরণাকুলামের হোটেল, অট্টালিকায় ভরা এপার। আর জাহাজের মাস্তুলে ক্রেনে লেকের ওপারের আকাশে শরশয্যা পাতা। দেশ-বিদেশের কত কত জাহাজ আসে যায় এই বন্দরে। সহর বন্দর দুইকে এক করে রেখেছে লেকের উপরে একটি সেতু। সেই সেতুর উপর দিয়ে যান যায়, পদাতিক চলে, ট্রেন ছোটে। চলাচল চলছে অহরহ।

এই বন্দরে পর্তুগীজরা এসেছিল সকলের আগে। পরে আসে ডাচ্‌রা, তাদের পরে ফরাসীরা কিছুদিন, তারপর আসে ইংরেজরা।

বন্দরে তাই নানা ছাপ মানুষের মুখে। খাঁটি 'ইহুদি জু'ও আছে এখানে এখনো কয়েক ঘর। দু' হাজার বছর রোদে পুড়ে পুড়ে কালো বর্ণ ধরেছে দেহ। এক সময় সবাই বন্দর ছেড়ে ফিরে গিয়েছিল আপন দেশ ইস্রায়েলে। বর্ণ-বৈষম্যের সমাজে টিকতে পারেনি, অনেকেই ফিরে এলো। এখন এরা এদেশের মতোই লুঙ্গি পড়ে, এই ভাষাতেই কথা বলে। তবে, নিজেদের সমাজের মধ্যেই নিজেরা থাকে। এই সমাজবিধি সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলে।

বিদেশী যারা এসেছিল আমাদের দেশে, সব দলই সর্বপ্রথমে ধর্ম নিয়েই কাজ সুরু করেছিল। ফলে যেমন হয়ে থাকে, এখানেও বন্দরবাসী প্রায় সবাই আজ ক্রীশ্চান। ক্রীশ্চান মেয়েদের লুঙ্গি পরার ধরন একটু আলাদা। লুঙ্গির এককোণা কুঁচিয়ে জাপানী পাখার মতো কোমরের পিছনে ছড়িয়ে রাখে। এইতেই শুধু বোঝা যায় যে, এ ক্রীশ্চান। কোচিনরাজ যখন ক্রীশ্চানদের এপারে মিলতে দিলেন, সকলের সঙ্গে চলনে তাদের জন্য ঐটুকু পার্থক্য রেখে দিলেন।

বন্দরেও বিরাট বসতি, সহরের মতই। মানুষে টানা রিক্সা, সাইকেল রিক্সা, ট্যাক্সি, বাস—নানা যানবাহন আছে বন্দরে। আছে রাজপথ, গলিপথ, হাটবাজার, লোকের ব্যস্ততা।

পরিচ্ছন্ন সহর, পরিষ্কার পথ। গোটা কেরেলাই পরিচ্ছন্ন। গ্রামেও দেখেছি নর্দমার নোংরামি নেই। ঘরের নর্দমা পথের উপরে পড়ে শুকনো ধুলো কাদা করে রাখে না। পথের ধারে কাঁচা নর্দমা এদেশেও আছে, ঘরের পাশে খানাডোবা আছে। বহুবৃষ্টির দেশ কেরেলা, জুন মাস হতে এদেশে বর্ষা নামে—নভেম্বরের মাঝামাঝি অবধি থাকে। ধরতে গেলে ডিসেম্বর ছাড়া দুই ঋতু এখানে, বর্ষা আর গ্রীষ্ম। ডিসেম্বরে একটা চাদর গায়ে দিতে হয় মাত্র। কম্বল বলে জিনিস নেই কারো ঘরে,—পাহাড়ের উপরের দেশটুকু ছাড়া। তাই প্রতি বছর বর্ষার জলে

দেশের সব নোংরামি ধুয়ে চলে যায় সাগরে। ছয় মাস ধোওয়াধুয়ি হয়, সহর গ্রাম সাফ হয়ে যায়।

কোচিন বন্দরে দেশী-বিদেশী ভাব মেশানো সব বাড়ী।

এখানে এরা তাদের বলে 'ব্ল্যাক জু'। এই 'ব্ল্যাক জু'দের সন্ধানেই এসেছিলাম বন্দরে। এবারে বাজার ঘুরে ঘুরে ফিরছি।

পথের ধারে এক ফুলওয়ালী বুড়ী ডালাভরা জেমন্তী গোলঞ্চ করবী নিয়ে বসে আছে মাটিতে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আর বোধ হয় ফুল নেবে না কেউ আজ। ছোট্ট মেয়েটা—নাত্নী হবে হয়তো বুড়ীর,—ঘাগরা গুটিয়ে উবু হয়ে বসল বুড়ীর সামনে মাথা পেতে। বুড়ী তার মাথার উপরে মালার মতো সাজিয়ে দিল ছোট্ট ছোট্ট হলুদ বরণ জেমন্তী ফুল একটি একটি করে।

কাল ভোরে রওনা হব, জিনিষপত্র আজ রাত্রেই গুছিয়ে রাখবো।

জিনিষ গোছাতে গিয়ে আ-হা-হা করে উঠি, বলি—একি?

মন্দিরে মন্দিরে পাওয়া প্রসাদী চন্দন—জাফ্রান, আতর, অগুরু, কুমকুম মেশানো চন্দন, থকথকে চন্দন,—অনেকখানি জমেছিল ঝুড়িতে। সময় পাইনি গুছিয়ে রাখতে। যেমন যেমন পেয়েছি তেমনি কলাপাতায় মোড়া—ঝুড়িতে ফেলে রেখেছি। এখানে এসে সময় পেলাম, চন্দনগুলি বের করে হাতে ডলে ডলে তিলক মাটির মতো লম্বা লম্বা কাঠির মতো করে শুকোতে দিলাম ঘরের কোণায় একটা টেবিলে, কলাপাতায় ছড়িয়ে। কয়দিন আছি এখানে, এর মধ্যে শুকিয়ে যাবে এগুলি। ভেবেছিলাম ফিরে গিয়ে দিদি, বড়দিদের দেবো, তাঁরা খুসী হবেন, প্রসাদী চন্দনের ফোঁটা রোজ পরবেন কপালে। এই সুরভিত চন্দন হাতে জল নিয়ে ঘষে ঘাড়ে গলায় মাখলেও স্নিগ্ধ লাগবে গা।

সেই চন্দনগুলির বেশীর ভাগ উধাও। যা আছে তাও কুরে কুরে তছনছ করে রেখেছে। কে করল?

পুরোনো বাড়ী, ঘরে ইঁদুরের উপদ্রব টের পাচ্ছিলাম ক' রাত ধরেই। তাদের হুড়োহুড়ি দাপাদাপি ছুটোছুটিতে বুঝতে পেরেছিলাম বড় বড় ইঁদুর। কিন্তু টেবিলের উপরে উঠে চন্দনের উপর এমন আক্রমণ চালাবে তা কে জানতো?

প্রসাদী পুষ্প-চন্দন সংগ্রহ নিয়ে স্বামীর কৌতুক রসিকতা ছিল সমানে। এখন আরো মজা পাবেন দেখে।

আপনমনে গজরাচ্ছি।

স্বামী বললেন,—ও,—তা—ই!

রেগে বলি, কি তা—ই?

বললেন—তাই সকালে ঘরে যতগুলি ইঁদুর ঘুরঘুর করছিল সবার কপালে দেখলাম ত্রিপুন্ড্রক আঁকা।

র‍্যাবিসাহেব এক বিদেশী, সখ করে এই বাড়ীটা করেছিলেন থাকবার জন্য। নিঃসন্তান ভদ্রলোক। কয়বছর আগে ছেড়েছুড়ে ফিরে গেছেন আপন দেশে। এই বাড়ীতেই অতিথি আমরা। সাহেবসুবোর বাড়ী—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠ, বিরাট বিরাট গবাক্ষ,—উচ্চতায় আয়তনে বিশাল, ব্যাপক। দরাজ মনের বাড়ী, সৌখীন লোকের বাগিচা। বাগিচায় এখনো কত রং, কত ফুল।

শোবার ঘরের জানালার পাশে জবার বেড়া। হলুদ জবা ফুটেছে কয়েকটা, তাতেই যেন উজ্জ্বল হয়ে আছে জায়গাটা। হলুদ জবা তো আরো দেখেছি আগে; কিন্তু এ হলুদের জেল্লা আলাদা। স্নিগ্ধ হলুদ, ভিতরে একটু লালের ফোঁটা, যেন প্রথম রবির ঠিক্‌রে ওঠা আরক্তিম আলো। তেমনিই এর রূপ। জবা নাম এর নয় এখানে, এর নাম 'চম্পারতি'। এমন নাম না হলে কি মানায় এই রূপে?

একটি ফুল হাতে নিয়ে বসেছিলাম, রামচন্দ্রন বললো এ ফুলের নাম। শুনে খুসীতে ভরে উঠলো প্রাণ।

রামচন্দ্রন স্বামীর পুরাতন ছাত্র। এখন এক গণ্যমান্য ব্যক্তি 'কোটাইয়ামে'। পুত্রকন্যা নিয়ে বড় সংসার তার। ছেলেমেয়েরাও এখন বড় বড়।

স্বামী বলেছিলেন আমাকে,—তুমি নদী ভালোবাসো, নৌকো ভালোবাসো,—কোটাইয়ামে গিয়ে যাবো নদীতে বেড়াতে।

রামচন্দ্রনও যাবে আমাদের সঙ্গে।

কোটাইয়াম বড় সহর। ষাটহাজার লোকের বাস। সমুদ্রের ধারে সহর। সহরের ভিতরে নদী। নদী গিয়ে পড়েছে সাগরের ঢুকে পড়া 'ব্যাক ওয়াটারে'র এক বিরাট লেকে। কেরেলার সবচেয়ে বড় লেক।

করুর-আর—করুর নদী। কোটাইয়াম হতে করুর নদীতে বোটে উঠলাম। সরু নদী, ভরা জল। ধীরে ধীরে বোট চললো সহর হতে সঙ্কীর্ণ দুফালি নদীর দু'তীর ধরে। সেই লম্বা জমিতে পর পর বাড়ী; দালান বাড়ী, টালির বাড়ী, মাটির ঘর। ধনী-দরিদ্র, ভূমির মালিক, দিনের মজদুর সকলের বাড়ী এক লাইনে। আছে ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্রিয় শূদ্র মুসলমান। আছে দোকানঘর স্কুল মন্দির। নদীর জল হতে দু'হাত উঁচুতে ভূমি, ভূমির উপরে বসতি। সবার ঘরেরই সামনে দিয়ে পায়ে-চলা পথ। এ-পথে গাড়ীঘোড়া আসে না। ঘরের দোরেই ঘাট; কারো বাড়ীর বারান্দা হতেই বাঁধানো ঘাট, কারো বাড়ীর সিঁড়ির গোড়ায় পাথর ফেলা ঘাট। ঘর হতে বেরিয়েই ঘাট; ঘাট হতে উঠেই ঘর।

খালের মতো সরু নদী। নদীর দু'পার যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছি।

ভাত খেল মেয়ে দাওয়ায় বসে, খাওয়া হল, উঠে থালাটা জলে ডুবিয়ে ধুয়ে নিল। বাড়ীর কর্তা দিনান্তে বসে আরাম করছেন, চেয়ারে ঠেস দিয়ে ঘাটে বঁড়শী ফেলে ছিপ ধরে বসে আছেন। মেয়েরা স্নান করতে করতে নদীতে যাত্রী দেখে পিছন ফিরে ঘুরে রইলো। ঘরের দাওয়ায় মা শুয়েছে কাত হয়ে ছোট শিশু নিয়ে, শিশুর ছোট্ট থাবাখানি মা'র পিঠের উপরে, কচি কচি আঙুলগুলি নড়ছে। বালকের দল নিজ নিজ আঙিনায় খেলা করছে। কিশোরী কয়টি গাছের ছায়ায় ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। রোগে কাতর বাড়ীর বৃদ্ধ বারান্দায় তক্তার উপরে শুয়ে

শুয়ে আকাশ দেখছে, গাছ দেখছে, নদীর বুকে লোক চলাচল দেখছে। একাকী শুয়ে সকলের সঙ্গ পাচ্ছে।

জলের উপরে জল হতে ওঠা জমি; ভিজে ভিজে মাটি, গাছের ছায়া,—জীবন জমি সবই যেন ঠান্ডা।

নদীতে ফেরী বোট এ-পার ও-পার করে সারাক্ষণ। যাত্রীভরা বাসের মতো ঘাটে ঘাটে থামে, লোক নিয়ে, নামিয়ে, চলে।

একদল মজুর-মজুরনী ক্ষেতে কাজ করে ফিরলো ফেরীবোটে। সাদা ধবধবে লুঙ্গি পরনে সবার, তেমনি ফর্সা কুর্তা কামিজ। সারাদিনের জলকাদার একটি ছিটেফোঁটা নেই কোথাও।

নদীতে ঘাটে ঘাটে লোকের আপন আপন ডিঙ্গি বাঁধা, একটি মাত্র মানুষ বসে নৌকো চালাতে পারে এমনি ছোট আর এমনি সরু। নদীতে ডিঙি নিয়ে চলে, যেন একটি শুকনো বাঁশপাতা ভাসে স্রোতে।

দু'পাশে বাস-বসতিসহ মাইল চারেক পথ, করুর নদী এসে ব্যাকওয়াটারের লেকে মিললো। নৌকোর গলুইর মতো হয়ে দু'ধারের ভূমিও শেষ হল এখানে।

কূলহারা জল-থৈথৈ, বিস্তৃত লেক। আরো মাইল দুয়েক বোট এগিয়ে গেল লেকে।

কেরেলায় মানুষ বেশী, জমি কম। জমি চাই, জমি চাই।

মানুষ এই লেকের জলে বাঁধ দিয়ে জল তুলে ফেলে জমি বের করলো। তেরটা ব্লক বের হয়েছে এই লেকের বুকে। প্রতিটি ব্লকে পনেরোশ' একর করে জমি।

পাকাপোক্ত বাঁধ দিয়ে লেকের মাঝখানে জমি আর জল আলাদা করা। জমির চেয়ে জলের লেবেল উঁচু। বোট হতে বাঁধের পাথর বাঁধানো পারটাতে নামলাম, নেমে নীচে নামলাম, তখন জমি পেলাম।

ধানের জমি সব। ধানক্ষেতে লেকের জল চুইয়ে ঢুকেছে, কি বৃষ্টির জল জমেছে, ইলেকট্রিক পাম্প দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই জল বের করে ফেলছে। আবার ধানক্ষেত শুকোলো, কি বর্ষা কম হল,—পাম্প করে জল নিয়ে দিল ক্ষেতে। সারা দেশেই এই ব্যবস্থা।

এত চেষ্টা এত যত্ন, তবু লোকের খাদ্যের অভাব। মাটি কম, লোক বেশী। সবার মুখে এই এক কথা। সমস্যার কথা। মাইলবর্গ চৌকো ভূমিতে এগারোশ' করে লোক; তাদের খাদ্য উৎপাদন করতে মাটি কোথায়? গরু নেই এদেশে বেশী এই একই কারণে। গরু চরবে কোথায়, খাবে কি?

আমরা নেমেছি তেরটা ব্লকের একটা ব্লকে—'আর' ব্লকে। ব্লকের এক কোণায় একটাই মাত্র লম্বা চালাঘর, পাতার। একদল স্বামী-স্ত্রী--গ্রাম হতে এসেছে এখানে ক্ষেতে কাজ করতে, নারকেল গাছের রস নামাতে। সন্তানদের রেখে এসেছে ঘরে। কাজ হয়ে গেলে ঘরে ফিরে যাবে, ঝাড়া হাত-পা তাই। এই লম্বা ঘরটাতেই থাকে সকল স্বামী-স্ত্রী। ঘরের মেঝেতে যার যার তালাইখানি মাত্র পাতা, পাশা-পাশি। এক একটা এক এক স্বামী-স্ত্রীর, কিনারে পাথর সাজানো এক সারি উনুন। এক এক হাঁড়ি ভাত উনুনের উপরে ঢাকা দেওয়া। যার যার সংসার আলাদা। রাতির বালাই নেই। দিন থাকতেই খেয়ে শুয়ে পড়বে যে যার চাটাই-এ।

ত্রিবান্দ্রাম ছেড়ে যতই উত্তর-পশ্চিমে আসছি, মেয়েরা শ্রীমতী হয়ে উঠছে।

এদের দলে যুবতীই বেশী। সবাই ছিপছিপে, লাবণ্যময়ী। বসে গল্প করছিল, লোক দেখে উঠে দাঁড়ালো। বড় সুন্দর লজ্জানম্র ভঙ্গী সকলের। ডান

হাত বুকের নীচ দিয়ে বাঁ কোমরে রেখে বাঁ হাতের কনুই-এর ভর তাতে দিয়ে হাতের আঙ্গুলগুলি নিয়ে থুতির নীচে নাড়তে লাগলো। এক ভঙ্গী সকলের। হাত দু'খানি এইভাবে না রাখলে রাখবে কোথায় আর?

ছেলেবেলায় মামাবাড়ীতে দেখেছি গ্রামের বধূদের এই ভঙ্গী। কতকাল পেরিয়ে মন মুহূর্তে সেই মাটি ছুঁয়ে ফিরে এলো।

রামচন্দ্রনকে বললাম,—বলো না ওদের, একটা গান শোনাতে।

গানের কথা শোনামাত্র সঙ্গে সঙ্গে যুবতীর দল জটলা বেঁধে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে গেল।

তাদের স্বামীরা জোর গলায় একটু শাসন করলো কি সাহস দিল কি জানি, তারা আবার জড়াজড়ি করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো। ঐ একই ভঙ্গীতে থুতনীর নীচে হাত রেখে, কোমরে কনুইর ভর রেখে গান সুরু করে দিল। একজন এক লাইন গেয়ে দিচ্ছে, অন্যরা সেটা সমবেত কণ্ঠে তুলে ধরছে। গান চললো। একটা শেষ হয়, আর একটা ধরে। দোলা দোলা সুর, মাঠে ধান পুঁততে পুঁততে গায় এইসব গান। সুরের ঝোঁকে ঝোঁকে একহাতে ধরা ধানের গোছা হতে আর হাত দিয়ে চারা নিয়ে পুঁতে দেয় কাদামাটিতে।

দলের মুরুব্বি এলো দু'হাতে হাঁড়ি, কাঠের খাপে ভরা নারকেল গাছ চাঁছবার দা, দড়ি, মাটি—সবকিছু নিয়ে তৈরী হয়ে। দিনের রসের হাঁড়ি নামিয়ে রাতের রসের জন্য আবার নতুন করে হাঁড়ি বেঁধে রেখে আসবে গাছে গাছে।

কালো কুচকুচে চওড়া কাঁধের লোকটিকে দেখে মামাবাড়ীতে সেই ছেলেবেলার 'গাছি মামা'কে মনে পড়ে গেল। এমনিতরোই ছিল তারও বুকের পাটা, এমনি-তরোই হাসিমুখ। রসের দিনে খেজুর গাছ কাটতে যখন উঠতো গাছে, নীচ হতে কত কাকুতি জানাতাম,—'ও গাছিমামা, একটা বাদি কেটে ফেলে দাও'। সঙ্গীরা সবাই দু'হাত তুলে লাফালাফি করতাম,—'আমার জন্য ফেল, আমার জন্য ফেল।'

গাছিমামা হঠাৎ একটা 'বাদি' কেটে ফেলে দিত নীচে। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়তাম তার উপরে আর তাই নিয়ে আমাদের কী উল্লাস! কী যে করতাম তা' নিয়ে শেষ পর্যন্ত—তা' আর মনে করতে পারছি না, তবে খুসী যে হতাম, সেই খুসীটা যেন এখনো তেমনি আছে।

আর পাচ্ছি এখানে মামাবাড়ীর সেই বর্ষাকালের জলের গন্ধ। একটু পচা-পচা ভাপসা গন্ধ। জল,—জলও তো সেখানে এমনিতরোই টলটল করতো। তাতে থাকতো সাপ্‌লা ফুল, থাকতো ধানশিষের মাথা জেগে। আকাশেও এমনিতরোই রং ধরতো। এমনিতরোই নৌকোর পালগুলি মেঘের গায়ে ভেসে বেড়াতো, বিলের জল লালে লাল করে দিয়ে সূর্য অস্ত যেত।

বোট ফিরে চললো। কয়ুর-আর-এর দুই তীরে সন্ধ্যা নেমেছে। ঘরে ঘরে দীপ জ্বলছে। কেউ রেখেছে প্রদীপখানি সামনের দাওয়ায় মাটিতে নামিয়ে, কেউ দিয়েছে বারান্দার চালের বাতা হতে ঝুলিয়ে। সন্ধ্যাবেলায় গৃহস্থঘরের এই আলোটুকুই পথ দেখায় পথচারীদের।

মনে পড়লো, দিদিমা দিনের আলো নিবতে না নিবতে তুলসীতলায় প্রদীপ দেখিয়ে লণ্ঠনটি জ্বালিয়ে চাল হতে ঝোলা লোহার শিকে ঝুলিয়ে দিতেন দাওয়ার উপরে। ঘরের বাইরে আছে যারা, তারা যে আসবে ঘরে। আলো পড়ুক তাদের পথে।

'কালাতী, গুরুবায়ু'

কোচিনে সর্বত্র বিরাট বিরাট কারখানা, আর বিশাল বিশাল চার্চ। পথে চলতে ডাইনে বাঁয়েই এই চার্চ দেখা যায়।

'কালাতী' পূর্ণা নদীর তীরে শঙ্করাচার্যের মা'র বাসভূমি। বনজঙ্গলে ঢাকা ছিল স্থানটি। তেত্রিশ শঙ্করাচার্য বন কাটিয়ে মন্দির করলেন এখানে। পঞ্চ ধাতুর সারদাদেবী প্রতিষ্ঠা করলেন। শুভ্র সুন্দর সরস্বতী মূর্তি।

পাশে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম। স্বামীজী আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন। বললেন,—এই সেই নদী, এই সেই ঘাট। এই ঘাট হতে শঙ্করাচার্যকে কুমীরে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। নদীর ঐ পারে ঐ যে বন—নদী সরতে সরতে ঐ বাঁকের মুখে চলে গিয়েছিল। বৃদ্ধা মা'র অতদূরে গিয়ে স্নান করতে কষ্ট হয়,—সারদাদেবী শঙ্করাচার্যের ইষ্টদেবী,—তাঁর বাক্য তাই সিদ্ধ ছিল। নদী ঘুরে এলো নিকটে।

শাপমোচনের যজ্ঞকুণ্ড দেখালেন স্বামীজী। কয়েক বছর আগে এই যজ্ঞ করা হয়েছিল। এ-দেশের লোকদের উপর শঙ্করাচার্যের শাপ ছিল। বলেছিলেন,—এক হাজার বছর এরা অন্ধকারে থাকবে।

শঙ্করাচার্যের মা মারা গেলেন। নাম্বোদ্রিদের মধ্যে কেউ এলেন না শবদেহ সৎকার করতে। সন্ন্যাসীর মা'র মৃতদেহ ছোঁবে না নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণরা। শঙ্করাচার্য নিজেও নাম্বোদ্রী ছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাস নিয়ে জাত খুইয়েছেন।

শঙ্করাচার্য যোগবলে কলাগাছ কেটে নিজেই মা'র শবদেহ দাহ করলেন। রাগে দুঃখে সেই তখনই অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, এরা অন্ধকারে থাকবে। হিসাব করে দেখা গেছে এক হাজারের জায়গায় বারোশ' বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। বিশেষ আয়োজনে শাপমোচনের যজ্ঞ করা হয়েছিল তাই।

মা'কে যেখানে দাহ করা হয়েছিল সেখানে একটা বটগাছ ছিল, কালের স্রোতে তলিয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা একটা পাথরের থাম বসিয়ে রেখেছিল, তার উপরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিত রোজ। সেইটিই শুধু আছে।

এই ভূমিই শঙ্করাচার্যের মা'র বাসভূমি, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনেক তত্ত্বানুসন্ধান করে পেয়েছেন পণ্ডিতরা। বাসভূমি হতে জন্মভূমি অর্থাৎ আঁতুর ঘর অল্প একটু তফাতেই হয়। সেই হিসাব মতো অনেকের অনুমান জন্মভূমিটুকু পড়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমের সীমানার মধ্যে। এটা পুরোপুরি নির্ধারিত করা হয়নি এখনো।

নাম্বোদ্রিদের হাতে এখন এই মন্দিরের ভার।

এখানকার লোক শ'য়ে নিরানব্বইজন ক্রীশ্চান ছিল। মিশনের চেষ্টায় এখন একুশ পারসেণ্ট লোক হিন্দু হয়েছে।

মিশনের আশ্রম ফলে ফুলে ভরা। আঙিনায় মস্ত এক নাগলিঙ্গম গাছের গায়ে গুঁড়িতে অজস্র নাগলিঙ্গম ফুটে আছে। একটা জায়ফল গাছ বছরে হাজার টাকা আনে। জায়ফলের দাম বেশী। নদীর তীরে আশ্রম। বাগান-বাগিচায় সুপারি, নারকেল, কাঁঠাল, আম, নানাবিধ ফলের বহু গাছ।

খুব বেশী দিনের কথা নয়। এর আগের স্বামীজী এখানে বনবাদাড় কাটিয়ে মন্দির করলেন, আদিবাসী হরিজনদের মধ্যে কাজ সুরু করলেন। এখানকার

স্কুলের অর্ধেক ছেলে আদিবাসী, হরিজন। স্বামীজী নাম্নোদ্রি ছিলেন, এখান-কারই লোক। অনেক বাধা পেয়েছিলেন—সব উত্তীর্ণ হয়েছেন।

দেবী সারদার মন্দির-অঙ্গনে ঢুকতে মিশনের আশ্রমের সামনে, পথের উপরে একটি অশত্থ গাছ হাজার হাত মেলে দাঁড়িয়ে আছে। তার ছায়ায় ঢাকা তলা, ছোট্ট জনপদ, সব মিলিয়ে তপোবন।

সহর নগর পেরিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ী। কড়া রোদ, গরম হাওয়া। ত্রিচুরের ছেলে বালগঙ্গাধর গান গেয়ে চলেছে,—রিমঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে। দেখা করতে এসেছিল কাল, একসঙ্গেই এখন চলেছি তার দেশে। মহাআগ্রহ। বলে, বাংলা গান আমি ভুলিনি। আর তো সময় পাবো না, এখনই শুনিয়ে দিচ্ছি সব—শুনুন। বলে একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে,—আজি যত তারা তব আকাশে, আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ—সত্য সুন্দর, ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে, চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো।

কোনো গান বাদ দেবে না সে। সেই আঠারো-উনিশ বছরের লাজুক ছেলে,—স্বামীর ছাত্র। বাড়ীতে আসতো, মুখ তুলে চাইতো না কখনো। দলের পিছনে গুটিসুটি বসে থাকতো। সে আজ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, সুন্দর দশাসই চেহারা; সেদিন বড় মেয়ের বিয়ে দিল। সেই বালগঙ্গাধরের আজ একে-বারে অন্য রূপ।

বালগঙ্গাধর বলে, জানেন রানীদি, আমি 'টেরিটোরিয়াল গার্ড' ছিলাম কিছুদিন। সেই তখন মার্চ করে চলা, সোজা হয়ে বসা, এসব করতে করতে আমি নিজেই বুঝতে পারলাম আমি বদলে যাচ্ছি। আমার একটা আত্মবিশ্বাস এলো, নির্ভীক হলাম। সকলের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

'ভাগীরথীও ত্রিচুরেরই মেয়ে। রূপসী মেয়ে, ধনীর মেয়ে। নাম-করা 'ল'ইয়ার' এখন এখানে। বিয়ে-থা' করলো না, কেন করলো না কি জানি! ছুটে এসে তাদের অনিলদাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেই ফেললো, অনেকদিন পরে পিতাকে দেখে যেমন কাঁদে কন্যা। তারপর কাঁদলো আমাকে ধরে। এখন আমাদের বয়েস হয়েছে, এরা মধ্য গগনে, আমরা হেলেছি পশ্চিম আকাশে। তবু সেই কতকাল আগের স্নেহ-ভালোবাসা—আজও তাতে হৃদয় ভরা। বাক্যে ভাষায় প্রকাশ নেই এর।

বালগঙ্গাধরের বাড়ীতেই খাবো আজ দুপুরে সবাই একসঙ্গে। ভাগীরথী পায়েস করে নিয়ে এসেছে পিতলের বালতি ভরে। চাল বেটে তার 'লেই' করে সাগুর পাপড়ের মতো পাতলা করে শুকিয়ে, পরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দুধে ক্ষীরে সিদ্ধ করে বানিয়েছে 'পায়েসম্'। বালগঙ্গাধরের স্ত্রী লীলা বললো—এ পায়েস বানাতে বড় হাঙ্গামা। লীলার রান্নার হাতও খুব ভালো।

সবাই মিলে যেন শান্তিনিকেতনে আশ্রমের সেই সোনায় ধোওয়া দিনগুলিতে ফিরে আসি। আনন্দে সময় কেটে যায়।

দুপুরে একটু বিশ্রাম নিতে হবে। বিকেলটুকুই যা সময় হাতে। হরিজন স্কুল দেখতে হবে, 'কটেজ ইণ্ডাসট্রি' দেখতে হবে; এখানকার হাতের কাজ বিখ্যাত। হাতীর দাঁতের কাজ নামকরা। মাদুরের কাজ, ঘাসের ব্যাগ ইত্যাদির খুব খ্যাতি। আবার 'গুরুবায়ু' মন্দির,—এদিককার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মন্দির। ত্রিবান্দ্রামে দেখা হয়েছিল হায়দ্রাবাদের লার্টগিন্নির সঙ্গে, কেরেলার মহিলা। ট্যুরে বেরিয়েছেন. পথে ঘুরে গেলেন দেশ। একই সঙ্গে ছিলাম রাজভবনে অতিথি হয়ে। দুপুরে যেদিন ঘরে থাকতাম, ডেকে নিয়ে যেতেন, বলতেন. 'শাড়ী কিনতে যাবো—দেখবে চল তুমিও'। রোজ দেখতাম প্রসাদী চন্দন লেপ্টে থাকতো তাঁর

কণ্ঠে কপালে। এইটি বড় ভালো লাগলো এখানে। কি লাটগিন্নি, কি উকীল বা প্রফেসর, কি ঘরের গিন্নি, স্কুল-কলেজের ছাত্রী, সব মেয়েরাই প্রসাদী চন্দন হাতে নিল—অকুণ্ঠে কপালে খানিকটা থেবড়ে দিল, কণ্ঠে খানিকটা থেবড়ে দিল। পরিপাটির দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, লোকে কি বলবে সে ভাবনা নেই। সহজ ভাব। মনে মনে বলি,—এই সহজ ভাবটি যেন টিকে থাকে এখানে। বাইরের ছোঁওয়া যেন না লাগে এদের মনে।

লাটগিন্নির গলায় ছিল সরু সোনার চেনে একটি ক্ষুদ্র লকেট। একদিন লকেটটি তুলে বলেছিলেন,—'গুরুবায়ুদেব'। ত্রিচুরে যখন যাবে যেও সেখানে নিশ্চয় করে।

এক বিকেলে এতগুলি জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। আমি বরং 'গুরুবায়ু-দেবের মন্দির'-এ যাই, স্বামী তাঁর প্রোগ্রাম অনুযায়ী যেখানে যাবার, যা কিছু বলবার—তা বলুন করুন।

অপরাহ্ন কাল। সহর হতে বেশ কিছু মাইল দূরে মন্দির। পথের দু'ধারে দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেত। অপূর্ব এর শোভা। এই শোভা মুখে মুখে প্রচার হয় সহরে, গ্রামে। দর্শনার্থীর দল মুগ্ধ হয়ে পথ চলে।

আকাশ দেখলাম। অনেকদিন পর এতখানি আকাশ। অনেকদিন পরে এত-খানি খোলা ধানক্ষেত।

মন্দির এলাকা অনেকখানি জুড়ে। দু'তোরণের মুখে লম্বা দু'সারি দোকান, তীর্থযাত্রীদের থাকবার জন্য ধর্মশালা। একপাশে চারপার বাঁধানো পুষ্করিণীর মতো বড় একটি কুণ্ড। চারপার ধরেই বাঁধানো সিঁড়ি কুণ্ডের জল পর্যন্ত। পুষ্প চন্দন দধি দুগ্ধ ঘৃত তুলসী ধূপের মিশ্রিত সৌরভ চতুর্দিকে। যাত্রীর ভীড়, পাণ্ডার ভীড়, পূজারীর ভীড়। সবাই ব্যস্ত, সবাই ছুটোছুটি করছে। পূজারীরা ছুটছে পূজার আয়োজনে, যাত্রীরা ছুটছে দর্শন আকাঙ্ক্ষায়, পাণ্ডারা ছুটছে যাত্রী ধরতে।

কয়েক জোড়া বর-কনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অভিভাবকের দল। এসব দিকে দেবমন্দিরে দেবতার সামনে বিয়ে হয় সকলের। সুন্দর নীতি। মন্দির প্রাঙ্গণে এত ভীড়ের মধ্যে নারকেল পাতার ছাতা মাথায় দিয়ে, ভীড় বাঁচিয়ে চলছে নানা বয়সের কয়েকটি মহিলা। এরা নাম্বোদ্রি। পুকুরে স্নান করে ভিজে লুঙ্গিতে এসেছে, গায়ে ভিজে চাদর ঢাকা। এরা ব্লাউজ পরে না। নাম্বোদ্রি নারীরা কাউকে মুখ দেখায় না। বর্মী ছাতার মতো পাতার ছাতা নিয়ে চলে সব সময়ে, মন্দিরেও। লীলা বললো, নাম্বোদ্রিদের প্রচণ্ড প্রতাপ ছিল আগে। এদের দেখলে রাস্তা হতে লোক সরে যেত। মন্দিরে এলে 'সরে যাও, তফাত যাও' রব উঠতো। কেউ ছুঁয়ে দিলে আবার স্নান করতো। এখন আর সেদিন নেই।

নাম্বোদ্রি মহিলারা দু'পা এগোয় আর কোণায় কোণায় নিজেদের মধ্যে জটলা করে গা' বাঁচিয়ে দাঁড়ায়। ভীড় একটু হাল্কা পেলে সুবিধে মতো আবার এগিয়ে আসে। ছাতা দিয়ে সবার মুখ ঢাকা।

পুরাতন মন্দির; অনেকটা ভাইকমের মতো মন্দির। তেমনিতরো মন্দিরের বাইরে ছবি আঁকা। সোনার গরুড় স্তম্ভ মন্দির ছাপিয়ে উপরে ওঠা।

আরতির সময়। লাল রঙ্গনের মালা দুলছে মন্দিরের মুখে। গর্ভমন্দিরের সামনের অঙ্গনে রঙ্গনের মালার চাঁদোয়া। দিকে দিকে দীপ জ্বলছে নানা দীপাধারে; স্তম্ভ দীপ, দেয়াল দীপ, দীপের মালা, দীপের দরজা। আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো মন্দির। হাওয়ার তালে শিখায় শিখায় নৃত্য সুরু হল।

আঙিনায় একসারি লোক সানাই মুখে তুলে ধরলো। ঢোল কাঁসর শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠলো। আরতি সুরু হল, 'হরি হরি' ধ্বনিতে ভরে উঠলো দিক্‌বিদিক।

প্রসাদী মালা-চন্দন নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম।

সব মন্দিরেরই চলতি কাহিনী আছে, মুখে মুখে চলে তা'। কাহিনী কবে কার কাছ হতে সুরু সে খবরে প্রয়োজন বোধ করে না। এ মন্দিরেরও কাহিনী আছে। যদুকুলপতি দেহত্যাগ করছেন, ব্যাধের বিষাক্ত তীর ফুটেছে পায়ে। তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন তাঁর সাধের দ্বারকা সমুদ্রে ধুয়ে যাবে। যদুকুলের নামও থাকবে না। ভক্ত উদ্ধবকে ডেকে বললেন, 'বাসুদেবকে তুমি দেখো'।

এ মূর্তি কৃষ্ণের পিতা বসুদেব পূজা করতেন।

কৃষ্ণ দেহত্যাগ করলেন। উদ্ধব বৃহস্পতিকে কৃষ্ণের ইচ্ছার কথা জানালেন। বৃহস্পতি বুঝলেন কৃষ্ণ কি চেয়েছেন।

প্রলয় উপস্থিত হল।

বৃহস্পতি দ্বারকায় বসুদেব যে মূর্তি পূজা করতেন, সেই বাসুদেবের মূর্তি বুকে নিয়ে প্রলয়ের জলে ভাসতে লাগলেন। পবনদেব বায়ু বৃহস্পতির সেই অবস্থা দেখে তাকে ঠেলে ঠেলে একটা পারে এনে ফেললেন। দেবগুরু বৃহস্পতি ও বায়ুর মিলিত চেষ্টায় সেই মূর্তি যেখানে ঠেকেছিল সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত হল। নাম হল 'গুরুবায়ু'। জায়গার নাম 'গুরুবায়ুপুরম্'।

পথে ঘণ্টিঘরের কাছে গেট বন্ধ। ট্রেন আসবে, সিগন্যাল পড়েছে; গাড়ী থেমে অপেক্ষা করছে। জলা জায়গা—দূরে গ্রাম। গ্রামের বাইরে একটা চালাঘরে বহুলোকের সমাবেশ, বহু বাতি, বহু হট্টগোল। দূর হতে দেখছি আলোর বিপরীতে লোকের মাথাগুলি কিলবিল করছে—বাতির কাছে পতঙ্গপালের মতো।

লীলা, বালগঙ্গাধর সঙ্গে আমার। বালগঙ্গাধর বললো—'আইয়াপ্পা'র পূজা দিচ্ছে ব্রতচারীরা; বাজনা বাজছে, আলো জ্বলছে, গান. স্তব হচ্ছে তাই। জায়গায় জায়গায় এখন এইরকমভাবে পূজা করছে লোকেরা।

এ-ক'দিন পথে পথে দেখেছি কালো কাপড় পরা লোক চলেছে দলে দলে। এরা একচল্লিশ দিনের ব্রত নেয়, মাছ মাংস খায় না, শুদ্ধাচারে থাকে। অনেকটা আমাদের দেশের নীলপূজার মতো। তারপর ব্রতচারীরা সবাই যায় 'সাবরমালা' মন্দিরে একশ' মাইল দূরে। হেঁটে হেঁটে যায় বেশীর ভাগ।

সে মন্দিরে ঢুকবার অধিকার পায় এইসব ব্রতচারীরা আর দশ বছরের ছোট বালিকারা এবং পঞ্চান্ন বছরের প্রায়-বৃদ্ধা মেয়েরা। অন্যরা নয়।

রাত্রে আসি 'মালামপুঝা'। মস্ত বাঁধ পাহাড়ে ঘেরা। খানিকটা মহীশূরের 'বৃন্দাবন গার্ডেন'-এর মতো বাগান বাতি ফোয়ারা চৌবাচ্চা, নানা ছাঁটে কাটা ময়ূরপঙ্খী ঝাউ।

বাঁধের উপরে একটা উঁচু পাহাড়ের টিলায় 'রেস্টহাউস'। দেয়াল জোড়া কাঁচের জানালা, তার এক পাট খুললেই ঘরে তুফান বয়। শোঁ শোঁ হাওয়া জানালার শার্সিতে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। বাইরের হাওয়ায় যেন সাত সাগরের হু-হুঙ্কার।

সারারাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনলাম--মহাকালের মন্দিরে শয়ন-আরতির শিঙ্গাঘণ্টা যেন বেজেই চলেছে সমানে।

দু'চোখ মেলে শুধুই দেখে চলা। চোখে চোখে জানা-চেনা। কাজ করতে করতে মুখ তুলে যেন এরা দেখে আমাকে, চলতে চলতে আমি দেখি এদের। পরিচয় আর হয় কতটুকু? এই দেখাটুকু নিয়েই চলে চলেছি। কাঁটা ঝোপের গায়ে আঁচলটা আটকে যায়, থেমে টেনে নিই, সুতো ছিঁড়ে থাকে। তেমনি ভাবে ক্ষণিক থামি, ছিঁটেফোঁটা মন কোথাও আটকা পড়ে থাকে, কোথাও বা আলগোছে তুলে নিই। কখনো বা বিরাটের মাঝে আপনাকেই হারিয়ে ফেলি, তখন খোলা চোখেও আলো থাকে না পথ দেখবার।

ভোরে উঠে পথে নামলাম। এই দিকটায় মেয়েদের মাথার টুকরী আকারে অনেকটা বড়। বাঁশের চাঁচের তৈরী।

পথে পড়লো 'কস্‌মোপলিটান' গার্লস হোষ্টেল; আদিবাসী ছাত্রীদের হোষ্টেল, গালভরা নাম।

ছাত্রীরা আজ বিশেষভাবে সেজেছে। আগে হতেই জানা ছিল স্কুল দেখতে, হোষ্টেল দেখতে আসবে লোক। মেয়েদের সবার চোখে কাজলটানা। নাচলো গাইলো—পার্বতী নামে মেয়েটি। গানের মানে—জোয়ান 'ফ্রণ্টে' বসে ভাবছে তার ছায়াঘন গ্রামের কথা, কচি সবুজ ধানক্ষেতের কথা, আপন ঘরের আঙিনাটুকুর কথা,—আর সেই আঙিনায় তার মালাবারী প্রিয়া বসে বসে ভাবছে পতিকে—তার কথা। দৃশ্য-বর্ণনা কথাকলির মুদ্রা ভঙ্গীতে ভাবে কটাক্ষে ফুটিয়ে তুললো বালিকাটি, কিছু অস্পষ্ট থাকলো না।

চটপটে চালাক মেয়েটি। সে সবচেয়ে ভালোবাসে 'সার্ক ফিস' খেতে।

সবাইকে একদিন ভালো করে সার্ক ফিস খাবার জন্য টাকা দেওয়া হল। তারা কী খুশী!

ত্রিবান্দ্রাম হতে আর্‌ণাকুলাম অবধি এতখানি পথ সহর ও গ্রাম একটানা। এখন কিছু কিছু ফাঁকা জমি গ্রাম ছাড়িয়ে পাওয়া যায়। তালগাছের সারিও দেখি।

ত্রিবান্দ্রামে সহরের ভিতরেও ধানক্ষেত ছিল।

গেরী মাটির দেশ, গেরুয়া রঙের ভেড়া। একদল ভেড়া মাঠে চরছে এই আজই দেখতে পেলাম। খোলা জমি পতিত জমি এখানে এদিকে ওদিকে। গরু মোষও চরে বেড়ায়।

পর পর মুসলমান গ্রাম। এরা মোপ্‌লা। অন্য জাতের নারীপুরুষের সঙ্গে এদের চেহারায় কোনো তফাত নেই। ভাষা সবার এক। পুরুষদের পরনে হিন্দুদের মতনই লুঙ্গি—হাঁটু অবধি উল্টে ভাঁজ করে তোলা। মেয়েদের সাজে শুধু একটু তফাত; মাথায় এরা রুমাল ঢাকা দেয় পাহাড়ীদের মতো, আর লম্বা হাতার জামা দেয় গায়ে। ক্ষেতে কাজ করছে মেয়ের দল। লম্বা হাতার জামা দেখে বোঝা যায় কারা কারা মুসলমান।

এই মোপ্‌লাদের মধ্যে আছে আরব রক্তের সংমিশ্রণ। বাণিজ্য করতে আসতো আরবরা কালিকুট বন্দরে।

এদের সবারই অবস্থা ভালো। মোপ্‌লাদের আদিরা জন দশবারো মক্কার

মুসলমান, বাকী সব এখানকার। এখন এদের বিরাট গোষ্ঠী, বলিয়ান গোষ্ঠী।

বন্দরে গঠিত জাত,—এরা সব মায়ের সন্তান। মা—পিলা, মানে, মায়ের সন্তান। এ-হতেই নাম হয় মাপ্‌লা, মাপ্‌লা হতে মোপ্‌লা। আরবরা বাণিজ্য করতে এসে সন্তানসন্ততি রেখে যেত, মায়ের নামেই তারা পরিচিত হত।

মালাবারের বাড়ীগুলি সবই যেন সবে তৈরী এমনি মনে হয়। ঝক্‌ঝকে সুন্দর। পথের দু'ধারে দোতলা টালির ঘর, জানালায় জানালায় পাতা সমেত নারকেল ডাল বাঁধা, পর্দার কাজ করে। কাঠ দিয়ে বারান্দা ঘেরা রেলিং—নৌকোর ছই-এর মতো বাইরের দিকটায় গোল গড়ন।

নারকেল বনের তলায় তলায় টেপিওকার ক্ষেত। উপরে নারকেল গাছ বড় হয়ে ওঠে, তলার মাটিটুকু টেপিওকার কাজে লাগে।

পালঘাট হতে কালিকুট পর্যন্ত চলতি পথে চার্চ নজরে পড়লো না একটিও।

কালিকুট এলাম।

সারাদিন ঘুরলাম।

বিকেলে 'বালবাড়ী'র উদ্বোধন করলেন স্বামী মেথরদের শিশুদের জন্য। মেথর পল্লীতে আজ জমাট জনতা। অনেকেই বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। বসে বসে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। দেখি এক দেয়ালে বড় বড় পোষ্টার, একটা পোষ্টারে বড় আকারে রবীন্দ্রনাথের মুখ, পাশে এদেশী ভাষায় কবিতার লাইন কয়েকটা।

কুমারন্‌কে বললাম—কাছে গিয়ে কবিতাটি লিখে এনে আমাকে মানে করে শোনাও।

কুমারন্‌ শুনালো,—যারা লাঙ্গল চালায়, পথের ধারে বসে পাথর ভাঙ্গে, 'ভগবান' তাদের সঙ্গে থাকেন।—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।

—গীতাঞ্জলি ১১৯

আর একটা পোষ্টারে ছিল,—কুয়োর ধারে চণ্ডালকন্যা জল তুলছিল, ভিক্ষু আনন্দ এসে জল চাইলেন। কন্যা বলে, আমি চণ্ডালকন্যা, জল দেব কেমন করে? আমি যে অস্পৃশ্যা। ভিক্ষু বললেন,—'যেই মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা, সেই বারি তীর্থবারি যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে।'

হিন্দিতে বড় বড় করে লেখা—'জাতী নহী, পানী মাঙ্গা হ্যায়'।

মিটিং শেষ হতে হতে রাত হয়ে গেল। বললাম, একবার সমুদ্রের ধার হয়ে যাবো, কিছুক্ষণ থাকবো।

সকালেও একবার এসেছিলাম সমুদ্রের তীরে। খালি গায়ে মুণ্ডু পরা কয়েকটি বৃদ্ধা ঘুরে বেড়াচ্ছিল টুকরী হাতে নিয়ে। বোধহয় মাছ কিনবার আশায়। মাথার চুল তাদের চূড়ো করে বাঁধা, আগের কালের মতো। মীণাক্ষীর মা বলছিলেন,—এই বৃদ্ধাদের সঙ্গে সঙ্গে এই সাজ আর এই চুল বাঁধা উঠে যাবে। মেয়েরা শাড়ী পরবে, খোঁপা বাঁধবে।

সমুদ্রের তীরে বালির উপরে লম্বা টানা দিয়ে দুই প্রান্তে দুই লোহার শিক ঘুরিয়ে পাক দিয়ে দিয়ে মোটা দড়ি তৈরী করছে লোকেরা। মাঠ সমান মাছধরা জাল বালিতে বিছিয়ে শুকোচ্ছে। চার-পাঁচজনে মিলে মেরামত করছে জাল। জেলে নৌকো সারি সারি কাত করা বালুরাশির উপর।

চলতে চলতে দেখেছিলাম বাঁকের দু'ধারে ঝুড়ি ভরে মাছ নিয়ে চলেছে জেলে বাজারে বেচতে। কয়েকটা কাক সমানে উড়ে চলেছে সাথে সাথে। মাছের লোভ বড় লোভ। ঝুড়িতে সব বড় বড় মাছ, কাকের তোলা অসাধ্য,—পারলো না শেষ পর্যন্ত।

কালিকুট,—ইংরেজরা বলতো কোড়িকোত। এই কালিকুটেই ভাস্কো-ডা-গামা প্রথম এসে নেমেছিল।

মোপ্‌লাদের এ লীলাভূমি। রাজনীতির এ সমরক্ষেত্র। আর,—স্বামী হেসে বলেন, কৃষ্ণমেননের জন্মস্থান।

কেরেলার লোক বলে কালিকুট নোংরা সহর। এই নোংরা সহরও অন্য প্রদেশের সহরের চেয়ে কত পরিষ্কার।

গাড়ী, লোক, দোকান, বাজারে পথগুলি গম্‌গম্‌। সহরের বুকে প্রাসাদ, পার্ক, পুকুর—প্রতিবিম্ব। কালিকুট বন্দর বড় সহর। বেচাকেনায় কত জাহাজ আসে যায় এই বন্দরে। পথে পথে ব্যস্ততা।

রাত্রিকাল; আলোর সহর পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে এলাম। অন্ধকারে পার ধরে অনেকখানি হাঁটলাম।

সমুদ্রের জলে—ব্যাকওয়াটারে বড় আঁশ্‌টে গন্ধ।

কালপেট্টা

কালপেট্টা হতে দশ মাইল দূরে 'সুলতান ব্যাটারি'। শুনেছি সুলতান ব্যাটারিতে হাতী পোষ মানানো হয়। বনের হাতী ধরে এনে কিছুদিন রাখে এখানে। হাতী দিয়ে কাজ করায় কেরেলায়ও। সুলতানের সৈন্যদের একটা ক্যাম্প ছিল এখানে, সেই হতেই নাম 'সুলতান ব্যাটারি'।

কালপেট্টায় জৈনবন্ধু এখানকার এক ধনী নাগরিক। কালপেট্টা পাহাড়। এ-পাহাড়ে রবার আর কফির বাগান। অনেকখানি কফি বাগানের মালিক বন্ধু। কফি ক্ষেতে ভরা আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ী টিলার মাথায় প্রাসাদতুল্য এক বাড়ী তুলেছেন তিনি সম্প্রতি। দোতলায় সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে বড় মাঝের 'হল'খানা পূজার ঘর।

বন্ধুর অতিথিই যে আমরা শুধু তাই নয়, এই নতুন বাড়ীর প্রথম অতিথি। বাড়ীর কাজ চলছে এখনো। বড় বড় কাঁচ লাগানো হচ্ছে জানালায়, রঙ লাগানো হচ্ছে ঘরে ঘরে।

বন্ধু ঘুরে ঘুরে বাড়ী দেখালেন। কফির কারখানা দেখালেন। মেয়ে

অপরিহার্য এদের কাঁধের অঙ্গ-বস্ত্রম্‌। আঙিনায় বাড়ীর প্রৌঢ়কর্তা কুড়োল দিয়ে কাঠ কাটছে, খালি গা, কিন্তু ভাঁজ করা অঙ্গবস্ত্রখানি ঠিক আছে কাঁধের উপরে। গ্রামের পুরুষরা, পথ চলতি নাগরিকরা, সবাই সাদা কাপড়ের লুঙ্গিটা হাঁটু অবধি উল্টে একটা গিট দিয়ে রাখে। পা অবধি ঝুলিয়ে রাখে না। ত্রিবান্দ্রাম হতে যত ভিতরের দিকে ঢুকেছি নারীপুরুষ সকলের পরনে সাদা লুঙ্গি।

লুঙ্গি ব্লাউজ বর্মা দেশের মেয়েদেরও সাজ; কিন্তু কেরেলার মেয়েদের সাজ—মনে হয় যেন অসমাপ্ত সাজ। কি যেন নেই। যেন সাজ করতে করতে অর্ধেক সাজ হতেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

কেরেলার মেয়েরা কেউ হংসগামিনী নয় গুরু নিতম্বভারে। পিছন দিক হতে নারী-পুরুষের কোমরের গড়নে তফাত নেই বিশেষ।

কেরেলার সারা পথে কিছু দূরে দূরেই কাঁধ সমান উঁচু দু'টো পাথরের থামের মাথায় পাথরের তক্তা রাখা। পথ-চলতি ক্লান্ত লোকেরা মাথার বোঝা আয়াসে এর উপর রাখে, বিশ্রাম নেয়।

গরুর গাড়ী, ঠেলা গাড়ী, সবেতেই রবারের চাকা। গরুর গাড়ী বোঝাই নারকেল-ছোবড়া চলেছে কারখানায়। সবই সবুজ ছোবড়া। নারকেল ঝুনো না হতেই কাটে, একটি ছোবড়া পড়ে থাকে না।

কেরেলার গরুর গাড়ীগুলি বড় সুন্দর, যেন রথ রথ ভাব। গরুর মুখ-গুলিও সুন্দর। পশুপক্ষীরও সুন্দর অসুন্দর আছে বৈকি। চেয়ে চেয়ে দেখি গরুর গাড়ীর গরুগুলিকে, সাদা রং, কপাল হতে নাক পর্যন্ত একটানা লম্বা মসৃণ মুখ। সুন্দর মুখ।

এখানকার নৌকোগুলিও সুন্দর। নৌকোগুলির গলুই অনেকটা ময়ূরপঙ্খী নৌকোর মতো। পুরোপুরি সবটা নয়—যেন ময়ূরের মাথাটা আধা-আধি কেটে ফেলা।

কেরেলা জলপথে ভরা, কোনোটা নদী, কোনোটা নালা। নদীগুলি সবই ছোট ছোট। কাছেই নীলগিরি শ্রেণী, সেখান হতেই নদী এসে সাগরে মিলেছে। একশ' মাইল দেড়শ' মাইল পথ মাত্র তারা এসেছে, একা একাই এসেছে। গঙ্গা ভাগীরথীর মতো সঙ্গী-সাথী জুটিয়ে দল ভারী করে একজোটে এসে পড়েনি ঝাঁপিয়ে। এরা নীরবে বনের ভিতর দিয়ে সঙ্গোপনে পথ চলে এসেছে।

কেরেলার পথে ধুলো নেই। পীচ-ঢালা পথ, পথের দু'পাশে হাত কয়েক জমি ঘাসে ঢাকা, তার পরেই বাড়ী—নয়, বন বা ক্ষেত। কেরেলার সব মাটি সবুজে ঢাকা, পথটুকু ছাড়া।

কেরেলার পথে থেকে থেকেই হাওয়ায় সুবাস আসে ধূপের।

কখন যে পাহাড় হতে নেমে এসেছি সমতল ভূমিতে, টের পাইনি। পথের দু'দিকেই গাছ, গাছের আড়ালেই পাহাড়—দেশ অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন গরম লাগছে।

'কুর্গ'

কলা নারকেল আম কাঁঠাল বাঁশ সুপারি লতা ল্যানঠানা সব মিলিয়ে দু'পাশে বুনো বুনো ভাব।

পাহাড়ী জায়গা, শীতের সকাল। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে মুখে চোখে। আঁচলটা টেনে জড়িয়ে ধরেছি গায়ে।

পথের দু'ধারের মাটির বাড়ীগুলি ঠিক সাঁওতালদের বাড়ীর মতো; ঝক্‌ঝকে, নিপুণ।

ভোরে নড়ে উঠেছে গ্রাম নানা কাজে। পথে 'কুর্‌চা' আদিবাসী একদল তীর-ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে। 'পালসি' রাজার সৈন্য ছিল এরা এককালে। তীর-ধনুকে ওস্তাদ। ছেলেদের মাথার লম্বা চুল মাথার উপরে বাঁদিকে ঝুঁটি বাঁধা। মেয়েরা কাপড় পরেছে কাঁধের উপরে গেরো দিয়ে।

পথের মাঝেই তারা টপাটপ তীর ছুঁড়ে দেখিয়ে দিল তাদের হাতের টিপ। অব্যর্থ লক্ষ্য। খুব যে চোখ স্থির রেখে কায়দা-কানুন করে তীর ছুঁড়লো, তা' নয়। তীর-ধনুক তো হাতে আছেই, ছুঁড়তে হয় ছুঁড়ে দিল। গা' আলগা ভঙ্গী, তীর গিয়ে ঠিক লক্ষ্যস্থানে বিঁধে রইলো।

হাতের কাজেও নিপুণ এরা। বাঁশের কাজ চমৎকার। বাঁশ দিয়ে মিহি কাজ করে।

হাজার পাঁচেক 'কুর্‌চা', তারা এখানেই আছে সব। বন্য জন্তু মারে লোহার তীর দিয়ে, কাঠের তীরে মারে পাখী।

কুর্‌চা মেয়েদের কোমরে রুপোর ছোট ছোট মাদুলীর গোট। হাতের এক আঙুলে বারোটা চৌদ্দটা করে তামা-পিতলের রিং। হাতে পিতলের চুরি, গলায় কাঁচের মালা রুপোর পদক। বাঁ নাকে নাকছাবি, কানের গোল ফুটোয় কাঠের, রুপোর বা সোনার কানপাশা।

একটি কুর্‌চা যুবক ভীড়ের মাঝে নজর কাড়ে। ফর্সা রং, নীল চোখ। বিদেশীরা এসেছে বাণিজ্য করতে। চীনেরাও আসতো সিল্ক নিয়ে গ্রামে গ্রামান্তরে। কত কিছু মিশেছে মিলেছে এখানে ওখানে এমনি করে।

কুর্গে ঢুকি। কফি ক্ষেতের মাঝে কমলা বন। ছায়া দেয় ফলও দেয়। সবুজ কমলা সবুজ পাতার মতো ছেয়ে আছে গাছে গাছে। পাকেনি এখনো।

নারকেল গাছ কমতে কমতে কমে এসেছে।

শিমুল ফুটছে, পলাশ ফুটে আছে। সবুজ বনের শ্যামল মুখে থেকে থেকে যেন কুমকুমের টিপটি উঁকিঝুঁকি মারছে।

গাছে গাছে ভরা ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়, পাহাড়ের তলায় খানিক ধানক্ষেত-- আবার পাহাড়। এক পাহাড় ডিঙিয়ে নামছি আবার উঠছি, এই করে এগোচ্ছি। এর মাঝেই কুর্গ।

এদের চা আছে, রবার আছে, ধান আছে, কফি আছে, গোলমরিচও আছে। এদের লোক যুদ্ধে যায়, অফিসার হয়। মেয়েরা লেখাপড়া শেখে, বিদেশে যায়। কুর্গরা আদিবাসী। কৃশ্চান ধর্ম নেয়নি, কিন্তু বিদেশীদের অনুকরণ করে উঠে গেছে তাড়াতাড়ি।

জলা জায়গা হতে উঠে এলো একটা মোষ পথের মাঝখানে, কালো পিঠে আটকে আছে এক থোকা কচুরী পানা—কালো মেয়ের কালো চুলের খোঁপায় দেওয়া কয়টি সবুজ পাতার মতো।

কার কফি ক্ষেতের বেড়া—কি জানি; 'পয়েন সেটিয়া'র বেড়া, লাল লাল পল্লব, এটাই এর ফুল। মাইল অবধি পথের দু'ধার টুকটুকে লাল, যেন হেসেই কুটিকুটি।

'কাবেরী' পার হলাম।

কুর্গে 'আর্‌ম্‌স্‌ এ্যাক্ট' নেই। বন্দুক পিস্তল রাখতে লাইসেন্স লাগে না। ইংরেজরা এদের পছন্দ করতো, হাতী বাইসনের দেশ, এদের অস্ত্রশস্ত্র এমনিই রাখতে দিত। সেই হতেই এ নিয়ম চলে আসছে আজও। ছেলেদের কৃপাণ আজও সাজের অঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে রাখে।

'মারকারা' সহর কুর্গের রাজধানী ছিল, এখন কুর্গ মহীশূরে মিলে গেছে।

পাহাড়ের উপরে ছিমছাম সহর মারকারা। যোদ্ধার দেশ; জেনারেল থিমাইয়া, জেনারেল কারিয়াপ্পার বাড়ী এখানে। ছোট্ট এক পাহাড়ের উপরে ছোট একখানা বাড়ীতে কারিয়াপ্পা এখন কফি চাষ নিয়ে আছেন।

এখানে লুঙ্গি পরে কম লোকেই। বাস ট্যাক্সি মোটর লরীর ভীড় সহরে। বাজারে ভীড় দোকানে দোকানে।

গায়ে গায়ে লাগা বাড়ী সহরের মাঝখানে, যেমনটি হয় পাহাড়ী দেশে। আর চারদিকে ছড়িয়ে আছে নানা বাড়ী সৌখীন লোকের।

সহরের ধারে ভাঙি-পল্লী, নতুন তৈরী। টালির চালের বড় বড় চৌচালা বাড়ী সব। তার মাঝখানে সকলের মেলামেশার জন্য আলাদা একটি ক্লাব ঘর উঠবে। কেরেলায়ও দেখেছি এমন। সরকার হতে করে দিয়েছে স্থানে স্থানে।

এখানকার এই ক্লাব ঘর হবে পাহাড়ের একধারে। এখান হতে নীচের দৃশ্য, দূরের দৃশ্য অতি মনোরম।

যেখানে ঘর তোলা হবে সেইখানে আজ পূজা হচ্ছে ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে। চন্দনে কুমকুমে মাখা কোদাল গাইতি ঝুড়ি সামনে রেখে, কলাপাতায় নারকেল কলা ধূপ সাজিয়ে, ব্রাহ্মণ পূজা করছেন, মন্ত্র পড়ছেন। দেবদেবী নদনদী সবার আশীর্বাদ নিয়ে পূজাশেষে চন্দন কুমকুম মাখা আতপ চাল অঞ্জলি দিয়ে সেই কোদাল গাইতি দিয়ে ভূমি খোঁড়া হল। স্বামীই খুঁড়লেন।

কুর্গ কফির জন্য বিখ্যাত। চারদিকে কফির চাষ। এখানকার সকলেরই অবস্থা ভালো মোটামুটি।

কুর্গের মেয়েরা শাড়ী পরে অনেকটা পাহাড়ী মেয়েদের কম্বল পরার মতো করে। শাড়ীটা আমরা যেমন পিছনে কুঁচি দিয়ে পরতাম আগে, তেমনি করে পরে, আঁচলটা বুক ঘিরে পিঠ হতে এনে কাঁধের উপরে গিঁট বাঁধে, কেউ আটকে দেয় পিন দিয়ে। বেশ লাগে দেখতে। এভাবে শাড়ী পরাতে সবাইকেই যেন দীর্ঘাঙ্গী লাগে। কুর্গী মেয়েরা সুন্দরী। কুর্গীরা গিরিজন। গিরিজন কথাটা আজই শুনলাম। যাদের অস্পৃশ্য বলা হত তারা যেমন হরিজন, তেমনি আদিবাসী-দের বলে গিরিজন। শব্দটা মধুর।

সহরের একস্থানে পাহাড়ের উঁচু শিখরে—চার হাজার ফুট মতো হবে এখানটা,—এক বাঁধানো বেদী কুর্গী রাজার। এখান হতে সামনের দৃশ্য অতিশয় পায়ের গোড়ায় গোড়ায় যেখানে সমভূমি—সব ধানক্ষেত। উপর হতে পাহাড়ের

পায়ের গোড়ায় গোড়ায় যেখানে সমভূমি,—সব ধানক্ষেত। উপর হতে দেখায় সবুজ জলে থেকে থেকে কালো কালো গাছে ভরা ছোট ছোট পাহাড়ের দ্বীপ এখানে-ওখানে ছড়ানো যেন। দূরে রেখায় রেখায় কয়েক সারি পাহাড়ের চূড়া, ঘন নীল হতে হাল্কা হয়ে মিশেছে সন্ধ্যার আকাশে, মিলেছে মেঘের আড়ালে।

কুর্গী রাজা বসতেন উঁচুতে এই বেদীতে। লোকেরা দেখতো তাঁকে।

আর,—ছোট ছোট বাচ্চা হাতী গড়িয়ে ফেলে দেওয়া হত এইখান থেকে। শিশু হাতী চীৎকার করতো, কাতরে কাঁদতো। রাজার উল্লাস বাড়তো।

মানুষও নাকি ফেলে দেওয়া হ'ত তাদের শাস্তি দিতে।

ছোট ছোট পাহাড়ের মাথায় ছবির মতো বাড়ীগুলি। ছবির মতো গ্রাম। ছবির মতো পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাওয়া সবুজ ভূমি। ছবির মতো বন-বনানী পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে। বড় সুন্দর কুর্গ।

এদিকে ওদিকে পাহাড়ের চূড়ায় নবীন-নবীনার দল উঠেছে কত। কেউ বসে আছে, কেউ বা দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যাকালের আকাশে যেন স্তব্ধ মূর্তি সব।

গিরিজন, হরিজন, তাদের তুলতে হবে, জাগাতে হবে। সত্যিই তো, লোহার শিকলের একটি শিকল খারাপ হলে গোটা শিকল কাজের বাইরে চলে যায়।

দিকে দিকে স্কুল, হোস্টেল হয়েছে, হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি বাড়ী ছেড়ে হোস্টেলে এসে থাকে, দু'বছরে গড়গড় করে বই পড়ে।

বাইরে হতে কেউ দেখতে এলে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে।

মেয়েরা অনেক চালাক ছেলেদের চেয়ে। মেয়েরা লম্বা ঘাগড়া পরে প্রায় পনেরো ষোল বছর বয়স পর্যন্ত। উপর অঙ্গে একটি ব্লাউজ। কলেজের মেয়েরা শাড়ী পরে। লুঙ্গির অভ্যেস এরা ছেড়েছে।

মেয়েদের স্কুলে মেয়েরা হাতজোড় করে প্রার্থনা গাইলো: 'ত্বমৈব মাতা, পিতা ত্বমৈব।'

একটি চাঁপা ফুল দিয়েছিলেন হাতে, আসবার কালে বন্ধুপত্নী নিজ বাগান হতে তুলে। সোনার বর্ণ ফুল। খোঁপায় গুঁজে রেখেছিলাম। সারাদিন তার সৌরভ পেলাম। চুল খুলতে মিইয়ে যাওয়া সেই ফুল মেঝেতে পড়ে গেল—সুরভিটুকু লেগে রইলো চুলে।

....

'ব্যাঙ্গালোর'

....

কুর্গ ছাড়লাম।

লাল মাটি এখানে। কেরেলায়ও লাল মাটি বহুস্থানে। কেরেলার মাটিকে জলে ছায়ায় স্নিগ্ধ করে রেখেছে, শ্যামল আলিঙ্গনে ঢেকেছে। এখানে লাল ধুলো বেপরোয়া। পীচের রাস্তাও এসে দখল করে ধুলো। পথের ধারের কলাগাছের চওড়া পাতাগুলিও যেন সন্ন্যাসীর গেরুয়াবাস জড়ানো।

কেরেলায় চলেছি, যেন গৃহলক্ষ্মীর যত্নে লেপা আঙিনার উপর দিয়ে। দুচোখ

মেলে দেখতে দেখতে চলেছি, ক্লান্ত হয়নি চোখ। নতুন লেগেছে সবকিছু। এবারে যেন জানাপথ চেনাবন। পথের দু'ধারে চিরদিনের দেখা ধুলো জঙ্গল জনতা। থেকে থেকে চোখের পাতা বুজে আসে।

ম্যাঙ্গালোর রাজ্যে এসে পড়লাম।

প্রায় দশ হাজার 'কোরগা' আদিবাসী আছে এই অঞ্চলে। এরা সমুদ্রের দেবী—'মাসানী'দেবীর পুজো করে। মাসানীদেবী চামুণ্ডা। এদের ধর্ম—এরা এঁটো কুড়িয়ে খায়। কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খায়।

পথ চলেছে। ক্ষেতে কাজ করছে নারীপুরুষ, সবার মাথায় টুপী, কাঁসার বাটির মতো উপুড় করে বসানো। সুপুরীর খোল দিয়ে তৈরী টুপী মাথার খুলির মাপে মাপে। কপালের কাছটায় টিকলির মতো একটু নক্সা। কড়া রোদ্দুর এখানে।

আরো এগিয়ে পাই 'মারাঠী' গিরিজন। এরা মারাঠীই ছিল আসলে এককালে। শিবাজীর যোদ্ধারা পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে লুকিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তারাই শেষে গিরিজন হয়ে গেল।

নদীর ধারের ঢাল ধরে চলবার জন্য সরু পথ কেটেছে সদ্য সদ্য। ঝুরঝুরে কাঁকর মাটি ঝরে পড়ে পায়ের চাপে। সাবধানে নামলাম নদীর ধারে। 'পয়স্বিনী' নদী, স্ফটিক স্বচ্ছ জল। পায়ের কাছে পুঁটিমাছের ঝাঁক সাঁতরে বেড়াচ্ছে, লেজের কাছের কালো বিন্দুটি চমক দিয়ে উঠছে।

নদীর ওপারে 'আর্যাবর কৃষি কলোনী'। অতি ছোট্ট এক ডিঙি নৌকোতে দু'জন দু'জন করে পার হলাম। সঙ্গে সঙ্গে এক 'মারাঠী' সাঁতরে চলল,—যদি পড়ে যাই জলে। তাদের গ্রাম দেখতে চলেছি, কত তাদের দায়িত্ব।

সরকার হতে চাষের জমি পেয়েছে এরা। যার যার ক্ষেতের মাঝখানে তার তার বাড়ী। 'রাগি', টেপিওকা, ডাল, রাঙা আলু ক্ষেতভরা। গোবর নিকোনো পাথরের মতো শক্ত উঠোনে লাল লংকা, লাল কুদ্রুম শুকোচ্ছে রোদে। ঘরের কোণে রাগীদানা স্তূপ করা। গোবর-লেপা বাঁশের চাঁচের মটকা ভরা দানা। টুকরীতে টুকরী'তে চাকা চাকা করে কাটা শুকনো টেপিওকা। পচবে না গলবে না—সম্বচ্ছর থাকবে, প্রয়োজনমতো সিদ্ধ করে খাবে। ঘরের মেঝে, বারান্দা, ঝকঝকে লেপা পোঁছা,—শক্ত ঠনঠনে। ক্ষেতে, আঙিনায় আনাচে কানাচে ফুটে আছে করবী গাঁদা জবা দোপাটি। কিছু আপনা হতে হয়েছে, কিছু নিজের হাতে লাগানো। ফল ধরে আছে পেঁপে কলা গাছে। চালের বাতা হতে ঝুলছে চালকুমড়ো পাকা শশা। সারা বছর থাকে এই দুটো জিনিস; তরকারী রেঁধে খায়। ছোট আকারের চালকুমড়োর মতোই এই শশাগুলি। পেকে হয় হলুদ বর্ণ। ম্যাঙ্গালোরের মেয়ে বাণী একবার দিয়েছিল এর বীজ আমাকে। লাগিয়েছিলাম।

কয়েকটা শশাবীজ চেয়ে নিলাম এদের কাছ হতে। এবারে লাগাব শান্তি-নিকেতনের মাটিতে। সেবারে লাগিয়েছিলাম দিল্লীর বাড়ীতে। অঙ্কুর বের হল, লতা হল, সতেজ লতা ছড়িয়েও পড়লো। কিছুদিনের জন্য দিল্লীর বাইরে গেলাম, হুরলাল মালী কি যে করল—এসে দেখি ক্ষেত খালি। হুরলাল হেসে বলে, 'মরগিয়া, জড় শুক গিয়া'।—আপনি আপনিই শুকিয়ে গেল?

হুরলাল গোঁফ পাকিয়ে আরো একগাল হাসলো, বললো—জী হাঁ।

মারাঠী মোড়লের ছেলেরা ঝুড়িভরা ডাব নিয়ে এসে দা দিয়ে মুখ কেটে দিতে লাগলো। এত সুস্বাদু জল কেরেলাতেও খাইনি। নারকেলের মালা দু'ভাগ

করে দা-এর ডগা দিয়ে কচি শাঁস আলগা করে দিল, তুলে তুলে খেলাম। ক্ষিদে ঠান্ডা হল, তৃষ্ণা নিবারণ হল।

মারাঠীদের ডান পায়ে রুপোর রিং, দেবদেবীর কাছে মানত রাখতে পরে এটা।

আজই ভোরে কুর্গে আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি হবে হবে ভাব। ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপিয়েছিল গা। এখন নেয়ে উঠছি ঘামে।

এদিকটায় পোড়ামাটির হাঁড়িঘড়ার রং লাল নয়, কালো নয়; গোলাপী। টালির চাল গোলাপী। লালমাটি লেপা ঘরের দেয়াল গোলাপী। এখানকার রাঙা মাটির রং ফ্যাকাসে।

ঘরে ঘরে প্রতি টালির চালে দু'চারখানা করে কাঁচের টালি বসানো, আলোর জন্য। চালে দু' পরত টালি; টালি যেমন হয় বাইরের টালি তেমনি, ভিতরের টালি সমান—প্রতিটিতে নকসা কাটা। ঘরের ভিতর হতে দেখায় বড় সুন্দর। দু'পরতে টালি দেবার জন্য ঘর কম গরম হয়।

কুর্গ হতে ম্যাঙ্গালোর আসার পথে পাহাড়ের মাথাগুলি নেড়া; টাকের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা কোঁকড়ানো চুলের মতো বনবনানী।

'নেত্রবতী'র উপর দিয়ে পুল। এপারে ম্যাঙ্গালোর; কুর্গ হতে প্রায় পঁচাশি মাইল দূর। পুরাণে বলে, ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির দুই নাক হতে তুঙ্গ আর ভদ্রা বেরিয়ে কিছুটা দূরে এসে কৃষ্ণা নাম নিয়ে পড়েছে সাগরে। আর ঋষির নেত্র হতে বের হয়েছিল 'নেত্রবতী'। নেত্রবতী এখানে এসে মিলেছে আরব সাগরে। মোহানার মুখে ঝাঁক ঝাঁক সাদা রঙের পাল, জেলে নৌকোর পাল;—মাছ ধরছে জেলেরা।

শরতের ফুল পারিজাত—আমরা বলি শিউলি; এখন শীতের সুরু—কোথায় পেল এ ফুল? ড্রাইভার এনে রেখেছে কয়েকটা ফুল মোটরের ঘড়িটার উপরে। মহীশূরের সোস্যাল ওয়েলফেয়ারের উপমন্ত্রী চলেছেন সঙ্গে, সামনের সিটে বসেছেন, একটি ফুল তুলে নিয়ে শুঁকতে লাগলেন। বললেন, আয়ুর্বেদী শাস্ত্রে আছে পারিজাতের সৌরভ হার্টের পক্ষে ভালো, হার্টের রোগীদের পক্ষে ভালো।

এখানে মেয়েদের চুলে সাজানো ফুলের গোড়ে মালা। পরনে রঙীন শাড়ী।

ম্যাঙ্গালোর বন্দর; বড় আর নোংরা সহর।

বিকেলে 'গুরুপুর' নদীর ধারে আসি। কথা ছিল স্টিমারে সমুদ্র বেড়াবার। শুনি, সমুদ্রের জল অসম্ভব নেমে গেছে; আজ সকালে সূর্যগ্রহণ ছিল। মোহানার মুখে বালি ঠেকবে।

গুরুপুর নদী এখানে সাগরে পড়েছে, নেত্রবতীও অন্য পথ দিয়ে এসে একই মুখে সাগরে মিলেছে। সমুদ্রে হল না,—গুরুপুর নেত্রবতী দুই নদীতে স্টিম লঞ্চ করে ঘুরে বেড়ালাম।

হাজারে হাজারে শঙ্খচিল মোহানার মুখে বালির চর ছেয়ে বসে আছে সাদা সাদা বুক নিয়ে। যেন সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে এসে অগুণতি শ্বেত শঙ্খ জমেছে চড়ার বালিতে।

নদীর পারে স্তূপকরা পাথরের টুকরোর পাহাড়। যে পাথরে লোহা মেশানো থাকে সেই পাহাড় ভেঙ্গে টুকরো করে এনে রেখেছে এখানে। এই পাথর গুঁড়ো করে গালিয়ে কত কান্ড করে, তবে লোহা আলাদা করে বের করে এ হতে। দেশে বিদেশে কত শত বিরাট বিরাট এই লোহা তৈরীর কারখানা।

এদেশের লোহার পাথর এই নদীর ধারে এনে রাখে। এখান হতে নৌকোয়

করে স্টিমারে তোলে। স্টিমার যায় বিদেশের নানা স্থানে।

এই নদীর ঘাটে আসে না স্টিমার, মোহানার বাইরে সমুদ্রে থাকে নোঙর ফেলে। জাহাজের মতো বড় বড় মালবাহী নৌকোও টালি পাথর নিয়ে যায় সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ভারতের নানা স্থানে। ছোট বড় বহু পাল মাস্তুল এক একটা নৌকোয়। মাঝখানে যে বড় মাস্তুল—যাতে বড় পালটা ওঠে, সেটাতে চারটা সাড়ে চারটা সেগুন গাছ পর পর আটকানো উপর দিকে। ততখানিই উচ্চতা তার। কতকগুলি কপিকল দিয়ে দড়ি টেনে টেনে তবে পাল তোলে তার। মোটা কাপড়ের পাল। এরা কেউ যায় লাক্ষা দ্বীপে, কেউ গুজরাটে, কেউ বা আর আর কোথাও। সব নৌকোয় আলাদা চিহ্ন, দূর হতে বোঝা যায় কোথাকার নৌকো।

ম্যাঙ্গালোরের মাছ যায় দেশের বহু স্থানে। জাপানীদের সহযোগিতায় মাছ ধরবার, মাছ চালান দেবার, নানা কৌশল শিখবার শেখাবার স্থান এখানে। মস্ত তার বাড়ী নদীর তীরে।

বন্দরে সহরে ব্যস্ততা তো থাকবেই, এখানেও আছে।

ঠিক করলাম এসেছি যখন, বাণীর মার সঙ্গে দেখা করে যাবো। ম্যাঙ্গালোর সহর হতে কিছুটা দূরে এক গ্রামে থাকেন তিনি। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ আমাদের দেখে কত না অবাক হবেন। বাণী যখন শান্তিনিকেতনে পড়ত, বাণীর মা বাবা এসেছেন সেখানে। দিল্লীতেও বার কয়েক দেখা হয়েছিল। হাসিমুখ মহিলা, ছোটখাটো গড়ন, রঙীন শাড়ী পরনে; সব জড়িয়ে যেন একটি লক্ষ্মীশ্রী। নিজ ভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা জানেন না; কিন্তু ভাবে আলাপে আটকায়নি আমাদের। বাণীর মাকে দেখলেই আমার স্বামী প্রতি কথায় 'ব' 'ড' শব্দ জুড়ে তাঁর সঙ্গে তামিলনাদে গল্প জুড়ে দিতেন, আর ভদ্রমহিলাও 'লো' 'লি' করে বাংলা বলার ছলনা করে হেসে কুটিকুটি হতেন। কয়েকমাস আগে বাণীর বাবা মারা গেছেন। গ্রামের মধ্যে মেজ ছেলের 'ফার্‌ম্‌ হাউসে' ছেলে-বৌর সঙ্গেই থাকেন।

পথঘাট জানা নেই, ঠিকানা জানি শুধু। সঙ্গীরা বলেছিলেন, কাছেই এই গ্রাম, ঘণ্টাখানেকও লাগবে না যেতে। সেইমতো হিসেব করে, সারাদিনের কাজ সারা হলে, বিকেলে রওনা হলাম মোটরে।

ম্যাঙ্গালোর সহর পার হলাম, পাকা পথ শেষ হল। গ্রাম পার হলাম, লাল ধুলো সাথে উড়ল। পুর পার হলাম, ধানক্ষেতের ধারে পড়লাম। কিন্তু বাণীর মা'র গ্রামের পথ কোনটা? বিকেলে গ্রামে মাঠে সবাই ঘরমুখী। বিকেলের আলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল সবার ললাট। আলো থাকতে থাকতে সে গ্রামে যাওয়া চাই, ঘর চিনে বের করা চাই।

পড়ি মরি করে ছুটছে গাড়ী। ধুলোয় ধুলোয় ঢাকা চারদিক। কখন সন্ধ্যে নেমে গেছে তফাৎ বুঝিনি কিছু। তবু এক সময়ে বাণীর মা'র গ্রাম পেয়ে গেলাম।

ধুলো ভরা সরু পথ; দু'ধারে মাটির দেয়াল, যার যার বাড়ীর সীমানা নিয়ে। এঁকে বেঁকে পথ ধরে চলেছি। লণ্ঠন জ্বালিয়ে বসে আছে মুদির দোকানে দোকানী, তাকে জিজ্ঞেস করি,—সে ডাইনে বামে, বামে ডাইনে হাত ঘুরিয়ে পথ দেখিয়ে দেয়। বাণীর বাবা ডাক্তার ছিলেন, সবাই চেনে তাঁকে। তাঁর ছেলের বাড়ীও কারো অচেনা নয়।

কিন্তু এ যে চলেছি—মনে হচ্ছে যেন গ্রাম ছাড়িয়ে চলেছি। দূরে চলে যাচ্ছি না তো? খোলা জমি, অন্ধকার বন, দূরে টিমটিম বাতি জ্বলছে চালাঘরে, গ্রামের

সেই ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ী কৈ? ড্রাইভারকে বললাম নেমে টর্চ নিয়ে—ঐ যে দূরে কার কুটিরে আলো দেখা যায়, সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, এ পথ গেছে কোনখানে, আর সেই গ্রাম আছে কোথায়?

এমন সময়ে দুটো বলদ তাড়িয়ে লাঙল কাঁধে নিয়ে দুজন লোক পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে লোক পেলাম পথে, বাণীর বাবা ভাইদের নাম বলতে লাগলাম। হঠাৎ কি বুঝলো একজন, বলদ দু'টো অন্য লোকের হাতে সঁপে আমাদের গাড়ীতে উঠে বসলো। জানালো, গাড়ী ঘুরিয়ে চল। এগিয়ে যাওয়া অনেকখানি পথে আবার ফিরে আসি।

বিরাট খামার বাড়ী। সন্ধ্যে উতরে রাত হয়ে গেছে। গেটের সামনে স্বামীর মোটা গলায় নিজ রচিত পরিচিত 'ব, ড' শব্দের ভাষা শুনে বাণীর মা দৌড়ে এলেন। এসে হেসেই অস্থির স্বামীর অনর্গল কথা শুনে। একবার তাঁকে জড়িয়ে ধরে হাসছেন, একবার আমাকে জড়িয়ে ধরে হাসছেন। এ হাসির তুলনা নেই। বাণীর মা আমাদের চেয়ে বয়সে বড়, এখনো তাঁর সেই কচিকচি মুখ, সেই মিষ্টি হাসি, যেমনটি দেখেছিলাম প্রথম বারে তাঁর স্বামীর পাশে সুখী-মুখখানার হাসি।

বাণীর বড় ভাই দিল্লীতে কাজ করত, এখন আমেরিকায়। বড় মেয়ে দু'টি এখানে ঠাকুরমার কাছে থাকে, ম্যাঙ্গালোরে কলেজে পড়ে। রোজ যাওয়া আসা করে।

বাণীর বড় ভাই একটা প্লাষ্টিকের 'বনবন' চেয়ার পাঠিয়েছে মা'কে, এতে বসা যায় শোওয়া যায়। সেটা বের করে বাণীর মা আমার স্বামীকে জোর করে বসালেন তাতে। বললেন, শুয়ে পড়, আরাম কর—অনেকখানি পথ এসেছ।

বাণীর মা কথা বলেন তাঁর নিজ ভাষায়; কিন্তু তাঁর কথা আমরা সব বুঝি, যেমন তিনি বোঝেন আমাদের কথা। এ নিয়ে কত হাসাহাসি করেছে ছেলে-মেয়েরা।

বিজলী বাতি জ্বলছে, ক্ষীণ আলো। বাণীর মা টানতে টানতে নিয়ে গেলেন গোশালায়। গোবর দিয়ে গ্যাস করে সেই গ্যাসে রান্না হয় রান্না ঘরে, বাতিও জ্বলে। বড় সংসার নাতি-নাতনী বৌ-ছেলে নিয়ে বাণীর মার। বাড়ী ভরা নারকেল গাছ, তার পরেই ক্ষেত। নারকেল হতেও প্রচুর আয় হয়, ক্ষেত থেকেও হয়। ডেয়ারী হতেও আয় হয় অনেকটা। মেজ ছেলেরই ঝোঁক 'ফার্মিং'-এ। সারাদিন সে এই নিয়েই থাকে। জীপ, ট্রাকটর সবকিছুই আছে। বাড়ীটা শস্য দানা খৈল ভূষির জন্যই যেন। মানুষেরা থাকে এসবের ফাঁকে ফাঁকে। বাড়ীতে রেডিও আছে, সেলাইর কল আছে;—সবই পড়ে আছে খোলা বারান্দায়—নারকেল স্তূপের মাঝে, ধানের বস্তার উপরে।

বাণীর মা আমাদের নিয়ে কি করবেন ভেবে পান না। ছাড়তে চান না কিছুতে। মিঠাই মণ্ডা খাওয়ালেন, কফি খাওয়ালেন; ঘরে ভাজাভুজি যা ছিল পোঁটলা বেঁধে সঙ্গে দিলেন। বললেন, কত জায়গা ঘুরবে, যেখানে যেখানে ক্ষিদে পাবে খাবে।

বাণীর মা কল্পনায়ও আনেননি যে, আমরা এভাবে একদিন তাঁর কাছে এসে হাজির হব। চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে তিনি আমাদের বিদায় দিলেন।

অনেকখানি রাত হয়ে গেল ফিরতে। লাল ধুলোয় সাধু সেজে ফিরলাম।

'আগুম্বে' মনিপাল, শৃঙ্গারি মঠ

ম্যাঙ্গালোর ছেড়ে কিছুদূর এগিয়ে 'সুরাটকল বিচ' দেখতে নামলাম।

ছোট্ট বিচ ছোট ছোট খাঁজে ঘোরানো। ছলাৎ ছলাৎ করে সবুজ জলের ছোট ছোট ঢেউ এসে লাগছে তীরে, লাগছে ঝকঝকে বালির উপরে। পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দেখছি। ঢেউ দেখাও একটা নেশা। মনে হয় আর একটা দেখি, আর একটা।

সাগর জলের গতাগতির কি নির্দেশ কি জানি। ম্যাঙ্গালোরের সংগী বললেন, এই বিচের এই বিশেষত্ব, এই যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এই খাঁজটাতে জলে ডুবে যাওয়া যা কিছু, সব এসে ঠেকে। জাহাজ ডুবল, ডুবোজাহাজের ভাঙা অংশ এইখানে এসে ঠেকবে। কেউ ডুবে মরল, তার লাস এইখানে আসবে। যা কিছু এই সাগরে পড়বে এইখানে এসে পারে লাগবে।

'কোরগা'দের স্কুল দেখে উদিপি হয়ে 'মনিপাল'-এ এলাম।

উদিপিতে মধ্বাচার্য শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শুনেছি এই মূর্তি তিনি পেয়েছিলেন এক বিদেশী নৌকো হতে। শ্রীচৈতন্যদেব এসেছিলেন উদিপিতে, এই কৃষ্ণমূর্তি দর্শন করেছিলেন। মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ উদিপি নগর।

পাথরে মাটিতে মেশানো পাহাড়ের মাথায় মনিপাল। বিরাট লোকালয়। ব্যাঙ্ক, মেডিক্যাল কলেজ সবই স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'ডাক্তার পাই'-এর একা আপন হাতের তৈরী এই বিরাট প্রতিষ্ঠান। কর্মের যোগ্যতা নিয়ে নারীপুরুষে তফাৎ নেই। বিবাহিত গৃহলক্ষ্মী, কুমারী কন্যা তারাও কাজ করছে পুরুষের সমান সমান হয়ে। ডাক্তার পাই আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছেন সব। ব্যাঙ্কে কাজ করছিল মেয়েরা। বললেন,—এই যে ঘর ভরা সব মেয়েরা কাজ করছে দেখে কি গর্ব হয় না মনে বোন?

খুব বেশী লেখাপড়া জানারও দরকার হয় না। ডাঃ পাই বলেন, এক দুই তিন গুনতে বিদুষীর প্রয়োজন করে না। অল্প কিছু শিক্ষা থাকলেই হল।

এই-ই বোধহয় প্রথম ব্যাঙ্ক যেখানে দু'আনা দিয়েও ব্যাঙ্কের বই খোলা যায়। ডাঃ পাই বললেন, কত দীন দুঃখী মজুরের স্ত্রীরা কান্নাকাটি করে। তাদের স্বামীরা যেটুকু রোজগার করে দিনশেষে মদ খেয়ে অর্ধেক উড়িয়ে ঘরে ফেরে। সেইসব চাষা মজুররা দু'আনা চার আনা যা তারা মদ খেয়ে ওড়াতো আজ আসে তা এখানে জমা দিতে। তাদের সেই খুসী মুখ দেখলে আমার সকল শ্রম সার্থক হয়ে যায়।

মেডিক্যাল কলেজের জন্য যে যাদুঘর এখানে, দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। ডাঃ পাই বললেন, শুধু দেশে কেন বিদেশেও আছে খুব কমই এমন যাদুঘর। এটা আমাদের একটা গর্ব করার বস্তু।

ঐ যাদুঘর ঘুরে ঘুরে দেখলেও ডাক্তারী জ্ঞান অনেকখানি আপনা হতেই হয়ে যায়। স্বচ্ছ কাঁচের জারে রসায়নে ডুবিয়ে রাখা নরনারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভ্রূণ ব্যাধি—কত কী। একটা জারে মাঝামাঝি করে কাটা আধখানা মাথা,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, যা জানি না তা দেখছি, যা দেখি না তা দেখছি। অবাক হচ্ছি।

ভাবছি এর উপরে মাংস চামড়া, চোখ মুখ নাক কপাল,—তাই নিয়ে সুন্দর অসুন্দরের কত না বিতণ্ডা।

ডাঃ পাই হঠাৎ জারটা ঘুরিয়ে দিলেন, রসায়নটা ছলকে উঠল। বললেন,—দেখ, আসল মানুষটা কেমন ছিল।

পুরু ঠোঁট, বোঁচা নাক, ক্ষুদে চক্ষু, আধখানা মুখের সবটা। এক আদিবাসীর মুখ। পুরো অঙ্গ, আধখানা অঙ্গ, পরতে পরতে কাটা অঙ্গ;—এত শবদেহই বা পান কোথা হতে এঁরা?

ডাঃ পাই বললেন, মেডিক্যাল কলেজে 'আনক্লেম্‌ড্‌' মৃতদেহ তো পাই-ই, তাছাড়া বেশীর ভাগ পাই আদিবাসীদের কাছ হতে। মৃতদেহ পোড়াতে কাঠ লাগে, তাদের সেই পয়সা নেই। তারা এসে লাসটা দিয়ে যায় আমাদের, পরিবর্তে আমরা তাদের টাকা দিই। দু'পক্ষই লাভবান হই।

স্বামী বললেন, আচ্ছা, আপনার এই মেডিক্যাল কলেজে কত পার্সেণ্ট 'ফেইলিওর' হয়।

ডাঃ পাই যেন চমকে উঠলেন, আহত হলেন। বললেন,—ফেইলিওর? ফেইলিওর কেন হবে? এক এক বছরে এক একটা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে ছাত্ররা। প্রথম বছরে হয়তো দাঁত নিয়ে জ্ঞানলাভ করল, কি, দ্বিতীয় বছরে চোখ নিয়ে। পরে হয়তো আর পড়লো না সে। কিন্তু যতখানি পড়লো ততখানি জ্ঞানলাভ সে করলো, সেটা তার থাকল। তবে 'ফেইলিওর' কি করে হল?

ব্যাঙ্কের উপরতলায় মস্ত এক হল, সেখানে দুপুরে খেলাম সবাই। ডাঃ পাই-ই খাওয়ালেন আমাদের। লম্বা টেবিলটা ভর্তি খাবার। ডাঃ পাই বললেন, আমার এই ব্যাঙ্কের মেয়েরাই রেঁধেছে সব। ব্যাঙ্কে তারা মাইনে করা কর্মী মাত্র নয়, তারা জানে তাদেরই ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের অতিথি, তাদেরই অতিথি। সকল রকমের দায়-দায়িত্ব সকলে সমানভাবে নেয়। আমি কেউ নই, আমি কিছু নই। আমি শুধু পথ বলে দিয়েছি মাত্র।

এত রকম খাবার থাকতে বেগুন আবার কি খাব? বেগুনের তরকারীটা নিচ্ছি না দেখে তিনি তরকারী তুলে দিলেন প্লেটে। বললেন,— এ তল্লাটে যে আসে সে-ই এই বেগুন খায়। এখানকার এই বেগুনের খুব খ্যাতি। সবুজ বেগুন, গায়ে হাল্কা ঘন সবুজে ডোরা কাটা। বেশ বড় হয় বেগুনগুলি। এখনকার এই বেগুনের উপর বর আছে প্রভুপাদের। তাই খুব সুস্বাদু।

কাহিনী আছে সেই প্রভুপাদকে বিষ দিয়েছিল লোকে। একচল্লিশ দিনে সেই বিষ যায়। ভক্তের বিষ দেবতা তুলে নিয়েছিলেন। বিঠলদেবের গলার কাছে এখনো একটু নীল দাগ আছে,—সেই বিষের।

মনিপালের মাথার উপর দাঁড়িয়ে চারদিকের বিস্তীর্ণ ভূমি দেখলে আপনার মধ্যেই আপনাকে যেন উঁচু লাগে। ডাঃ পাই বললেন, এইজন্যই এই পাহাড় বেছে নিয়েছি। বসতির নোংরামি হতে, জনমানবের কোলাহল হতে, দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা হতে এ যেন অনেক উপরে। সবাই বলেছিলেন, রুক্ষ পাথর, উপরে জলের কষ্ট হবে, ভালো মাটি পাবে না ফসল ফলাতে। বলেছিলাম, চেষ্টায় কি না হয়। মানুষ ইচ্ছে করলে কি না করতে পারে? এখন এখানে কেমন সহর উঠে গেছে, কত প্রাসাদ বাড়ী বাগান, স্কুল কলেজ ছাপাখানা,—নেই কি?

মনিপালের গেষ্ট হাউসে বিশ্রাম নিয়ে 'আগুম্বে' আসি। রাত্রে থাকব এখানে। আগুম্বের 'উঁচু পয়েণ্ট' হতে সূর্যাস্ত দেখা সৌখীন ব্যাপার।

আগুম্বে ছোট পাহাড়, তাও আজ মেঘে ঢাকা। নীচে বৃষ্টি হচ্ছে। আরো উপরে উঠলাম। মেঘগুলি নীচে নেমে রইল। উপর হতে দেখছি নীচে মেঘে ঢাকা মাটি, ভাবছি নীচ হতে যদি কেউ দেখে আমাদের, দেখবে যেন মেঘলোকে যক্ষ কিন্নর উড়ে বেড়াচ্ছি।

'সানসেট পয়েন্টে' এলাম। সূর্যাস্ত দেখার জন্য এতদূরে আসা, মেঘাচ্ছন্ন সব। কোথায় মাটি সাগর কোথায় বা সুনীল অম্বর। চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখি সব একাকার, কেবল সামান্য একটু লাল রঙের রেখা অসীম শূন্যে। ঐখানেই সূর্য অস্ত গেল বুঝি-বা।

আগুম্বে হতে ষোল মাইল দূরে শৃঙ্গারী-মঠ। পাহাড়ের কোলে তুঙ্গ নদীর ধারে মন্দির। ভদ্রা গেছে আর একদিক ঘুরে। মন্দির হতে সাত মাইল দূরে শৃঙ্গ-গিরি—শৃঙ্গারি। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি বহুকাল ছিলেন এই পাহাড়ে, তপস্যা করতেন। সেই নামেই শৃঙ্গারি-মঠ। শঙ্করাচার্যের চার মঠের এক মঠ।

রাত্রি, বিজলী বাতির সারি মন্দিরে বাইরে ছড়াছড়ি। বিজলী বাতির পদ্ম লাল হলুদ সবুজ আলোর পাঁপড়ির। পাথরের থামে হাঁ-করা সিংহের মুখ হতে ঝুলছে বিজলী বাতি।

চুনী রং-এর শাড়ী পরনে সোনার বরণ সারদাদেবী রুপোর সিংহাসনের উপর। কালো পাথরের গর্ভমন্দির। মন্দির ঘিরে আরো নানা মন্দির পাথরের।

বিদ্যাশঙ্কর মন্দিরে বারো রাশির বারোটি থাম। যে মাসে যে রাশি, সূর্য সেই থামে রশ্মি ফেলে একই দরজা দিয়ে।

নদীর ওপারে মধ্বাচার্যের বাড়ী। বাড়ীর আলো নদীর জলে পড়ে ফুল ফুটে আছে মন্দিরের চরণ ঘিরে।

সেই কালো জলে একটি প্রণাম লুটিয়ে পড়ে।

....

হীরেমনে

....

কাল রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে, শুয়ে শুয়ে শুনেছি। পথের ধুলো আজ নম্র। সূর্যের আলো স্নিগ্ধ।

গ্রামের নাম 'গুণ্ডেকেরী', মানে পাহাড়ের কাছে, ভদ্রমহিলার নাম কাডম্মা, মানে বনদেবী। কাডম্মাদেবী একজন সোস্যাল ওয়ার্কার, গুণ্ডেকেরী গ্রামে মেয়েদের এক স্কুল পরিচালনা করেন, হাতের কাজ শেখান। এখানে থামতে হল, দেখতে হল।

ধান পাকতে সুরু হয়েছে ক্ষেতে। চারদিকে এ বছর বৃষ্টি কম। কাডম্মা-দেবী বললেন, চারমাস পরে কাল বৃষ্টি হল।

পথে আবার থামতে হয়। জেলে গ্রাম, চব্বিশ ঘর জেলে নিয়ে। লাউ-এর খোল, জোড়া টিন বেঁধে তাতে বুক ভাসিয়ে তুঙ্গভদ্রাতে জাল ফেলে মাছ ধরে। ঘর বলতে কোন মতে মাথার উপরে খড়ঘাসের চালমাত্র। মেঝে বলতে মাটির

ঘাস, চারদিক খোলা। ভাতের হাঁড়ি, পিতলের ঘটি এইমাত্র বাসন। একমাত্র কাঁথা গায়ে দিতে। তলায় পেতে শুতে একটি মাত্র তালাই।

সাঁতার কাটাই জীবিকা ছেলেদের। দিন'ভর স্রোতের টানে ভাসে। মেয়েরা লম্বা ছিপছিপে।

খলুইতে ছিল দু'টো মাছ, ফলি আর বাটা। দু'টো মাছে আধসের আড়াই পোয়া হবে। বলল দু'আনা করে এক একটা। আগে মাছে দাম পেত, এখন ম্যাংগালোরে মাছ ধরার কায়দাকানুন হয়ে এদের বাজার মন্দা হয়ে গেছে।

রাজবাড়ীর অন্ধি-সন্ধির মতো দেশের আনাচে-কানাচে আদিবাসীদের জন্য ঘুরে ফিরছি স্বামীর সঙ্গে। যেখানে থামতে হবে, যে পথে মোড় ঘুরতে হবে, দেখলেই বুঝি। গাঁয়ের লোক যত্নে একটু পথ সাজায়, দড়িতে আমপাতা বেঁধে ছোট্ট একটা গেট বানায়, স্বাগতম্ জানায়। নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে হাতে লেবু দেয়, ফুল দেয়। মেয়েদের কপালে কুমকুম চন্দন দেয়। 'সিমাগো'তে পান সুপারীও দিল ফুল লেবুর সাথে। মেজেণ্টা রং-এর সন্ধ্যামালতী দিল একজন হাত ভরে।

সিমাগো সহর। সহর হতে আট মাইল দূরে সেগুন বনের ভিতরে থাকে মারাঠী গোয়ালারা। এরা মোষ পালে, মোষের দুধ বিক্রি করে। বনে বনেই থাকে। বনবিভাগের তাড়া খেলে বনের মাঝেই স্থান পরিবর্তন করে, বনের এদিক হতে ওদিকে গিয়ে খুঁটি গাড়ে। হয়রান হয়ে বনবিভাগ হাল ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে হুমকি দিয়ে বনবিভাগের লোক টাকা আদায় করে নেয়,—এও এদের একটা নালিশ।

এদের দলের সর্দারের ঘরের সামনে এসে থামলাম। গাট্টাগোট্টা গোলগাল চেহারার পুরুষ, পরনে লেংটি, গায়ে সার্ট, মাথায় পাগড়ি। দু'কানে সোনার রিং। মোষ পেলে দুধ বেচে এরা বেশ রোজগার করে, কিন্তু রাখতে নাকি পারে না। বলে, সবই বনবিভাগের লোক নিয়ে নেয়, পঞ্চাশ একশ' যে যেমন পারে। নয়তো চালান দেনে ভয় দেখায়। একটা দু'টো মোষ আটকে রাখে কখনো কখনো।

সর্দারের নিজের আছে গোটা চল্লিশেক মোষ। ঘরের পাশে সেগুন ডাল দিয়ে ঘেরা খোঁয়াড়ে আছে বাচ্চা মোষগুলি। মা-মোষদের নিয়ে গেছে বনের গভীরে চরাতে। সেগুন গাছগুলি হল খুঁটি, মোষ বাঁধা থাকে একটা-একটাতে।

দোচালা লম্বা ঘর সর্দার গোয়ালার। বনের মাঝে ঘর বনেরই উপযুক্ত, বাঁশের ফাঁক ফাঁক বেড়া দেওয়া ঘর। সেই লম্বা ঘরই সেই রকম ফাঁক ফাঁক বেড়া দিয়ে আলাদা আলাদা করা। এক পাশের শেষ ঘরটা রান্নাঘর। কয়েকটা চকচকে পিতলের হাঁড়ি ভরা জল, উনুন, থালাবাটি রান্নাঘরে। তারপর মাঝখানে দু'টো ঘর শোবার ঘর বোধ হল। আধা পার্টিশন বেড়ার উপরে কাঁথা কাপড় তুলে রাখা। আর সামনের অংশটুকু সর্দারের বৈঠকখানা।

একটা ঢোল ঝুলছে বেড়ার গায়ে। সন্ধ্যে রাতে সকলে মিলে ঢোল পিটিয়ে গান ভজন করে। লম্বা ঘরের একটি মাত্র দরজা সামনের দিকে শুধু।

সর্দারের দুই বৌ। ছোট বৌ বন হতে বেরিয়ে এলো মাথায় পিতলের ঘড়া ভরা জল নিয়ে, বনের ভিতরে ঝরনার নালা। জল আনাটাই একটা বিশেষ কাজ। দিন থাকতেই সারতে হয় সারাদিনের জল আনা। সর্দারের বড় বৌ বোবা কালা। নয় বছর পরে বৌর ছোট বোনকেও বিয়ে করেছে, দু'বছর হল। ছোট বৌর নাকে কানে সোনার গহনা সোনার চেন দিয়ে চুলে আটকানো। স্যাকরা এসেছে, আরো গহনা হবে তার কানের। দুই বোনেরই দোহারা চেহারা। বড়বৌ শিশুসন্তানটিকে

কোলে নিয়ে এসে দাঁড়ালো একপাশে। বোবাদের নাকি মুখে কোনো ভাব থাকে না, এর কিন্তু মুখখানি বড় করুণ মনে হল।

পথের দু'ধারে কেবলি চন্দন গাছের বন। বনে বাগানে সব গাছেরই একটা রূপ আছে, ছন্দ আছে; তার বর্ণনার বস্তু আছে। কিন্তু চন্দন গাছের তা' নেই। কোনো ছন্দে সে পা ফেলে না, কোনো রূপ-বর্ণনার ধার ধারে না। এলোমেলো ডাল, এলোমেলো উঠবার ভঙ্গী। অস্থিমজ্জায় এত যার সুরভি, তার এ কী আচরণ। ঘোমটায় ঢাকা বৌ যেন কোদালে-কুড়ুলে পা ফেলে ফেলে চলেছে, দেখতে মনটা শিউরে ওঠে।

দিকে দিকে আখ কাটার ধুম পড়ে গেছে। শরতের কাশ ফুলের মতো ক্ষেত-ভরা আখের ফুল। এই ফুল নানা রঙে রাঙিয়ে বিক্রি করে বাজারে। লোকেরা সখ করে সাজিয়ে রাখে বসবার ঘরে। ঐ ফুল বাসি হবার নয়, শুকিয়ে যাবার নয়—তলায় ঝরে পড়বারও নয়। পুরোনো হলে, হাওয়া লাগলে উড়ে যায় হাওয়ার সঙ্গে। তখন আর কেউ পারে না ধরে রাখতে।

'হীরেমনে' আদিবাসীদের গ্রাম, ছোট্ট গ্রাম। উনিশ ঘর বসতি। বাড়ী ছিল না এদের কারো। এরা বাড়ী করে সংসার পেতেছে, বাড়ীকে সুন্দর করে রেখেছে। মাটির দেয়াল, খড়ের চাল। লাল মাটি কালো মাটি দিয়ে লেপা দেয়াল। মেঝে ঘষে ঘষে তেল-চকচকে করে তোলা। যার যার ঘরের সামনের পথটুকুও আপন আপন হাতে লেপা।

ঘরের ভিতরে পরিপাটি সংসার। আপন অঙ্গের অলঙ্কারের মতো যত্ন এদের ঘরের,—কতকালের গৃহহারাদের আশ্রয়। কত আদিবাসী ঘুরে দেখলাম, তাদের ঘর দেখলাম, গ্রাম দেখলাম; এমনটি আর দেখিনি কোথাও।

উঁচু দাওয়ার ঘর। ঘরের ভিতরে লক্ষ্মী সরস্বতী দেবদেবীর ছবি, একটি ধুপকাঠি, একটি মাটির প্রদীপ ঘরখানিতে শুভশ্রী এনে দিয়েছে। ঘরের ভিতরে ভাগে ভাগে ঘর ভাগ করা—আপন আপন পছন্দমতো। পিছন দিকে ঢাকা বারান্দা। নিজের হাতে তোলা ঘর, কার্পণ্য নেই পছন্দের।

ঘরের পাশের গাছটি, খেলাঘরের মতো মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা তার গোড়া। শুকনো সুপারী গাছ দু'ফাঁক করে কাটা, নালির মতো। ঘরে উঠবার আগে পা' ধোওয়ার জলটুকু সব সেই নালি দিয়ে যায় নারকেল গাছের গোড়ায়। এক গণ্ডূষ জল বৃথায় যেতে পায় না।

দাওয়ার একধারে মুরগীর ঘর, দাওয়া কেটে করা। কাঠের তক্তা ফেলা ছোট্ট দরজা, দাওয়ার সঙ্গেই মিশে থাকে ঘর। পরিপাটির হাত সবেতে। ঘরের মেঝে মনে হয় যেন শক্ত সিমেণ্টের। সকলের ঘরের সামনে দিয়ে একই কাটা নর্দমা, সবাই সবার ঘরের সামনের নর্দমাটুকুও লেপে রাখে গেরি মাটি দিয়ে। এ নর্দমায় কেবল বর্ষার জল যায়। মনে হয় পা ঝুলিয়ে বসি দাওয়ায় নর্দমায় দু'পা রেখে।

এরা ছিল সবাই ক্ষেতের মালিকদের মজুর। অতীত কাল হতে বংশানুক্রমে এরা জমির অধিকারীর কাছে বাঁধা। হয়তো কখনো টাকা ধার নিয়েছিল, তার বদলে 'খাটুনী' দিচ্ছে, সেই 'খাটুনী' দেওয়া বংশপরম্পরায় চলে আসছে। কেউ আর হিসেব করে না তা' নিয়ে। এরা কাজ করে তাদের, তারা খেতে পরতে দেয় এদের। তাদের মাটিরই আনাচে-কানাচে পড়ে থাকে রাতে। আজ এরা আপন আপন ঘর করেছে, সন্তানদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে, নিজেরা দিনমজুরী খাটছে। কেউ কেউ আবার থেকেও গেছে আগের মতোই, প্রভুর ক্ষেতের কাজ নিয়ে।

গ্রামেই স্কুল, গ্রামেই হোস্টেল। স্কুলের মেয়েদের পরনে ঘাগরা ব্লাউজ, কপালে টিপ, বিনুনীতে ফুল। ছেলের পরনে হাফসার্ট হাফপ্যাণ্ট।

এদের ক্লাবঘর গ্রামের ঠিক মধ্যিখানে। ক্লাবঘরের দু'দিক হতে দু'সারি ঘর উনিশ গৃহস্থের। গ্রামের মাঝখানের অঙ্গনটুকুতে পাত্রাবাহার চামেলী মল্লিকার বাগান। বাগান ঘিরে চলার পথ লাল মাটি কালো মাটিতে লেপা, ধারে ধারে খড়ি মাটির সাদা দাগ কাটা। গোটা গ্রামখানাতে যেন তিলক চন্দনের শোভা।

ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে দেবদেবীর স্তব আওড়াল। 'অসতোমা সদ্গময়' প্রার্থনা করল। নাচল গাইল। আমাদের মোটর ছাড়লে 'জয়হিন্দ্' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

মেঘে অনেক রকমের আলো পড়ে; সকালের আলো পড়ে, বিকেলের আলো পড়ে, নানা রঙে বিস্ময় লাগায়। কিন্তু এ অপরাহ্নের আলো যেন জ্যোতি বিছিয়ে আছে সাদা মেঘের উপরে। মেঘের এ এক জ্যোতির্ময় রূপ।

পাহাড়ী জমির উপর দিয়ে পথ। উঁচু হতে আরো উঁচুতে উঠছি। নীচে সহরের বাতিগুলি যেন একখানি হীরের কণ্ঠহার শ্যামলী কন্যার।

কালো পাহাড়ের মাথায় এক ঝলক আলো জ্বলে উঠল; শেষ রবির আলো-টুকু শেষবারের মতো দেখা দিয়ে ডুবে গেল। মোটর ঢালু পথে নামলো। 'জাগি ফল্স্' এ এলাম।

শৃঙ্গেরী মঠের কাছে 'তীর্থবারি', সেখানে 'অম্বুতীর্থ'। অম্বু মানে তীর। লোকে বলে, রাম বনবাস কালে যখন ঘুরছিলেন এদিকে, তিলক কাটবার জন্য তীর দিয়ে ভূমি হতে এই জল বের করেন। সেই জলই সারাবতী নদী হয়ে একশ' মাইলটাক পথ চলে এখানে এসে পাহাড় হতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নীচে ভূমি ধরতে। পাহাড় হতে নয়শ' ফুট নীচে ভূমি। একটানা খাড়া প্রপাত। একে দেখবার জন্য এখানে আসে লোক দলে দলে।

জাগি প্রপাতের চারটে ধারা, 'রাজা' 'রোরার' 'রকেট' আর 'রানী'। রাজার ধারা গম্ভীর—সোজা। রোরার-এর তুমুল গর্জন। রকেট বুলেটের মতো ছুটছে। রানী নারীসুলভ গতিতে পাথরে পাথরে পা ফেলে নামছে।

পাষাণে পাষাণে জল আছড়ে ধারাগুলি ধুলো হয়ে নীচে পড়ছে। যত নীচে তত কুয়াশা জলধূলিকণার।

রাজার আমলের বাসস্থান জলপ্রপাতের মুখোমুখি। রাত্রিবেলা বন্ধ ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোনা যেতে থাকল ভগীরথের চির-শঙ্খনাদ।

ভোরে রওনা হলাম। কনকাম্বর ফুল যেন নবারুণের আলো। খোঁপায় পরিয়ে দিয়েছিল এর একটি মালা গ্রামের পথে এক সধবা সৌভাগ্যবতী। তিনদিন পরলাম, মলিন হল না রঙ একটুও। সার্থক নাম ফুলের কনক-অম্বর। মালাটি রেখে এলাম কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা টেবিলটার উপরে। দীঘির জলে ফোটা পদ্মটির মতো পড়ে রইলো ঘরে।

একেবারে চলতি পথের উপরে ডাকবাংলো। পথ হতে উঠেছে পুরাতন বটগাছ, ডাল হতে শিকড়গুলি ঝুলছে জালিবোনা চিকের মতো মুখের সামনে। বাংলোর বারান্দায় বসে দেখছি ওপার পাহাড় এপার পাহাড়, মাঝখান দিয়ে ঢুকে গেছে সমুদ্রের জল সহরের ভিতরে। "ব্যাকওয়াটার', কিন্তু দেখায় যেন শান্ত একটি নদী। নদীতে ভাসছে ষ্টীমবোট, নৌকো। ডিঙি বেয়ে চলেছে লোক। পার বাঁধিয়ে পাকাপোক্ত কিনারা। তীরে ঘাগরাপরা বাঞ্জারা বেদিনীর দল রান্না চাপিয়েছে, কাঠ কাটছে, মশলা কুটছে। সবাই ব্যস্ত এই স্থির জলধারার মুখে।

কারোয়ার ছোট সহর, ছোট বন্দর। জেলার সদর কারোয়ার। এই কারোয়ারের কথাই আছে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে। তিনি ছিলেন এখানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। সেই বাড়ী দেখতে হবে। কারোয়ারে এসেছিই সেই বাড়ী দেখবার জন্য।

পাহাড়ের উপরে উঠলাম দেখতে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—গুরুদেবের মেজদা জজ ছিলেন এখানে। থাকতেন এই বাড়ীতে। তখনো কি পাহাড় ভরা এত ঝোপ-ঝাড় ছিল? হয়তো ছিল, হয়তো ছিল না। এখনো এক জজ বাস করছেন এই বাড়ীতে, কঙ্কনী ভদ্রলোক।

সে আমলের বাড়ী, বিরাট এক একখানা ঘর। এর একটা ঘরকে ভাগ করে বড় বড় চারখানা ঘর করা যায়। এত উঁচু ঘর, এই ঘরে আড়াই তলা দালান ওঠে। বাড়ীর চারিদিকে ঘিরে ঢাকা বারান্দা, বারান্দায় 'ব্যাডমিণ্টন নেট' টানানো। জজের সন্তানরা বারান্দাতেই খেলে, মাঠে নামবার দরকার হয় না।

জজ বললেন, ঘরও এতগুলি লাগে না আমাদের। বেশীর ভাগ ঘর বন্ধ করে রাখি। তাছাড়া এত বড় বড় ঘর সাজিয়ে রাখতে প্রচুর আসবাবপত্র প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। যারা এসব বাড়ী করেছিলেন তাদের কালের দিন এখন নেই। বললেন, থাকবার বসবার ঘরই শুধু নয়, এইদিকে আসুন, দেখুন রান্নাঘর চাকরদের ঘর, বাসন ধোবার ঘর, জল গরম করবার ঘর,—কী ব্যাপক তল্লাট। এত সব নিয়ে কি করব আমরা? সব বন্ধ থাকে।

জজ ছুটোছুটি করে এঘর ওঘর খুলিয়ে দেখাচ্ছেন, কোথাও দরজায় বিরাট হুড়কো, কোথাও মোটা মোটা শিকল। পাহাড় হতে ধরে আনা ঝরণার জলের চৌবাচ্চাও কত বড়। জজ বললেন, অপূর্ব এই বাড়ী হতে সমুদ্রের দৃশ্য, আকাশের সৌন্দর্য। বারান্দার এইখানে দাঁড়িয়ে ঐ দেখুন সমুদ্রপারে সূর্যাস্ত দেখা যায়।

গুরুদেবও বোধহয় এইখানে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতেন।

জজ ঘরে ঢুকে ডাক দিলেন,—আসুন, দেখে যান, এখান থেকেও ঐ একই দৃশ্য দেখা যায়। একটি বিছানা যদি থাকে এখানে, তবে শুয়ে শুয়েই সে সব দেখতে পাবে।

ঘরে বাইরে কোথাও 'রাখঢাক' নেই। সব খোলা। ঘরে দেয়াল বলতে গেলে নেই-ই, সব খোলা দরজা আর জানালা।

দুইটি 'নরোইজিয়ান' পরিবার আছে কারোয়ারে। ভদ্রলোক দু'জন এসেছেন, ষ্টীমলোটে। সমুদ্র হতে মাছ ধরা, মাছ পরিষ্কার করা, মাছকে টাটকা রাখা ইত্যাদি

সব কাজ এখানকার লোকদের শেখাবার জন্য। তাঁরা আছেন এই পাহাড়েই এই বাড়ীর নীচের ধাপে। উপর থেকে দেখা যায় তাঁদের আঙিনা।

জজ বললেন, আমার এই বড় বাড়ীটাই ঐ দুই পরিবারকে থাকতে দেবার কথা হচ্ছে। আমি চলে যাব অন্য বাড়ীতে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাসলেন। সমুদ্রের ধারে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, আসল কথা তা নয়। ঐ বাড়ীটা এখন ভুতুড়ে বাড়ী বলে খ্যাত। এই জজ সাহেবের আগে যিনি এসেছিলেন, তিনি একদিন রাত্রে বারান্দায় মেয়েদের পায়ের জুতোর আওয়াজ পান, যেন কেউ চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। কিছু না ভেবেই তিনি দরজা খুললেন, কাউকে দেখতে পেলেন না। শুয়ে পড়লেন, আবার তেমনি চলাফেরার শব্দ। ভোরে উঠে চাকরদের বললেন একথা। তারা শুনে হাসাহাসি করতে লাগল। তারা জানে, এই বাড়ীতে আগে একটি বিদেশী পরিবার থাকত, ভদ্রমহিলা মারা যান এখানে। সেই হতে প্রতি বছরে তার জন্মদিনে ও মৃত্যুদিনে এই রকম চলার শব্দ হয় ও বাড়ীতে। এই জজসাহেবও ভীত হয়ে বাড়ী ছাড়বেন ছাড়বেন করছেন।

সমুদ্রের তীরে বালির উপরে পর পর মাছ ধরা জাল ছড়িয়ে মেলে দিয়েছে জেলেরা শুকোবার জন্য। তীরেই জেলেদের কুটির। আঁশটে গন্ধ জলে হাওয়ায়।

চলতে চলতে ভাবি, তখনকার দিনে মহর্ষিদেবের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ, প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস—তিনি থাকতেন এখানে পাহাড়ের ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীতে,—যেমন তেমন করে তো থাকতেন না। সেই জাঁক-জমক কল্পনা করি। গুরুদেবের সেই বয়সের রূপ কল্পনা করি। এখান থেকেই বোধহয় বিবাহ উপলক্ষে কলকাতায় আসেন তিনি।

'কালী' নদী এসে সমুদ্রে মিশেছে। এই সেই কালী নদী, 'জীবনস্মৃতি'তে যার কথা আছে। গুরুদেব সমুদ্রের পার ধরে বেড়াতে বের হতেন, কালী নদীর ধারে ঝাউবনে আসতেন--। এই সেই ঝাউবন।

গুরুদেবকে যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে পথ চলি। পথের ধারে এখন কত চায়ের দোকান, চালাঘর। স্বামী বললেন, তখন কি এর একটা দোকানও ছিল না? গুরুদেব কি একদিনও চা খাননি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে?

এই সেদিনের কথা সব, এখনো যেন তাঁর পায়ের দাগ খুঁজে পাই শুকনো বালির উপরে। আর এরই মধ্যে এই সমুদ্রের তীরে নতুন বাড়ী উঠে গেছে, 'টেগোর রঙ্গ মন্দির' নামে গুরুদেবের জন্মশতবার্ষিকীতে।

কালী নদীর ধারে পুরোনো সহর। কালী নদী পার হই ষ্টীম লঞ্চে; মোটর মাল স্টেশনওয়াগন সঙ্গী সাথী যাত্রী সবসমেত একসঙ্গে।

নদীর এপারেও দশ মাইল মহীশূর রাজ্য। মহারাষ্ট্রের যাতায়াতের রাজপথে কালী নদী একটি বিঘ্নস্বরূপ। বহু যাত্রী এসে বসে আছে এপারে, আরো আসছে বাসভর্তি হয়ে। এপারে যেন একটি ছোটখাটো মেলা। ওপারের লোক এপারে নামিয়ে লঞ্চ খালি করে আবার যাত্রী নিয়ে ওপারে যেতে সময় নেয় অনেকখানি। ধীরেসুস্থেই করে পারাপার।

ফেরীঘাটে একটি ছোট মেয়ে ভিজে কানি ঢাকা ডালা ভরা ফুলের মালা নিয়ে ঘুরছে যাত্রীদের কাছে। অচেনা ফুল। অনেকটা নারকেল ফুলের ছড়ার মতো খুদে খুদে ফুলের তিন ছড়া মালা এক এক আনা করে। সৌরভ নেই, বুনো ফুল—দেখতে নারকেল ফুলেরই মতো, সুন্দর। এরা কানাড়াতে বলে 'পিল্লিগে' ফুল, কঙ্কনীরা বলে 'কান্দোল'। নদীর ধারে ঝোপে-ঝাপে ফোটে

এই ফুল। ফোটে শুধু এই অঞ্চলেই। যেতে আসতে ফেরীঘাটে এই মালা কেনে সকল মেয়েরা। এক কঙ্কনী পরিবার বসে আছে এক দোকানের ছায়ায় বাক্স বিছানার উপরে। অভিজাত পরিবার, দেখলেই বোঝা যায়। ফুটফুটে ছেলেমেয়ে সঙ্গে, পুরুষরা সুদর্শন, রমণীরা রূপসী, গৌরাঙ্গী। তারা কিনল এ মালা গোছা গোছা। কয়েকছড়া খোঁপায় জড়িয়ে বাকীটা কলাপাতায় মুড়ে ঝুড়িতে রেখে দিল। বাড়ী গিয়ে আর সব মেয়েদের দেবে। এই মালার বড় আদর। এই পথ দিয়ে গেলে সবাই এই মালা চায়। এই ফুলগুলি অনেকদিন অবধি ঠিক এমনিই থাকে, শুকোয় না।

মালার ডালা নিয়ে মেয়েটি আমার কাছে এল। দন্তশুভ্র তাজা মালাগুলি, দু'আনার কিনে ফেলি। কিন্তু কি করি মালা নিয়ে। মেয়েটিরই ঝোলানো বেণীতে সবগুলি ঝুলিয়ে দিই।

ধুলো, কেবল ধুলো। লালমাটি, আর পথভরা তার লালধুলো।

মহীশূর রাজ্য শেষ হল, 'গোয়া'তে ঢুকলাম। একই ভাবে উড়ে চললো ধুলো—গাড়ীর আগে পিছনে। লাল ধুলোয় দু'ধারের গাছ ঘাসের সব সবুজ ঢাকা পড়ে আছে। গৃহস্থের বাড়ীর সাদা দেয়ালে লাল ধুলোর আবরণ। সামনে একটা গাড়ী চলে গেলে পথের নিশানাও ঢাকা দিয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে হাল ছেড়ে দিই। হোক, সাদা ব্লাউজ লাল হোক, কালো চুল পিঙ্গল হোক, ঘাড়ে গলায় পলেস্তারা পড়ুক, চোখের পালক ভুরুর কালো কটা হোক,—যা ঘটে ঘটুক। যত রাত হোক গিয়ে স্নান করব, সাবান মাখব, চুল ঘষব। এছাড়া আর করা যাবে কি?

খানিক গিয়েই লালমাটির টিলা-কাটা পথ, দুদিকে টিলার উঁচু পার, মাঝখান দিয়ে যাবার রাস্তা। গাড়ীর গতি কমাতে না কমাতে ধুপধাপ কোথা হতে কয়েকটা হনুমান উঁচু পার হতে পথে লাফিয়ে পড়ল, পড়েই আবার আর এক লাফে অন্য পারে উঠে গেল। চোখের পলকে পরপর পার হল পথ, সব কয়টাই পার হল। চালক ও আমরা সবাই তাই ভাবছি। হঠাৎ শেষ মুহূর্তে একটা হনুমান—শেষ হনুমানটি, ধুপ করে পথে পড়ল। পড়ল ঠিক চলন্ত মোটরের সামনে। ধাক্কা লাগার আওয়াজ হল। চলতি গাড়ী এগিয়ে চলল। পিছন ফিরে কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখি হনুমানটা পড়ে আছে কাত হয়ে—জনশূন্য পথটার মাঝখানে। মস্ত হনুমান, সবচেয়ে বড় হনুমান, দলের দলপতি। সবাইকে পথ পার করিয়ে দিয়ে সব শেষে পার হচ্ছিল নিজে।

এদিককার ক্ষেতে ধান কেটে ঘরে তুলেছে, সব ক্ষেত খালি। শূন্য ক্ষেত হতে খুঁটে খুঁটে ধান তুলছে কুলোতে করে বুড়ীর দল। খড়ের আঁটি ঘাসের বোঝা নিয়ে চলেছে মজুরনীরা।

লোকালয়ে আসি। গ্রাম, বসতির মাঝখান দিয়ে পথ এবারে। লাল স্কার্টপরা কালো রঙের মা তার শিশুকে কোলে নিয়ে মাটির দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে বসে পা দোলাচ্ছে। ছবি একখানি। গোয়ায় ঢুকতে গোয়ার প্রথম ছবি।

'মারগাও' গোয়ার ব্যবসা কেন্দ্র। ব্যস্ত সহর, মোটরে মোটরে পথ ভরা, প্রাসাদে গগন ছাওয়া। মারগাও পেরিয়ে 'জোয়ারী' নদীতে আবার ফেরীতে উঠি। এবারে আর আট মাইল বাকী। সারাদিনে আজ একশ' আশি মাইল পথ এলাম মোটরে।

জোয়ারী নদী, চওড়া নদী,—সমুদ্রে এসে মিলেছে। আকাশের দিকে তাকাই,—চাঁদ কোনদিকে? দিক ঠিক করতে পারি না। চারিদিকে একই চাপা রঙ—হাল্কা

মেঘে ঢাকা।

এই সময়ে ক্ষীণ চাঁদের কাছাকাছি একটি বড় তারা থাকে, শশিশেখরের পাশে বসে থাকা উমার মাথার চূড়ার মণিটির মতো।

....

গোয়া

....

'পাঞ্জিম' রাজধানী।

ডানদিকে 'মাণ্ডোভী' বাঁদিকে 'জোয়ারী',—দুই দিক হতে দুই নদী এসে একই জায়গায় মিলেছে আরব সাগরে। এই মোহানার মুখে ছোট্ট পাহাড়ের উপরে রাজনিবাস, গোয়ার ছোট লাটের আবাস। দু'পাশে ভরা নদী। সাদা 'সিগাল্স্' দলে দলে দুলে দুলে ভাসে নদীর স্রোতে। সামনে দিগন্ত-প্রসারিত সাগরের নীল জল। দূরে আকাশের গায়ে সাদা পাল তুলে চলেছে নৌকো, বলাকার মালা গেঁথে। মালবাহী নৌকো, বন্দরে বন্দরে নামিয়ে দেবে আপন আপন ভার। যাত্রীভরা ষ্টীমার আসে যায়, সামনে দিয়ে যেতে যেতে দৃষ্টি হতে মিলিয়ে যায় সাগরের নীলে। সূর্য পাড়ি দেয় আকাশপথে সাগর জলে আলোর কণা ছিটিয়ে। সারাদিন খেলা চলে নীল সবুজ সাদা কালোর—এই জলে। দিবারাত্রি চোখের সামনে এক সুগভীর উন্মুক্ত বিরাট উদারতা। জোয়ার ভাঁটা আসে যায়, ভিতরে ভিতরে উথলে ওঠে, ভিতরে ভিতরে টান ধরে। মোহানার মুখে, মিলবার মুখে কোনো উচ্ছ্বাস কোনো আবেগ থাকতে নেই।

গোয়া, সাগর পারের গোয়া, পর্তুগীজদের গোয়া। কতদূর হতে পর্তুগীজরা এসে গোয়া দখল করে সাড়ে চারশ' বছর বাস করে গেল।

মাণ্ডোভী নদীর ধারে পাঞ্জিম। পাঞ্জিম হতে নদীর পার ধরে বাঁধানো পথ। পথের ধারে লোকের বাড়ীঘর, বাগান। একটি স্বচ্ছ সুন্দর বসবাস। পাঁচ মাইল দূরে পুরাতন গোয়া,—গোয়ার আদি রাজধানী।

নভেনা উৎসব চলেছে এখন। নয় রাত্রির উৎসব। 'ব্যাসিলিব অব্ বোম জেসাস' চার্চের সামনে পথের দু'ধারে সারি সারি দোকান, মেলা বসে গেছে। দলে দলে লোক আসছে, চার্চে ঢুকছে। সামনের 'হল'-এ হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছে। প্রার্থনা ঘর গমগম করছে ধ্বনিতে। কোথা হতে কে একজন বলছেন, অন্যরা আউড়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

তিনতলা চারতলা সমান উঁচু হল—সামনের 'অলটারে' নীচ হতে ছাদ পর্যন্ত পুরো দেয়ালে সোনার পাতে সোনার জলে ঢাকা—থাম, লতা, নক্সা। দেয়ালের মধ্যখানে উঁচুতে 'সেন্ট ফ্রান্সিস'-এর মূর্তি।

হলের মাঝামাঝি একটা ষ্ট্যাণ্ডে তাঁর আর একটি মূর্তি। এটি সবার হাতের নাগালে। সবাই সেখানে একটি করে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কেউ কেউ তাঁর পায়ের কাছে মোমের তৈরী হাত, পা, চোখ, কান রেখে দিচ্ছে। কারো অঙ্গে কোথাও ব্যাধি হলে বা কারো হাত-পা ভাঙলে, মনে মনে আরোগ্য প্রার্থনা জানিয়ে

মোমের তৈরী সেই সেই অঙ্গ রেখে দেয়। বিশ্বাস আছে প্রভুর দয়া পাবে। কেউ কেউ বা সন্তান কামনায় মোমের পুতুল রেখে দিচ্ছে। চার্চের সামনে পথের দু'ধারে বিক্রি হচ্ছে মোমের তৈরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

একটি মোমবাতি কিনে জ্বালিয়ে দিলাম।

প্রার্থনা ঘরের পাশে শ্বেত পাথরের বেদীর উপর রঙীন পাথরের প্রকান্ড এক সিন্দুক। তার উপরে সোনার কাজ করা রুপোর একটি 'কাসকেট'। এর মধ্যে সেণ্ট ফ্রান্সিসের দেহ। রোম হতে তৈরী হয়ে এসেছিল এই শ্বেত পাথরের বেদী উপরের দেহাধার সমেত। পাথরের বেদীর গায়ে রুপোর রিলিফে সেণ্ট ফ্রান্সিসের নানা অবস্থার নিখুঁত ছবি। সেণ্ট ফ্রান্সিস ক্রুশ হাতে ধর্ম প্রচার করছেন—বুনো লোকেরা তাঁকে তীর ছুঁড়ছে মারবার জন্য। দলে দলে লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে তাঁর বাণী। তিনি মারা যাচ্ছেন,—এই রকম নানা অবস্থার ছবি।

সঙ্গী বললেন, আগে প্রতি নাভেনা উৎসবে রুপোর এই 'কাসকেট' খুলে সেণ্ট ফ্রান্সিসের দেহ বের করে রাখা হত, সবাই দেখতো। একবার একজন ভেবে বসলো এ দেহ সেণ্টের আসল দেহ নয়। ভেবে তাঁর হাতের একটি আঙ্গুল কেটে ফেললো। কাটা জায়গা দিয়ে রক্ত পড়ল।

হাত-আয়নার মতো একটি ষ্ট্যাণ্ডের উপরে গোল কাঁচে বাঁধানো সেই কাটা আঙ্গুলটি রাখা। নীরবে সবাই সেটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চুমো খাচ্ছে, চলে যাচ্ছে।

গোয়ানীজ বন্ধু ষ্ট্যাণ্ডটি তুলে ধরে আলোতে আমাদের দেখালেন, পরে মুখের কাছে নিয়ে কাঁচের উপরে একটি চুমো খেয়ে রেখে দিলেন।

পাশে আর একটি লম্বা হল। এ হল-এ 'ফাদার'রা সাজ বদলান প্রার্থনা-হল-এ যাবার আগে। এই হলের এক প্রান্তে সেণ্ট ফ্রান্সিসের বড় একটি রঙীন ফটো বাঁধানো, তিনি কাসকেটের ভিতরে যেভাবে শায়িত আছেন সেই অবস্থায়। সেই মাপ, সেই সাজ, সেই ভঙ্গী—হুবহু যেমন আছেন ভিতরে। ছবিতে দেখা যায় সেণ্টের মুখ, বাঁ হাত, আর দু'খানি পা। বাকী অংগ সাজে ঢাকা।

বন্ধু বললেন, ডান হাতখানি নেই এ দেহে, রোমে নিয়ে গেছে। সেখানে বলা হল লিখবার জন্য, কাটা হাত লিখতে সুরু করলো।

ছবির পিছনে উঁচু বেদীতে একটি লোহার সিন্দুকের মতো পাথরের সিন্দুক। বন্ধু এক ফাদারকে বলে চাবি দিয়ে সিন্দুক খোলালেন। ভিতরে একটি সোনার গোলাপ গাছ, বড় বড় সোনার গোলাপে ভরা। কয়েক বছর আগে রোমের পোপ পাঠিয়েছেন এটি এই চার্চের উদ্দেশে।

একটি উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে, দেখেছিলাম একে প্রার্থনা হল-এ: সবার হতে দূরে আলাদা হয়ে মেঝেতে একটি রুমাল পেতে বসেছিল তার উপরে হাঁটু গেড়ে। পাশে কিডব্যাগ। দূর নগর হতে এসেছে বোধহয়। সে কিডব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে এই হল-এ এসে ঢুকলো, একটি একটি করে ঘরে আর আর যত সেণ্টদের ছবি আছে দেখলো, ফাদার-এর সাজ ঝোলানো আছে দেখলো, সেণ্ট ফ্রান্সিসের সাজ ঝোলানো আছে দেখলো,—সব শেষে সেণ্ট ফ্রান্সিসের ছবিখানার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। যাবার আগে কাঁচে বাঁধানো ছবির কপালে অতি ধীরে অতি সাবধানে একটি চুমো খেল, যেন ঘুমন্ত শিশুর কপালে পিতা আলগোছে একটি চুমো খেয়ে বিদেশে চলল।

সেণ্ট ফ্রান্সিস গোয়া এসেছিলেন পনেরো শ' বিয়াল্লিশ সালে। চীন দেশে তিনি মারা যান পনেরো শ' পঞ্চান্ন সালে। এই দশ বছরে তিনি দশ লক্ষ লোককে

খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

গোয়াতে পথে, দোকানে, বাসে, ফেরীতে সর্বত্র সেণ্ট ফ্রান্সিসের মূর্তি, ছবি। চার্চেও তাই।

—যীশু নেই কেন?

গোয়ানীজ বন্ধু বললেন, যীশু ভগবান। আমরা বিশ্বাস করি ভগবানের দয়া নেমে আসে সেণ্টদের মাধ্যমে। তাই মানুষেরও যা' কিছু প্রার্থনা আমরা সেণ্টদের কাছেই জানাই। তাঁরা আমাদের হয়ে ভগবানকে জানান।

এই চার্চ এখন বন্ধই থাকে বারো মাস। কেবল নাভেনা বলে নয়দিনের জন্য খোলা হয়।

প্রার্থনা বোধহয় শেষ হল। সবাই উঠে দাঁড়ালো। ফাদারের সুরে সুর মিলিয়ে গান ধরলো। এক যুবক, একপা কাটা এক হাত কাটা বসেছিল মেঝেতে। দাঁড়াতে পারে না। দেহটা যতটা পারলো সোজা করে ধরলো, মনে মনে উঠে দাঁড়ালো।

সামনে আর একটি বড় চার্চ, এখানেই রোজ প্রার্থনা হয়। এই চার্চে রাখা আছে সেণ্ট জর্জের হাতের ছোট্ট ক্রুশখানি, যেখানি হাতে নিয়ে তিনি ধর্ম প্রচার সুরু করেন। ছাদ সমান কাঠের এক ক্রুশ।

বন্ধু বললেন, এই সেই ক্রুশ, বাড়তে বাড়তে এতবড় হয়েছে এখন। তাই লোকে বলে একে 'মিরাকেল ক্রুশ।'

ভক্তরা আসে, নখ দিয়ে কুরে ক্রুশের গা হতে কাঠের টুকরো ভেঙ্গে নিয়ে যায় সঙ্গে করে। রোগে, শোকে, আপদে-বিপদে এ তাদের অবলম্বন।

এমনিতরো বড় সাতটি চার্চ আছে এখনো এই পুরাতন গোয়ায় নারকেল বনের ভিতর হতে আকাশে মাথা তুলে।

পুরাতন গোয়া এককালের রাজধানী, এখন গ্রাম। এখানেই এই মাণ্ডোভী নদীর তীরে গোয়ার ঘাটে এসে উঠেছিলেন ভাস্কো-ডা-গামা একদিন। তাঁর নামে সেই ঘাট আজো আছে। আজো আছে ঘাটে যেতে প্রকাণ্ড দেউলের মাথায় ভাস্কো-ডা-গামার মূর্তি দাঁড়িয়ে। পর্তুগীজ গভর্নর যাঁরা আসতেন দেশ শাসন করতে—এই ঘাট দিয়েই গোয়াতে ঢুকতেন। এই ছিল রীতি।

বন্ধু বললেন, এইসব চার্চে অনেক 'ফাদার' অনেক 'নান্'রা থাকতেন। একদিন তাঁরা দেখলেন, আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে কালো হয়ে গেল। বুঝলেন—এ অলক্ষণ। এ জায়গা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁরাই আদেশ দিলেন অন্যত্র নতুন রাজধানী গড়তে। সেই তখন হতেই এ রাজধানীর দুর্দিন এলো।

ইতিহাস বলে, সে বছর প্লেগে দুই লক্ষ লোক মারা গেল।

মেলায় নানা জিনিসের দোকান। এক দোকানে খুব ভীড়, মাটির হাঁড়ি ঘড়া, থালা, ফুলদানি ভাগে ভাগে সাজানো। এ তো আমাদের চেনা জিনিস। যেতে আসতে বর্ধমান ষ্টেশনে দেখি, মোগলসরাইতে দেখি, আলিগড়ের প্ল্যাটফরমে দেখি। মাটির বাঘ সিংহ জোড়া ফুলদানি হাতে করে ট্রেনের জানালায় জানালায় ঘোরে ফেরিওয়ালারা।

বাঙালী দোকানী দু'জন বললো, হ্যাঁ মা, আমরা তো সেদিককারই লোক। আজিমগঞ্জ হতে আসছি।

কোথায় আজিমগঞ্জ, কোথায় গোয়া। এখনো তো আসা-যাওয়া তেমন সহজ হয়নি এ পথে। কুড়ি ঘণ্টা বাসে চড়ে পুণা যেতে হয়। মারগাঁও-এ রেল ষ্টেশন, আঠারো ঘণ্টা লাগে ট্রেনে বোম্বে যেতে। ষ্টিমারে বোম্বে যাওয়া একরাত এক-

দিনের কথা। তার পরের পথ লম্বা হলেও সোজা অবশ্যই। তবু মাটির ঠুনকো বাসন নিয়ে এতখানি পথ আসা-যাওয়া সোজা কথা নয়।

সেণ্ট ফ্রান্সিস ও সেণ্ট জর্জের দুই চার্চের মাঝখানে অনেকখানি খোলা জায়গা,—গোল চত্বর। চত্বর ঘিরে সিমেণ্টের বেঞ্চি, তাতে এসে বসলাম। চত্বরের মাঝখানে উঁচু জায়গার উপরে 'লুইস ডি ক্যামেস'-এর মস্ত এক মূর্তি। ইনি এসেছিলেন ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গে এখানে। তখনকার দিনে ইউরোপের এক শ্রেষ্ঠ কবি ইনি। এই পুরাতন গোয়াতে তিনি তাঁর বিখ্যাত ছয়টি কবিতার বই লিখে-ছিলেন, লিখেছিলেন বেশীর ভাগ একটি এদেশী মেয়েকে উপলক্ষ করে।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। নারকেল বনের মাথার উপরে রক্তরাগের ছোঁওয়া, তারি মাঝখানে 'লাইট হাউসে'র মতো দীর্ঘ ঋজু একটি ভগ্নচূড়া একাকী দাঁড়িয়ে। আগে যখন এখানে রাজধানী ছিল তখনকার 'একাডেমী বিল্ডিং'। পুরনো হয়ে ধ্বসে পড়ে।

বন্ধু বললেন, একবার এক সুদক্ষ জার্মান'ক দিয়ে ফের তৈরী করানো হল, এক বর্ষায় সে বাড়ী পড়ে গেল। জার্মান ভদ্রলোক বিস্ময়ে হতবুদ্ধি। বললেন, আবার গড়ব। এবারে যদি পড়ে যায়, আমিও মরবো সেই সঙ্গে।

আবার বাড়ী উঠল। আবার বর্ষায় পড়ে যেতে সুরু করল। বাড়ী পড়ে যাচ্ছে দেখে ভদ্রলোক ছুটে ভিতরে ঢুকলেন, বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মরলেন বাড়ী চাপা পড়ে।

নারকেল পাতা থেকে রক্তরাগটুকু মুছে গেল। কবির মূর্তি কালো দৈত্যের মতো অন্ধকারে কাছে এসে দাঁড়ালো।

উঠে পড়লাম। ঘরে ফিরব। চার্চের মাথার আলোর ক্রুশটি জ্বলজ্বল করছে, আকাশের কোণায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের মতো।

বোম্বের কাছ হতে সমুদ্রের পার ধরে চলে গেছে মালাবারের পালঘাট পর্যন্ত 'সহ্যাদ্রি'র পাহাড়ের সারি। অনুচ্চ সহ্যাদ্রি, নদীর ঢেউয়ের মতো ছোট ছোট পাহাড়। এরই কিছুটা নিয়ে গোয়া। সবাই বলত 'সোনার গোয়া', বলত 'পুবের রানী', বলত 'ভারতের রোম'। সে যুগে যখন জলপথে বাণিজ্য করত লোকে, এই গোয়াতেই আসত তারা—এই বন্দরেই নামত। পারস্য থেকে প্রবাল মুক্তা আসত, চীন হতে আসত চীনেমাটির বাসন, সিল্কের থান, আসত ভেলভেট, মালয়ের মশলা। গোয়ার বাজার রূপে রঙে সৌরভে ভরে থাকত।

পর্তুগীজরা যখন এসে গোয়া দখল করলো, তারা বললো, গোয়াকে যে দেখেছে তার 'লিজবোয়া' না দেখলেও চলে। 'লিজবোয়া' ছিল তাদের দেশের রাজধানী।

এই গোয়ার বন্দর হতেই আরবরা যেত মক্কা শরীফ তীর্থ করতে।

সাগরের জলে নদীর জলে গোয়া ঝিকমিক করে। জোয়ারে ঢুকে যাওয়া জল নানা নালা কাটে, ডোবা বানায়, শূন্য ধানক্ষেত জলে ডুবিয়ে 'বিল' করে রাখে। জলে জলে ভাগ করা স্থল। সেই স্থল ঢাকা নারকেল সুপারী বনে, কাজুবাদাম গাছে, আম কাঁঠালের ছায়ায়। ফাঁকে ফাঁকে কুটির, বাড়ী, প্রাসাদ, বাজার, সব মিলে গ্রাম নগর সহর, সবার উপরে চার্চের সৌধশির। এই নিয়ে গোয়া।

পাঞ্জিম হতে বারো মাইল দূরে 'পন্তা' গ্রামের ভিতরে 'মাঙ্গেশ-মন্দির'। অতি পুরনো মন্দির। এক সময়ে যখন অন্য ধর্মের প্রাবল্য এলো দেশে তখন সহর হতে বিগ্রহ তুলে এনে গ্রামে গ্রামে লুকিয়ে রাখা হল। এই 'মাঙ্গেশ'কেও তেমনি এনে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল মন্দির-পূজারীরা।

মাং—গিরিশ—আমার প্রভু, তাই নাম বিগ্রহের মাঙ্গেশ। শিবমন্দির। ছোট ছিল মন্দির, পরে হয়েছে বড়।

বাংলাদেশ হতে এসেছিলেন এদেশের সারস্বত ব্রাহ্মণরা নাকি এক সময়ে এখানে। এ'দের তাই বলা হয় গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ। পুরাকালের প্রবাদ, পরশুরাম সমুদ্র হতে কুলোর আকারে একখণ্ড জমি তুলে এই সারস্বত ব্রাহ্মণদের হাতে দিয়েছিলেন। সেই ভূমিখণ্ডের নাম 'কনকন'। এই কনকনে ব্রাহ্মণরা বহু মন্দির, বিগ্রহ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেইসব দেবদেবীই সহর ছেড়ে নানা গ্রামে লুকিয়ে আছেন বিধর্মীর ভয়ে।

ছোট একটি গ্রাম। ধানক্ষেতের জলাজমির মাঝখানে মাঙ্গেশ মন্দির। জলা মাটিতে ফুটে আছে লাল কুমুদ, সাদা কুমুদ। সেই কুমুদ তোড়া বেঁধে দশটা দশ পয়সায় বেচছে মন্দিরতোরণে বৃদ্ধ আর বালক-বালিকার দল। এক একটি তোড়া কিনে নিয়ে মন্দিরে ঢুকছে দর্শনার্থীরা। আমরাও নিলাম। শালুক ফুল পুজোয় লাগে না জানি,—শিব আশুতোষ, সবেতেই খুসী।

মন্দিরে অভিষেক পর্ব চলছে। একাদশ ব্রাহ্মণ ঘিরে বসে রুপোর শিঙা ভরে ভরে জল নিয়ে শিবঠাকুরকে স্নান করাচ্ছে। মন্দির স্তবে মন্ত্রে মন্দ্রিত।

পূজারী আমাদের হাতে আশীর্বাদী ফুল বেলপাতা দিলেন। কুমুদ নিয়ে অবাক হয়েছিলাম, হাত মেলে দেখি আশীর্বাদী ফুলটি একটি ক্ষুদ্র জলজ ফুল।

মন্দিরের সামনে একপাশে খান কয়েক বাড়ী, দেবদাসীদের। পূজারীদেরও আছে। এরই এক বাড়ীর মেয়ে বিখ্যাত গায়িকা লতা মঙ্গেশকর। পূজারী বলেন, মাঙ্গেশের নামে নাম রাখা হয়েছিল তার।

একই পথে থেকে থেকে কাঁচা পথ, থেকে থেকে পাকা পথ। বার বার কাঁচা পথ পাকা পথ বদল হল। অনেক গ্রাম অনেক নগর পার হয়ে গেল। 'ভলপাই' গ্রামে এলাম।

এখান হতে মাইল পাঁচ-সাত দূরে বনের ভিতরে আদিবাসী আছে কয়েক ঘর। জীপ চললো আমাদের নিয়ে।

বনে পথ নেই কোনো। লম্বা লম্বা শুকনো ঘাসে বনভূমি ঢাকা। সঙ্গী যিনি নিয়ে চলেছেন আমাদের তিনিই শুধু জানেন এ পথের সন্ধান। জানেন ঘাসের কোন' নিশানা ধরে গেলে পৌঁছুবে আদিবাসীদের কাছে। তিনিই বলেছিলেন, একবার একটু ভুল হলে 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' করে ছুটতে হবে কেবলি একটা টিলাই ঘুরে ঘুরে।

ভাবতে না ভাবতেই হল তাই। ঘাসের নিশানা ভুল হয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে সংশোধন করা বৃথা। পিছিয়ে গিয়ে আবার নতুন করে নিশানা ধরা হল। এই শুকনো ঘাসের উপর দিয়ে বনবাসীরা চলাফেরা করে মাঝে মাঝে। বেশী চললে অথবা ছোট ঘাস হলে চলার পথে রেখা পড়ে। এই লম্বা ঘাসে কি রেখা পড়বে। তবে পড়ে, একটু মিহি ছাপ পড়ে। শুকনো ঘাসও একটু মিইয়ে পড়া ভাব ধরে চাপে পড়ে। সঙ্গী দেখতে পেলেন রেখা। জানেন বলেই দেখতে পেলেন।

আদিবাসীদের আঙিনায় এলাম। মাত্র পনেরো ঘর বসতি। বনের ভিতরে এরা ইচ্ছেমতো' ঢুকে পড়ে। জমি নিয়ে চাষবাস করে, থাকে খায়; সংসার পাতে। বনবিভাগের লোক এসে তাড়া দিলে আর এক বনে চলে যায়।

'রাগি' এদের প্রধান খাদ্য। মাটির ঘর, খড় ঘাসের চাল। মেয়েরা মারাঠী মেয়েদের মতো শাড়ী পরে, ছেলেরা কোমরের দড়ি হতে সরু একটা লেংটি ঝুলিয়ে

রাখে। পিঠের দিকে ঝোলে চকচকে হাত-দা, বনে চলার একমাত্র সহায়।

এদের মধ্যে ওঝা আছে একজন। বিশেষ স্থান তার গাঁয়ে। কপালে কুমকুম, গলায় মালা, হাতে বুকে ফোঁটানাটা কাটা। এসে দাঁড়াল সামনে। ভাবখানা, দেখেই যেন আমরা বুঝতে পারি কে সে। ঈষৎ হাসিমুখে মুরুব্বিয়ানার ভাব। আমাদের আসার খবর আগে হতেই জেনেছে, তাই সযত্নে সেজেছে। একটু চওড়া লেংটি পরেছে।

এখানেও গ্রামে গ্রামসেবক আছে একজন, এদের মধ্যেই থাকে, এদের সন্তান-দের নিয়ে বসে লেখাপড়া শেখাতে চেষ্টা করে।

মাটির ঘর, ভিতরটা অন্ধকার। জানালার প্রয়াজনবোধ নেই কোনো আদি-বাসীরই। এই অন্ধকারে এরাই কেবল দেখতে পায় কোন কোণে খড়ে মোড়া 'রাগি'র বীজ রাখা, মাচার কোন পাশে বিড়ি বানাবার শুকনো পাতার গোছা, চামড়া দিয়ে মোড়া মুখ মাটির হাঁড়ির ঢোলকটা কোন বেড়ার ধারে। নিজ হাতে রাখা দ্রব্য হাত বাড়িয়েই দেখে এরা। চোখের দেখা, বাইরের আলোর দরকার হয় না।

ছোট ছোট ক্ষেত, ছোট্ট আঙিনা। যেটুকু প্রয়োজন ক্ষেত হতেই তোলে। ঘরে ক্ষেতে আঙিনায় জড়াজড়ি করে আছে বনের ভিতরে।

গোয়ায় কাজুবাদামের ছড়াছড়ি। কাজুবাদামের বন চারিদিকে। তবু নতুন করে আরো বন করা হচ্ছে কাজুবাদামের। যা বাদাম হয় তাতে দু'তিন মাস মাত্র কারখানা চালু থাকে। কাজুবাদাম ভজা, ভাঙা, ছাড়ানো, সাজানো, বাছা-বাছি সব কারখানায় হয়। কিছু কাজ 'মেসিনে' হয় কিছু হাতে করে লোকেরা। বড় ঝঞ্ঝাট এই কাজুবাদামের বাদাম বের করা। খোলার কষটা বিষাক্ত, হাতে লাগলে ঘা হয়ে যায়। খোলায় তেল থাকে, কষটাই তেল। এই তেল ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে দিলে সাপ আসে না। উই ধরে না। প্রতি বছর শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে কত কাজুবাদাম হয়, আর সিঁড়ির ঘরের কোণায় জমা হয়ে পড়ে থাকে। এখানে ঘুরে ঘুরে খুব নজর দিয়ে কারখানা দেখি তাই। কিন্তু বাড়ীর কয়টা কাজুবাদাম দিয়ে তো আর কারখানা বসান যায় না। কারখানার মালিক বলেন, আফ্রিকা হতে গোটা কাজুবাদাম আনাই, তবে বারোমাস চালু থাকে কারখানা।

কুমোরপাড়া হিন্দুপাড়া। বাড়ী বাড়ীর উঠোনে পোড়া মাটির তুলসীমঞ্চ, ছোটখাটো রথ যেন এক একটি। অতি সুন্দর পোড়া মাটির কাজ। লাল টুকটুকে সিংহমুখী কুঁজো, ঘরে এনে সাজিয়ে রাখবার মতো। বি ডি ও-র অফিসে দেখে-ছিলাম ছোট্ট দুটি পোড়া মাটির মূর্তি, চরকা কাটছে মেয়ে, বাদাম ভাঙছে মেয়ে। ছাঁচে নয়, হাতে গড়া মূর্তি। খোঁজ নিয়ে জানলাম এই কুমোরপাড়ারই এক মহিলা গড়েন এসব মূর্তি ঘরে বসে বসে। তাই এসেছি এখানে।

আঙিনায় আঙিনায় পোড়া মাটি কাঁচা মাটির হাঁড়ি ঘড়া উপুড় করা। কিছু পুড়েছে, কিছু শুকোচ্ছে। কয়েকটি কুমোর বাড়ী পার হয়ে এলাম সেই বাড়ীতে। সব বাড়ী হতে যেন এ বাড়ীর কাজ আলাদা। ঢুকতেই দেখি দাওয়ার নীচে পোড়া মাটির লাল মুখ একটি, মানুষ প্রমাণ মেয়ের।

মূর্তিকাররা যেমন ঘোরানো টেবিলে মূর্তি গড়ে, সেই রকম টেবিল সামনে নিয়ে জানালার খাঁজটার উপর বসে এক মহিলা নিবিষ্ট মনে মূর্তি গড়ছেন। আমাদের দেখে হেসে উঠে এলেন।

মারাঠীদের মতো আঁটসাট কাছা দিয়ে শাড়ী পরনে। স্বামী আছেন পাশে এক ইজিচেয়ারে বসে। গায়ে তার গেঞ্জি, পরনে লেংটি। লেংটিটাই এদের পরিধেয়

বস্ত্র। গোয়ার আদিবাসী, ক্ষেতের চাষী, কুমোর, কাঠুরে সবারই এই সাজ।

মাটিরই ঘর, উপরের ঘরে নিয়ে গেলেন মহিলা। সস্তায় সহজে বেচতে ছাঁচের খেলনা মেঝে জোড়া, পুরনো চাদরে শাড়ীতে ঢাকা। এই দিয়েই সংসার চলে। আর, নিরিবিলি দুপুরে সব কাজ সেরে স্বামীর পাশে বসে নানা মূর্তি হাতে গড়েন। বুঝদারজন বেশী দামে কিনে নেয়।

গত দশ বছর মহিলা একাই এ কাজ করছেন। স্বামীর পক্ষাঘাত, বাঁদিক নাড়তে পারেন না। পাশে বসে স্ত্রীর মূর্তি গড়া দেখেন, একজনের গড়া নিয়ে দুজনে খুশী হয়ে ওঠেন।

মস্ত এক স্টেশন ওয়াগন, সামনের দিকে দু' পা ছড়িয়ে বসা যায় এত খোলাখুলি জায়গা। লাফিযে লাফিয়ে চলছে গাড়ী। পীচ ঢালা পথ, এপথে এত লাফাবার কথা নয়; কিন্তু এগাড়ী লাফায়। বন্ধু বললেন, শেষ পর্তুগীজ গভর্নর জেনারেলের এই গাড়ী। তিনি সপ্তাহে তিনদিন এই গাড়ী নিয়ে বের হতেন। সংগে থাকত নানা রকম মিষ্টি। ছোট ছেলেমেয়েদেব বিলোতেন। গোয়ার আন্দোলনের সময়ে পর্তুগাল হতে যখন ওঁকে আদেশ দেওয়া হল যুদ্ধ করবার জন্য, তিনি বলেছিলেন, যাদের ভালো বেসেছিলাম তাদের মারতে পারব না আমি।

'ভাস্কোডাগামা' 'মারমাগোয়া' দুটি পুরাতন সহর, বিদেশী ছোট সহরের মতো। মারমাগোয়ায় আসল বন্দর। কাস্টমস অফিসার বললেন, এখানকার জল মাটি বেশী ভালো। এই জলের মাছ বেশী সুস্বাদু, এই মাটির ফল বেশী মিষ্টি।

নারকেল বনের ভিতরে ভিতরে কুটির। এককালে জমিদাররা গরীব লোকদের নিজ বাগানে থাকবার অনুমতি দিত, পরিবর্তে তারা বাগান পাহারা দিত। আজ সেইসব লোকেরা জমি দাবী করে বসছে।

কিছু মাটি, কিছু নারকেল পাতা মিলে কুটির। গায়ে বুসসার্ট, পরনে লেংটি, মাথায় হ্যাট, কুটির-স্বামী দাঁড়িয়ে আছে দা হাতে। ছিটের ফ্রক পরা গিন্নি দূরের কুয়ো হতে জলভরা কলসী কাঁখে করে নিয়ে এলো। জল ছলকে কোমরের কাছের ফ্রকটা ভিজে গেছে কিছুটা। শুকনো নারকেল পাতায় আগুন জেবলে মস্ত একটা শুয়োরের গায়ের লোম পুড়িয়ে সাফ করছে দুটো লোক। শুয়োর মেরেছে—নাভানা উৎসব,—খাওয়া-দাওয়া হবে।

মোটর সমেত ফেরীতে উঠলাম। দিবারাত্রি পারাপার হয় ফেরী দিকে দিকে। ফেরী যেন পুল। খালাসীর গলায় সোনার সরু চেনে সোনার ক্রুশ চিকচিক করে।

গোয়ানীজদের বেশীর ভাগ লোকের রং কালো। ঠোঁট পুরু। মেয়েরা আকারে ছোট, স্থুলাংগী।

গোয়া চার্চের দেশ, নান্ ফাদারের দেশ। লম্বা পোশাক পরা সতেরো আঠারো উনিশ বছরের গোয়ানীজ যুবকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে। এরা এখন 'ব্রাদার',—ভবিষ্যতের 'ফাদার', মুখে হাসি শ্যামবর্ণের নান্‌রা দেশের সর্বত্র।

এত বছরের পর্তুগীজ সভ্যতায় দেশের একদল লোক দেহে মনে পর্তুগীজ। কালো ছেলে সুট পরে, কালো মেয়ে গাউনে সাজে। শোকে কালো পোশাক পরে। বলে পর্তুগীজ ভাষা, চলে সেই ছন্দে। গোয়ার লোক ইংরাজি ভাষা জানে না ভালো। পর্তুগীজ ভাষায় দোকানের সাইনবোর্ড, হোটেলের নাম। এ যেন পর্তুগীজদের ফেলে যাওয়া এক দেশ। দেশে-বিদেশে কারো সংগে মেলে না এ।

এদেশে কলেজ ছিল না এতকাল। সেকেন্ডারি পাশ করে প্রতি বছর মাত্র চল্লিশটি ছেলে যেতে পেত পর্তুগালে শিক্ষা সমাপ্ত করতে। তাদের কয়েকজন

ফিরে আসত, অনেকেই সেখানে থেকে যেত, নয়তো পর্তুগালের অধিকারে আফ্রিকার দেশগুলিতে কাজ নিয়ে নিত। আর ভারতে গোয়ানীজরা ছড়িয়ে পড়ত সুপকার, বাটলার, ব্যাণ্ডমাস্টার হয়ে। ভারতের প্রতিটি হোটেলে ছিল এই গোয়ানীজরা।

আর একদল যারা কৃশ্চান হল না, কঙ্কনী ভাষা বলে, খালি গায়ে থাকে, লেংটি পরে, চাষ করে, মাছ ধরে,—তাদের কিছু গ্রামে সহরে রইল, কিছু জঙ্গলে থাকল। তবু এরাই সংখ্যায় বেশী এখনো। ষাট ভাগ এরা, আটত্রিশ ভাগ কৃশ্চান, আর দু'ভাগ মুসলমান গোয়ার লোকেরা।

সী বীচ, বাঁধানো ঘাট। কলেজের ছেলেমেয়েরা এসেছিল পিকনিক করতে। তারুণ্যের উচ্ছাস—গ্রামোফোন চালিয়ে নাচছে জোড়ায় জোড়ায়। প্রৌঢ়রা ঘুরছে এদিকে ওদিকে। লেংটিপরা কয়টি পুরুষ চলেছে আপনমনে ভীড়ের মাঝে ভীড়ের মানুষ হয়ে। ফ্রকপরা বৃদ্ধা মাথায় কাঠের বোঝা, ফেরী পার হবে। কাছা দিয়ে গুটিয়ে শাড়িপরা জেলেনীরা পা ফেলছে ঘরমুখো। গোয়ানীজ কিশোরীর ঝুড়ি ভরা গোল ঝিনুক, ছোট কাঠের বাক্সে মেপে মেপে বিক্রি করছে, এক এক বাক্স ঝিনুক দু' আনায়। সারি সারি মোটরের ভীড় পথের উপরে। বীচে হাওয়া খেতে এসেছে সহরবাসীরা সারাদিন পরে।

গোয়া আশ্চর্য। গোয়া সুন্দর। গোয়ার একই ফেরী বোটে পার হয় মোটর, স্টেশন ওয়াগন, সাইকেল, মোটর সাইকেল, অফিসের কর্মচারী, দোকানী, ফেরিওয়ালা, চাষী মজুর জেলে—দেশের সব রকম নারী পুরুষে। একই পথে পাশাপাশি চলে হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কার্টপরা মেয়ে, শাড়ীপরা তরুণী। একই কলের নীচে কলসী হাতে ভীড় করে কালো মেমসাহেব, দেশী গিন্নী। একই বীচে হাঁটে লেংটিপরা ঢাংগর ছেলে সুটপরা যুবকের সঙ্গে একতালে পা ফেলে। একই পাড়ায় পাশাপাশি বাস—কারো ঘরের সামনে বাঁধানো ক্রুশ, কারো আঙিনায় তুলসী বৃন্দাবন।

দিনের শেষ। পাঞ্জিম বীচ। সামনে আরব সাগর। মাণ্ডবী জোয়ারী দুই নদী দুই বাহু বাড়িয়ে আগলে রেখেছে রাজধানী। আকাশজোড়া সমুদ্র, সমুদ্রজোড়া আকাশ। একই গগনে আজ লাল হলুদ সবুজ নীল সাদা ধূসর—সব রঙ। স্তব্ধ মেঘ চঞ্চল মেঘ একই আকাশে। একই সময়ে পশ্চিম প্রান্তে সূর্য ডুব দিল, পঞ্চমীর চাঁদ হেসে উঠলো।

নাভেনা উৎসব, নয়দিনের উৎসব। আজ রবিবার। সহরে গ্রামে চার্চে চার্চে আলোর মালা, বিশেষ বাতি বিশেষ সজ্জা। বিশেষ সাজে সেজেছে গোয়ার ছেলেমেয়েরা।

....

অমৃতসর

....

যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে ঠিক কুড়িদিন আগে। পাকিস্তান হিন্দুস্থানে যুদ্ধ। সুরু হয় প্রথমে কাশ্মীরের পশ্চিম প্রান্তে, দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে, এসে যায়

অমৃতসরের কাছ অবধি। অমৃতসর হতে চৌদ্দ মাইল দূরে 'বর্ডার', বর্ডার হতে সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে 'ডোগরাই', তারপর ইছাগোল ক্যানেল। এই ইছাগোল ক্যানেলেই এ যুদ্ধের সমাপ্তি।

অমৃতসর হতে বর্ডার অবধি চৌদ্দ মাইল পথের দুধারে এখনো সৈন্য ঠাসা,—জীপ লরি ট্যাংক কামান বন্দুক বারুদ সবকিছু নিয়ে। ঘাসের রঙে মিলে আছে এরা, গাছের ছায়ায় মিলে আছে এরা। খোলা ক্ষেত জাল বিছিয়ে মিলে আছে এরা। এখনো সকলে সতর্ক,—যদি আক্রমণ আসে আবার। এখনো এদের কাজ শেষ হয়নি, কর্মব্যস্ত সবাই। মাত্র কুড়িদিন আগে কুরুক্ষেত্র ছিল যে ভূমি, সে ভূমির দাগ ওঠানো এক মহাকাজ।

'ওয়ার ফ্রন্ট' দেখতে এসেছি। দেখতে এসেছি কেমন সে স্থানের রূপ হয় যুদ্ধাবসানে।

বর্ডারের পরে খানিকটা জমি,—'নোম্যান্‌স্‌ ল্যান্ড', তারপর পাকিস্তান, ডোগরাই নগর। এই ভূমি দখল করল হিন্দুস্থান কুড়িদিন আগে। বর্ডার হতে ইছানোল ক্যানেল অবধি যুদ্ধক্ষেত্র এখন লোকশূন্য প্রাণশূন্য—খাঁ খাঁ ভূমি। মাঝখানে চওড়া রাজপথ হিন্দুস্থানের, পাকিস্তানের। দু'পাশে মাইলের পর মাইল শূন্য শষ্যক্ষেত। কাঁচ ধানক্ষেত গমক্ষেত জ্বলে পুড়ে গেছে, অকালে শুকিয়ে গেছে। গ্রামগুলি খোলা বুক নিয়ে হা-হা করছে। কারো চাল নেই, দেয়াল নেই,—কারো বা কিছুই নেই।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি, পাকিস্তানে পড়তেই পথের ধারে 'পিলবক্স'। এই প্রথম পিলবক্স দেখি। পাকিস্তান পিলবক্স করেছে শুনিনি আগে। এখনই জানা গেল পথে গ্রামে পিলবক্স বানিয়ে তৈরী হয়েই ছিল তারা। পিলবক্স—ছোট্ট একটা ঘর, ভিতরে লোক দাঁড়াতে পারে ততখানিই উঁচু, বেশীর ভাগটা মাটির মধ্যে, বাকী একটুখানি অংশ শুধু মাটি হতে উপরে। সেই অংশের দেয়ালে ফুটো কয়েকটা, ভিতরে জনকয়েক সৈন্য ঢুকে সেই ফুটো দিয়ে বিপক্ষকে আক্রমণ করে। বাইরে হতে সহজে বুঝবার উপায় নেই কোথা হতে আসছে আক্রমণ। এমন মাল-মশলায় তৈরী পিলবক্স, সোজা বোমা এসে আঘাত করলেও নাকি কিছু হয় না এর। ছাদটা একটা মোটা ভিতের সমান পুরু।

পথের ধারের এই পিলবক্সটার উপরে ছিল পানের দোকান। পিলবক্সের যেটুকু অংশ মাটির উপরে সেটুকুকে মনে হত দোকান ঘরের ভিত মাত্র। কিছু বুঝবার উপায় ছিল না কোনো পথচারীর।

পিলবক্স পেরিয়ে আরো এগিয়ে গেলাম। গ্রাম পেরিয়ে গেলাম। আরো খানিক এগোলাম; এবারে কিছুটা দূরে দেখা যায় ইছাগোল ক্যানেল। ক্যানেলের উপরে পুল, পুলের দু দিকে হিন্দুস্থান পাকিস্তান দু দেশের লোক পাহারায় রত। চওড়া রাজপথ, পুল পেরিয়ে সোজা চলে গেছে পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে। পাকিস্তানের পুলের মুখে উঁচু বেড়া তুলে ঢেকে রেখেছে পথ। সে পথে তাদের চলাচল দেখতে দেবে না হিন্দুস্থানের লোককে।

ইছাগোলের কাছাকাছি আর একটা গ্রাম। আর খানিকটা পথ। মিলিটারী অফিসার সঙ্গে সঙ্গে চলছিলেন, এবারে থেমে ঘুরে দাঁড়ালেন। দলে স্ত্রীলোক কেবল আমি। তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি আর এগোবেন না', তারপর আমার স্বামীকে বললেন, এই পথটুকুতে কোনো মহিলাকে নিয়ে আসি না।

—কারণ?

বললেন, এখনো ওরা আক্রোশে ভরপুর। স্ত্রীলোক দেখলে পুলের ও-মাথা থেকে অশ্লীল ভাষায় বাক্য প্রয়োগ করে।

স্বামী ও অফিসাররা সকলে এগিয়ে গেলেন। আমি পথের মাঝখানে খানিক দাঁড়িয়ে রইলাম। সঙ্গে এক জোয়ান, তাকে নিয়ে ধীরে ধীরে পিলবক্সের দেয়ালের ধারে এসে দাঁড়ালাম।

যুদ্ধে জিত হলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। সম্পদ সম্পত্তি আহরণ করতে হয়। সেই কাজ চলছে এখনো। মাঠের উপর দিয়ে চলে যাওয়া ইলেকট্রিকের তার কেটে, পোস্টগুলি খুলে লরী বোঝাই করছে সৈন্যরা। জোয়ান বললো, কাঠের জিনিসই কত লরী বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হল, এইসব গ্রাম হতে।

জয়ের জিনিস নিতে হয়, তাই নেয়। নয়তো,—জোয়ান হাসে, বলে, জিনিসের চেয়ে নেবার খরচ পড়ে যায় অনেক বেশী।

এই জোয়ানটি ছিল এখানে, এখানকার এই যুদ্ধের সময়ে। কারনালের যুবক, কোমল মুখ। জোয়ানজনোচিত অঙ্গসৌষ্ঠব। এরি মধ্যে কয়েকবারই 'মা' সম্বোধন করে কথা বলে ফেলেছে আমার সঙ্গে। প্রাণটা আমার স্নেহসিক্ত হয়ে উঠেছে।

জোয়ান বলে, সবচেয়ে জোর যুদ্ধটা তো হল এইখানেই। পিলবক্স দেখিয়ে বলে, এই রকম পিলবক্স ঐ গ্রামেও আছে, ঐদিকের ঐ মাঠেও আছে। আমরা জানি না তা। দু-দুবার এগিয়ে এসেও আমাদের পিছিয়ে যেতে হল। ওদের তোপের মুখে পারছিলাম না টিকতে।

তারপর আমাদের উপর হুকুম হল; একদিন শেষ রাত্রে আমরা সোজা পথে না এগিয়ে ক্ষেতের পথে ঘুরে ইছাগোল ক্যানেল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে সেখান হতে উল্টো দিক দিয়ে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে করতে চলে আসি। সেদিন ওরা আর পারল না, আমাদেরই জয় হল।

ডানদিকে ক্ষেত পেরিয়ে বৃক্ষ বনস্পতি নিয়ে মনে হচ্ছে যেন বড় একখানা গ্রাম, গ্রাম ফুঁড়ে উঠেছে মসজিদের চূড়া। ওটা কোন গ্রাম?

জোয়ান বললো, মানিয়া গ্রাম।

লোক আছে?

একটিও নেই। ঐ গ্রামেরই বেশী লোক মারা পড়েছে।

যুদ্ধে অনেক নিরীহ লোকও মারা যায়—না? জোয়ান করুণ মুখে বলে, ইচ্ছে করে কি কেউ সিভিল লোককে মারে মা? আগুনের মুখে এসে পড়ে, তাই মরে। নয়তো পশুদের তো কেউ মারতে যায় না; যুদ্ধ শেষে দেখা যায় কত পশু মরে পড়ে আছে চারিদিকে। গোলাগুলির মুখে পড়ে যায় তারা। এই সেদিন—যেদিন পাকিস্তান আক্রমণ করে আমরা এইদিকে গুলি চালাই, মানিয়া গ্রামের লোকেরা সেইদিকেই ছুটে পালাচ্ছিল। যুদ্ধ শেষে দেখি ক্ষেত ভরে পড়ে আছে দেহ।

যুদ্ধান্তে শবদেহগুলির কি হয়?

সব কি আর আলাদা আলাদা করে পারা যায়, দু পক্ষেরই শবদেহ বড় বড় গর্ত খুঁড়ে চল্লিশ-পঞ্চাশটা দেহ একসঙ্গে মাটি চাপা দিয়ে দিই। ঐ দেখুন সেইসব বোজানো গর্ত, ক্ষেতের মাঝে, পথের ধারে মাটি উঁচু করা করা। তাড়াতাড়িই করতে হয় একাজ আমাদের। নয়তো শেয়ালে শকুনে মরার দুর্গন্ধে বীভৎস এক নরক হত এতক্ষণে এ জায়গা। শুধু শবদেহ সরানো নয়, যুদ্ধের পরে যুদ্ধের সরঞ্জামও লণ্ডভণ্ড হয় পথে-ঘাটে। লরীতে করে স্প্রে দিয়ে ওষুধই ছড়াতে হয় কত। এখানে

এখনো হচ্ছে।

পথ ঘাট এখন পরিষ্কার। যুদ্ধের আবর্জনা নেই। তবু যেন মনে হয় পথের মধ্যে কালো কালো ছোপ, যেন চাপ চাপ শুকনো রক্তের দাগ।

জোয়ান বলে, জানেন মা, এত যে যুদ্ধ এখানে, আমাদের গ্রাম হতে কিন্তু পালায়নি একটি লোকও ভয় পেয়ে। বরং বুড়ীরা গ্রাম গ্রামান্তর হতে খাবার করে নিয়ে আসত এই ফ্রণ্টে আমাদের খাওয়াতে।

স্বামী ফিরে এলেন, বললেন, এই দেখ, লুটের মাল এনেছি আমিও। ইছা-গোলের কাছের গ্রাম হতে তিনি তুলে নিয়ে এসেছেন একটি চীনেমাটির ভাঙা বাটি, ছোট দু'টি ব্যবহৃত কার্তুজ, আর গহনার ক্যাটালগের ছেঁড়া একখানি পাতা। বললেন, আরো ভিতরে ঢুকবার ইচ্ছে ছিল. এঁরা দিলেন না ঢুকতে। বলেন, কিছু নাকি বলা যায় না, 'টাইমবোম' রেখে গিয়ে থাকতেও তো পারে। মিলিটারীতে এ সাবধানতা নেওয়া বিশেষ কর্তব্য।

না, 'ওয়ারফ্রণ্ট' এখন পরিষ্কার। যুদ্ধের কোনো নোংরা নেই। কেবল পথের দু'ধারের বৃক্ষগুলি কোমর ভেঙে ভেঙে দুমড়ে পড়ে আছে। তোপের মুখে পড়েছিল এরাও। আর,—খাকি রং-এর তোবড়ানো একটা ষ্টীলের 'হেলমেট' ডেলা পাকিয়ে পড়ে আছে একটা গাছের গোড়ায়। এটাকে কেউ দেখেনি।

অমৃতসরের কাছে 'ছেহাটা' সহর। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও এখানে বোমা ফেলেছিল অকস্মাৎ কয়েকটা। যেন শেষবারের মতো ঝুড়ি খালি করে দিল।

নিরীহ সহর, নিরীহ নগরবাসী। এক জায়গায় গায়ে গা লাগা এক সারি বাড়ী, তার পাশে কিছুটা গম ক্ষেত। তিনটে বোমা পড়লো সেই ক্ষেতে। বারো মন ওজনের বোমা এক একটা, গোল গোল গর্ত হয়ে আছে ক্ষেতে। বোমার দাপটে একসারি বাড়ী কেঁপে উঠল। দেয়াল ধ্বসে পড়ল। জানালা ভাঙলো, ছাদ খসল। একসারি বাড়ীর প্রতি ঘরে সেদিন লোক মরল—শিশু যুবা বৃদ্ধা—ষাটজন। শিশুই গেছে বেশী।

স্তব্ধ পাড়া, শোকাচ্ছন্ন মুখ সকলের। কান্না থেমে গেছে, কত কাঁদবে? মেয়েরা কেউ দাওয়ায়, কেউ ঘরে, কেউ পথের পাশে পাথর হয়ে বসে আছে। কেউ নীরবে ঘরকন্না করছে। পুরুষরা লেগেছে বাড়ী মেরামতের কাজে। কোনো সাড়া নেই. কোনো হৈ চৈ নেই। এক নিস্তব্ধ জগৎ।

অমৃতসরে 'গোল্ডেন টেম্পল' দেখে ফিরে যাবো ঘরে।

পথের ধারে শহীদ 'দীপ সিং'-এর স্মৃতিস্থান। লোকে বলে, দীপ সিং নিজ-কাটা মুণ্ড হাতে ধরে হেঁটে গিয়েছিলেন অমৃতসরে। তাঁর স্মৃতিস্থানের কাছে এসে সবাই খানিক থামে।

'তরণ তারণ' অতি পুরাতন গুরুদোওয়ারা।

খালি মাথায় ঢোকা নিষেধ, মাথায় রুমাল বেঁধে খালি পায়ে মন্দিরে ঢুকতে হয়। চৌবাচ্চার জলে পা ডুবিয়ে ধোয় লোকে, কেউ আপত্তি করে না। সেই জল চোখে কপালে দিয়ে ও মুখ ধুয়ে নিল অনেকে। মন্দিরের আধখানা সোনার পাতে মোড়া, যেন হলুদ ফুলে ভরা সর্ষে ক্ষেতখানি আকাশের পটে তুলে ধরা।

কাশীর বিশ্বনাথ গলির মতোই দোকানে দোকানে ঠাসা সরু গলি, মন্দিরের পথ। গোল্ডেন টেম্পল। সরোবরের মাঝখানে মন্দির। আগে এখানে কুল বন ছিল। গুরু নানক এসে বসেছিলেন এক কুল গাছের নীচে। সেখানে ছিল এক কুণ্ড, সেই কুণ্ডের নাম অমৃত কুণ্ড। তা হতে হয় অমৃতসরোবর, অমৃতসরোবর হতে

নাম নেয় অমৃতসর।

লোকে বলে, আকবর এসেছিলেন গোল্ডেন টেম্পল দেখতে। 'তৃতীয় গুরু' বললেন, আগে প্রসাদ নাও, পরে দর্শন। তিনবারের বার আকবর প্রসাদ নিলেন। দর্শন করলেন। বললেন, এতদিন জানতাম আমি আগে সম্রাট—পরে মানুষ; এখন জানলাম আমি আগে মানুষ, পরে সম্রাট।

মন্দিরে যেতে জলের উপর দিয়ে বাঁধানো পথ শ্বেত পাথরের। দুদিকে শ্বেত পাথরের থাম, উপরে সোনার পাতে ঢাকা বাতিদান। শ্বেত পাথর সরোবরের চারিদিক ঘিরে। শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো চার পার।

মন্দিরের ভিতরে সোনার কাজ, পাথরের কাজ, কাঁচের নক্সা। মাঝখানে সোনার বেদীতে 'গ্রন্থসাহেব'। গ্রন্থসাহেবে চামর ব্যজন করছে লোক। ভজন গাইছে। গ্রন্থ পাঠ হচ্ছে। শুনেছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও এক সময়ে এখানে বসে এঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভজন গেয়েছেন—'গগনমৈ থাল, রবিচন্দ্র দীপক বনে'।

মেঝে জুড়ে বসেছে অনেকে। এখানে যারা ঢুকছে তারা বেদী ডাইনে রেখে দেয়াল ঘেঁষে প্রদক্ষিণ করে, বেদী ছুঁয়ে মাথায় ঠেকিয়ে এক এক করে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখলাম, দেখে তাদের মতো আমিও বেদী ছুঁয়ে কপালে হাত ঠেকালাম। বাইরে বেরিয়ে এলাম।

তিন হাজার লোক রোজ রুটি-প্রসাদ পায় এখানে।

কে করে এত রুটি?

দেখবে? দেখ এসে। বলে, মন্দিরের এক ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আমাদের নিয়ে গেলেন ভোগ-রান্নাঘরে।

রান্নাঘরের একপাশে জলের কল, নীচে চৌকো বাঁধানো স্থান;—যেমন হয় স্নানের ঘরে কলতলা, সেই রকম। কলের নীচে দুইজন বস্তা বস্তা আটা এনে ফেললো, কল খুলে দিল। সেই জলে আটা মেখে বিরাট বিরাট গামলায় তুলে রাখল। এই কাজটা পুরুষেরাই করল। এবারে চারটে বাজতেই সব বয়সের স্ত্রীলোকের দল এসে বসে গেল রুটি গড়তে। যে যতক্ষণ পারে করে, আবার অন্য জন আসে। স্থান খালি থাকে না কখনো। এরা সবাই ভক্তিমতী গ্রামবাসী সহরবাসী। ভক্তিভরেই করে একাজ—যে যতটা পারে। কারো জন্য কোনো নিয়ম বাঁধা নেই মন্দিরের কাজে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম এক সম্ভ্রান্ত ঘরের বৃদ্ধা একটি ঝাঁটা নিয়ে চত্বরের একটা কোণায় ঝাঁট দিয়ে কবুতরের ময়লা জড়ো করলেন। কোথায় ফেলবেন ময়লাগুলি? একটু ইতস্তত করে হাতের সৌখীন বটুয়াতে তুলে নিলেন সব। যখন যাবেন, ফেলে দেবেন বাইরে।

চত্বর ঘিরে বাড়ী—একতলা, দোতলা, তিনতলা। মন্দিরেরই অংশ, মন্দিরের কাজেই লাগে সব। শুনেছি এরই একটা ঘরে আছেন সন্ত ফতেসিং। সাবধানে আছেন, তাঁদের মধ্যেই দু দলে রেষারেষি চলেছে পাঞ্জাবের কর্তৃত্ব নিয়ে। অবস্থা খুবই সরগরম।

আগে হতেই ঠিক ছিল একবার তাঁকে দর্শন করে যাব। একাজ নাকি এখন খুবই কঠিন। খুঁজে খুঁজে চত্বরের ঘরগুলির একটা ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছোট্ট দরজা, 'কোলাপসিবেল' সরু গেট। শিখ বন্ধুর ডাকাডাকিতে একজন লোক এসে দাঁড়াল গেটের ওদিকে। জিজ্ঞেস করল, আমরা কি চাই? শুনে অদৃশ্য হয়ে গেল। বোধহয় উপরে উঠল। খানিক পরে একটা চাবি নিয়ে সে নেমে এল, গেটের

তালা খুলল। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। লোকটি আবার তালা বন্ধ করে দিল।

অন্ধকার সিঁড়ির মুখ, ততোধিক অন্ধকার সিঁড়ি। সরু সিঁড়ি, উঁচু উঁচু ধাপ। এই সিঁড়ি ধরে পরপর উপরে উঠলাম। একটা ছোট ঘরে নিয়ে আমাদের বসতে দিল। পাশে একটি আলাদা ছোট ফরাস পাতা। বুঝলাম এটি সন্ত ফতেসিং-এর আসন।

কিছু পরে সন্ত ফতেসিং পাশের ঘর হতে এসে ফরাসে বসলেন। গায়ে হাঁটুর নীচ অবধি লম্বা কামিজ, হাসি হাসি মুখ। সবার দিকে তাকালেন, কুশল প্রশ্ন করলেন। পরে জিজ্ঞেস করলেন বিশেষ কিছু কথা আছে কিনা বলবার? বলবার কথা কারো কিছু ছিল না। আমিই এক রকম জোর করে স্বামীকে রাজী করিয়েছিলাম এখানে আসতে। তাই আমিই বললাম, কথা কিছু নেই, কেবল দর্শন করতেই এসেছি।

সন্ত ফতেসিং খুশীই হলেন শুনে। এখন কথা মানে তো লোকে এই আন্দোলন আলোড়নের কথাই বলে এসে। সন্ত ফতেসিং আমাদের সঙ্গে 'গোল্ডেন-টেম্পলের' কথাই বলতে লাগলেন ঘুরে ফিরে।

অমৃতসরে যুদ্ধের সৈন্যদের ভীড় আছে এখনো। ছুটির দিনে মাঝে মাঝে জোয়ানরা আসে সহরে, গোল্ডেন টেম্পল দেখে যায়। দুজন যুবক জোয়ান মন্দির দেখতে এসে সন্ত ফতেসিংকেও দেখতে এলো। জোয়ানদের জন্য তেমন বাধা-নিষেধ নেই। এদের তিনি ভালোবাসেন, দেখা করতে এলে ফেরান না। জোয়ান দুজন প্রণাম করে উঠতে সন্ত ফতেসিং উঠে দাঁড়ালেন, তাদের আশীর্বাদ করলেন। জোয়ানদের কাঁধে হাত রেখে বুক দেখান, বললেন, গুলি এই খানে নেবে, পিঠে নয়।

বিকেল হল। গোল্ডেন টেম্পল সোনার মন্দির। সোনার মন্দির আগুন হয়ে জ্বলছে, সেই আগুন জলে পড়ে মৃদু তালে ঘুঙুর নেড়ে চলেছে। ভিতর হতে 'গ্রন্থসাহেব' পাঠের সুর ভেসে আসছে। নরনারী সর্বদিক হতে মন্দিরমুখী প্রণাম জানাচ্ছে।

সেদিনও সবাই পুজো দিয়েছিল। সেদিন ছিল চৈত্রসংক্রান্তি, এদের নতুন বছর। মন্দিরের কাছেই জালিয়ানওয়ালা বাগ। উঁচু ঘর বাড়ীর মাঝখানে খোলা একটু স্থান। মন্দিরে পুজো দিয়ে সবাই এসেছিল মিলতে এখানে। সরু গলির মতো একটি মাত্র পথ যাওয়া আসার। চারদিক ঘেরা উঁচু দেয়ালের বাড়ীগুলি দিয়ে। সেদিনের সেই গুলির দাগ আজো আছে সেইসব দেয়ালের গায়ে, সেই কুয়োর পাশে। যে কুয়োতে দিকবিদিক বিভ্রান্ত লোক প্রাণভয়ে লাফিয়ে পড়েছিল। পরে শুধু তা হতে তুলেই গুণে পেল একশ' কুড়িটি মৃতদেহ। এখন এখানে শহীদস্তম্ভ হয়েছে, লাল পাথরের ঊর্ধ্বশির স্তম্ভ—লাল আগুনের বিরাট শিখা একটি।

সেদিনের দেয়ালের ক্ষতবিক্ষত স্থানগুলি তেমনিই রেখে দেওয়া হয়েছে। সেদিনের সেই দুটো বটগাছ মরে যাচ্ছে, তবু যত্ন নেওয়া হচ্ছে যদি আবার সবুজ পাতা ধরে কখনও।

জালিয়ানওয়ালা বাগে ঢুকবার মুখে অর্ধচন্দ্রাকারে সৈন্যরা ঘিরে দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়েছিল সেদিন পথরোধ করে। যেন একজনও না প্রাণে বেঁচে পালাতে পারে। সেই অর্ধচন্দ্রাকার স্মরণ করে সেই আকারে লাল পাথরের প্যাভেলিয়ান বানিয়েছে, মাঝখানে ফোয়ারা রেখে। এই ফোয়ারার জায়গায় সেদিন ছিল 'স্টেন গান'

এখানে।

দু'হাজার নিরপরাধ লোককে সেদিন মেরেছিল বৃটিশরা এখানে, অকারণে।

অমৃতসর ব্যস্ত সহর। পথে সবাই ব্যস্ত। রিক্সা চলেছে ছাপা কাপড় বোঝাই করে দোকানে দিতে। সাইকেলের পিছনে স্তূপীকৃত সাদা কম্বল। ঘোড়ার গাড়ী বোঝাই মিলের চাদর। গরুর গাড়ী বোঝাই পাগড়ীর কাপড়—নতুন রঙ করা হয়েছে, এগুলি ইস্ত্রি হবে, পরে বিক্রি হবে। সতরঞ্চি পর্দার থান টাঙ্গা ভর্তি, লোক শুয়ে শুয়ে চলেছে তার উপরে। পুরাতন সহর, সরু পথ। মানুষে পাগড়ীতে পথ ঠাসাঠাসি।

'দুর্গিয়ানা' মন্দির, মানে দুর্গা যেখানে থাকেন। দেখি এখানে লক্ষ্মীনারায়ণ, ডাইনে কৃষ্ণরাধা—বাঁয়ে রামসীতা লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন আর হনুমান। বলি, দুর্গা কোথায় ? পাশে দুর্গার মন্দির। অতি পুরাতন মন্দির। ফটকের নীচে সাদা কালো মার্বেলের মেঝে এক হয়ে আছে ধূলায় ধূলায়। এই মন্দির দেখলাম পরে। ছোটখাটো গোল্ডেন টেম্পলের অনুকরণ এটি একটি। তেমনিই সরোবরের মাঝখানে শ্বেতপাথরের মন্দির। মাথায় সোনার চূড়া। বেলাশেষের ছায়া পড়েছে চূড়ায়। জলে সূর্যাস্তের স্নিগ্ধ আভা। সেই জলে পারের গাছগুলির ঘন ছায়া। টিয়ার দল কাকের দল ফিরছে তাদের বৃক্ষনীড়ে, জলের উপর দিয়ে যাচ্ছে—ছায়া জলে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে।

থামের মাথায় বাতি জ্বলল। তলা হতে একমুঠো বকুল ফুল কুড়িয়ে নিলাম। বকুল বৃক্ষের ছড়াছড়ি অমৃতসরে।

বিকানীর

রাজস্থানের চলতি প্রবাদ :—

'শিয়ালে 'খাটু' ভালো
উন্ডালে 'আজমীর',
'নাগোরে' নিতুই ভালো
শাওনে বিকানীর'।—

—শীতকালে 'খাটু' সহর ভালো, গ্রীষ্মকালে ভালো আজমীর, নাগোরে রোজই ভালো. আর শ্রাবণ মাসে ভালো বিকানীর।

সেই শ্রাবণ মাস দেখেই এলাম বিকানীরে। শুনেছি বর্ষায় এক পশলা বৃষ্টি পড়লেই রাতারাতি সবুজ হয়ে যায় ধূসর বালির বুক। রূপ খুলে যায় বিকানীরের। তৃষ্ণার্ত দু' চোখ জুড়িয়ে যায় সবার।

কিন্তু বর্ষা এ বছর আসেনি এখনো এখানে। সময় হয়ে গেছে আসার, তবু দেখা নেই তার। ধকধক করে মরুর বালি, আকাশ তাপে ঘোলাটে। সারাদিন তপ্ত হাওয়ায় ঝলসানোর ভয়ে বন্ধ ঘরে সময় কাটিয়ে দিনশেষে বাইরে এসে বসি। রোদের কিরণ মুছে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বালি ঠান্ডা হয়। ফুরফুরে শীতল

হাওয়া স্নিগ্ধ করে দেয় দেহ মন।

বিকানীরের লোকেদের মনে ভাবনা জাগে, তারা মুখ ভার করে আকাশের দিকে শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে তাকায়। বলে, এই হাওয়া তো ভালো লক্ষণ নয়। হাওয়া বন্ধ হবে, ভাপসা গুমোট পড়বে, প্রাণ আটটাই করবে, তবে তো মনে আশা জাগবে বর্ষা এগিয়ে আসছে কাছে। নয়তো এই হাওয়া যে মেঘকে আরো উড়িয়ে নিয়ে যাবে অন্যদিকে।

বিস্তীর্ণ মরুভূমি। তার মাঝখানে বড় একটি সহর—বিকানীর রাজধানী। লাল পাথরের ইমারতে ভরা সহর। রাজদুর্গ রাজ-অট্টালিকা সহরের শোভা। চওড়া রাজপথ, যত্নে লাগানো গাছ সহরের অলঙ্কার।

বিকানীরের প্রথম রাজা বিকারাও প্রথম আসেন যোধপুর হতে এখানে। কেন এলেন সে কাহিনী লোকের মুখে মুখে।

এককালে যোধপুরের এক কুমার তার খুড়োমশায়ের সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন, মহারাজা দেখতে পেয়ে কৌতুক করে বললেন.—খুড়ো ভাইপোর কি পরামর্শ হচ্ছে? রাজ্য পাবার আগেই নিজের নতুন রাজ্য গড়বে নাকি?

কুমার ভাবলেন—তাই তো? খুড়োকে ডেকে বললেন, তবে কি পিতা আমাদের ইঙ্গিত দিলেন আপন রাজ্য গড়ে নেবার?

খুড়ো ভাইপো বেরিয়ে পড়লেন একদিন। সঙ্গে পাঁচশত সৈন্য আর একশত ঘোড়-সওয়ার। ভূখন্ড জয় করতে করতে এইখানে মরুভূমির বুকে এসে গড়লেন দুর্গ প্রাসাদ নগর সহর—সব মিলিয়ে এক নতুন রাজ্য। নাম দিলেন বিকানীর; বিকারাও-এর সঙ্গে নাম মিলিয়ে।

সেই হতে যোধপুর বিকানীরে বড় রেষারেষি। পাশাপাশি দুই রাজ্য, এ বলে আমি বড়, ও বলে আমি। কথায় কথায় লড়াই বাধতো দুই রাজ্যে।

বিকানীরের লোকের গর্ব তাদের রাজা বিকারাও ছিলেন রাজার বড় সন্তান—যুবরাজ; আসল রাজা। যোধপুর বলে, যোধপুরের বড়কুমার যুবরাজ ছিলেন যোধপুরেই। এখানেই তিনি রাজত্ব করেছেন। আসল রাজার রাজত্ব এটাই। বিকানীরে গিয়েছিলেন যুবরাজের ছোট ভাই।

বিকানীর বলে, যোধপুরকে আমরা লড়াই-এ হারিয়ে রাজভান্ডার হতে এই এই জিনিসগুলি লুঠ করে এনেছি।

যোধপুর বলে, তা বৈকি? বিকানীরের তো ছিল না কিছুই। আমাদের কাছে চাইলো, তাই দিয়ে দিলাম ওগুলো।

দুর্গে অতি যত্নে রক্ষিত আছে বিশেষ একটি ঢাল, একটি তলোয়ার আর একটি ছোরা। বিকানীর বলে, ঐগুলি নেবার জন্য যোধপুর বাইশবার এসেছে লড়াই করতে। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাইশ বছর আমাদের কেটেছে লড়াই করতে করতে। ধন মন শক্তি সময়,—সব খরচ হয়েছে এইতেই।

যোধপুর বলে, তা নয়, বাইশবার নয়। দুইবারই মাত্র আমরা তাদের আক্রমণ করেছিলাম। সেই আক্রমণই বাইশ বছর পর্যন্ত টিকে ছিল। সেই সময়েই তো বিকানীর জয়পুরকে চিঠি লেখে যে.—'বালিরূপ সমুদ্রের মাঝখানে বিকানীর-রূপ গজকে গ্রাস করতে কুম্ভীর-রূপী যোধপুর এগিয়ে আসছে। সুতরাং হে কৃষ্ণরূপী জয়পুর, কৃষ্ণ যেমন গরুড়কে ছেড়ে নিজেই তাড়াতাড়ি নেমে এসেছিলেন গজকে রক্ষা করতে, তেমনি তুমিও সত্বর এসে রক্ষা কর আমাকে'।

যোধপুর বলে, সেইবারেই জয়পুর আমাদের দুর্গ কিছুদিনের জন্য দখল

করে, আর মোগলরাও একবার কিছুদিনের দখল নিয়েছিল। আমরা আবার নিয়ে নিলাম। ধরে রাখতে পারেনি তারা।

বিকানীরের প্রতি যোধপুরের দারুন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। বিকানীরকে নিয়ে কথায় কথায় উপহাস করে। তবে, আসল রাগ তাদের জয়পুরের উপরে। বলে, জয়পুর আমাদের শত্রু। অথচ নিয়ম এমন,—আমাদের মেয়ে ছাড়া ওরা বিয়ে করতে পারবে না, তা বয়সে যত এলোমেলোই ঘটুক না কেন। বহু সময়ে স্ত্রী স্বামীর চেয়ে বড় হয়ে যায় অনেকটা।

যোধপুর বড়—আয়ে আয়তনে। কালের হিসাবেও তার কৌলীন্য বেশী। কিন্তু বিকানীরের জাঁক-জমক হাঁকডাক ছিল দেশে বিদেশে। বিকানীরের বর্তমান মহারাজ কার্নি সিং-এর ঠাকুরদাদা মহারাজ গঙ্গা সিং ছিলেন প্রতিভাবান পুরুষ। রাজ্যে জলের অভাব, বহু কোটি টাকা খরচ করে বিরাট বাঁধ বাঁধলেন, ক্যানেলের ভিতর দিয়ে জল ছাড়লেন। শুষ্ক বালি ভিজে উঠল. রাজ্যের আয় বারো লক্ষ থেকে সাড়ে চার কোটিতে গিয়ে দাঁড়াল।

যেদিন প্রথম বাঁধের জল ছাড়া হয় মহারাজ গঙ্গা সিং নিজে লাঙল ধরে ভূমি চষেছিলেন, মহারানী গিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন হাতে খাবারের ঝুড়ি নিয়ে, যেমন দাঁড়ায় রাজপুতানী তার চাষী স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে—দুপুরবেলা খিদের কালে।

ভারতে তখন বৃটিশ রাজত্ব, বৃটিশ রাজপরিবারবর্গের সঙ্গে ছিল মহারাজ গঙ্গা সিং-এর অন্তরঙ্গতা। কাজেকর্মে আমন্ত্রণে তিনি গেছেন বহুবার তাঁদের কাছে। তাঁরা এসেছেন তাঁর রাজ্য বিকানীরে। দেশে বিদেশে গঙ্গা সিং-এর নাম খ্যাত। তাঁর আমলেই রাজধানী বিকানীর সুন্দর হয়ে ওঠে। লাল পাথরের দুর্গ বাড়ে প্রাসাদ বাড়ে সহর বাড়ে, মন্দির হয় পার্ক হয়, চওড়া রাস্তা হয়,—বাতি জল হয়। সাজেসজ্জায় বিকানীর ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

পথের ধারে পার্কের পাশে পিপাসার্ত পথিকের জল খেতে কলের নল,—তাও যেন লাল পাথরে গাঁথা অতি সুন্দর ক্ষুদে একটি প্রাসাদ।

বিকানীর দুর্গ, লাল পাথরে গড়া এক বিরাট দুর্গ। আকবর বাদশার সময় হতে গড়া সুরু হয়েছিল, পর পর প্রতি রাজার আমলে তা বাড়তে বাড়তে চলেছিল। আলাদা আলাদা রাজার তৈরী আলাদা আলাদা মহল, নিবাস। করণ মহল অনুপ মহল চন্দ্রমহল ফুল মহল শীষ মহল, শিবনিবাস গঙ্গা নিবাস,—কত কী। মহলে মহলে পড়ে আছে শূন্য পালঙ্ক শূন্য কৌচ—ভারী ভারী কিংখাবে ঢাকা।

ছোট আর নীচু পালঙ্কে শোবার রীতি ছিল এই রাজপরিবারের।

এই রাজবংশের এক বালক-রাজার মাতুল মশায় ভার নিয়েছিলেন রাজার। বালক রাজাকে কোলে নিয়ে তিনি বসতেন রাজসিংহাসনে, রাজকার্য চালাতেন। রাজসভার অনেকে সইতে পারলো না তা। এক রাত্রিতে চক্রান্ত করে মাতুল মশায়কে তারা কৌশলে প্রচুর পরিমাণে নেশা করালো। মাতুল গভীর ঘুমে অচেতন হলেন। তখন বিরোধী দল শোওয়া অবস্থায় তাঁর পালঙ্কের সঙ্গে তাঁকে বেঁধে ফেলে মারতে উদ্যত হল। মাতুলের তখন ঘুম ভেঙে গেছে, নেশা ছুটে গেছে। মাতুল লম্বা চওড়া মানুষ ছিলেন, যে পালঙ্কে শুতেন, পা অনেকটা বেরিয়ে থাকতো। মাতুল সেই বাঁধা অবস্থাতেই মাটিতে পা ঠেকিয়ে পালঙ্ক পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কোমর হতে তরবারি খুলে শত্রুদলের চৌদ্দজনকে মারলেন, তবে

মরলেন। সেই হতে এই বংশের রেওয়াজ,—এমন পালঙ্কে ঘুমোবে যেন হাঁটু অবধি পা বেরিয়ে থাকে পালঙ্কের বাইরে, যাতে ঝট করে উঠে দাঁড়াতে পারে শত্রু আক্রমণ করলে। ঘুমের মধ্যেও লড়াইয়ের ভাবনা রেখে শুতে হত তাঁদের।

আপন আপন ব্যবহারের মহল ছাড়াও আছে দেওয়ান-ই-খাস, দরবার মহল, অভিষেক মহল।

দুর্গের আগাগোড়া বাইরের দেয়াল জুড়ে পাথরে খোদাই কারু কাজ। ভিতরের দেয়াল ফ্রেস্কো ভরা। একটুকু জায়গা খালি নেই পড়ে—যেখানে শিল্পীর নিপুণ হাত তুলি না বুলিয়েছে। মরুভূমিতে না-ফোটা যত ফুল, না-ফলা যত ফল, হাওয়ায় না-দুলে-ওঠা যত লতা—সব এই দুর্গের ভিতরে রঙে রেখায় ধরে আছে, ফুটে আছে। লতায় পাতায় ফুলে ফলে বিস্ময়-বিমুগ্ধ আবেশ এক।

দুর্গের ভিতরে ঘুরতে ঘুরতে ভুলে যেতে হয় যে দুর্গের বাইরে রসশূন্য বালুকারাশি হা-হা করছে দিগদিগন্ত জুড়ে।

দুর্গের এক একটি ঘরে এক এক আবহাওয়া ছবি দিয়ে। মেঘ দেখে প্রাণ জুড়োবে—দেয়াল জুড়ে ছাদের সিলিং জুড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে কেবলই মেঘের খেলা ঘরে। পাখীর কাকলি শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী—পাশাপাশি ধ্বনি তোলে। সোনালী রুপোলী আলো ঠিকরে ওঠে দেয়ালে বসানো নক্সার কাঁচে। হাতীর দাঁতের মতো মসৃণ পঙ্কের দেয়ালে জগতের একখণ্ড সৌন্দর্য এনে ধরে রেখে দিয়েছে যেন এখানে। সুরে সুর মিলিয়ে রঙে রসে ছড়াছড়ি।

ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দুর্গ। দুর্গ সব পড়ো অবস্থায়ই থাকে দেখতে পাই। এমনকি দেখিনি আগে আর। দেয়ালে কোথাও একটু রঙের মালিন্য ঘটল সঙ্গে সঙ্গে মাইনে করা বারোমেসে শিল্পী নতুন করে রঙ তুলি বুলিয়ে উজ্জ্বল করে তুলছে তা।

কার্নি সিং—যিনি এই রাজবংশের ত্রিবিংশতিতম পুরুষ, তিনি বলেন, আমার পিতার আমলে আমাদের রাজত্বের শেষ। ভারত সরকারে অন্য রাজ্যগুলির মতো এই রাজ্যও বিলীন হয়েছে। আমি পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান, যা আমার মাসের আয় তা হতে অনেকটা টাকা আমি প্রাসাদ দুর্গ পরিষ্কার রাখতে ব্যয় করি। তা পারি কেবল এইজন্যই—আমি কোনো নেশা করি না, আমার কোনো বিলাস ব্যসন নেই, শিকারের ঝোঁক নেই, মাছ মাংস খাই না, পান সিগারেটের খরচও নেই। তাই পারি আমাদের বংশের স্মৃতিগুলি নিখুঁতে সুন্দর করে রাখতে। নয়তো পারতাম না। খরচে কুলোতো না।

এই দুর্গেই ঘটেছিল সেই ঘটনা। মহারাজ করণ সিং-এর বড় পুত্রের আদরের এক পোষা হরিণ কেড়ে নেয় বাদশার এক শ্যালক। শ্যালক ছিল কোতোয়াল। দুই যুবকে বাদানুবাদ হয় হরিণ নিয়ে। কোতোয়াল ছোরা মেরে দেয় রাজকুমারের বুকে।

ছোট রাজকুমার হল্লা শুনে পাশের ঘর হতে বেরিয়ে এসে ভাই-এর দেহ মাটিতে লুটোচ্ছে দেখে, পলক না ব্যয় করে কোমরের খাপ খুলে আপন তরবারি বসিয়ে দিল কোতোয়ালের ঘাড়ে। এত দ্রুত ঘটলো ব্যাপারটা—কোতোয়াল থামের আড়ালে পালাতে যাচ্ছিল, ক্রোধের কোপ, রাজকুমারের অসি কোতোয়ালের ঘাড় ভেদ করে পাথরের থামও কেটে ফেললো খানিকটা। তরবারির বুক গেল বেঁকে।

সেই বুক-দুমড়ানো অসিখানি সগৌরবে সাজানো আছে শস্ত্রাগারে। সেই কাটা থাম আজও আছে সেইখানে দাঁড়িয়ে।

তুলে একবার হাতে নিলাম অসিখানা। নিতে ইচ্ছে হল। বীরের অসি। অত্যন্ত ভারী অসিখানা।

দুর্গে সাজানো আছে বহু দামী নালকী পালকী হাওদা,—মোগলদের দেওয়া সম্মান। আছে রানী ভিক্টোরিয়ার দেওয়া সোনার মুকুট। আছে দেশ-বিদেশের উপহার—সোনার মাছ সোনার পাঞ্জা সোনার দন্ত,—বহুতর দ্রব্য। উৎসবে আনন্দে যখন জলুস বের হয় এগুলি সব এক একটি হাতীর পিঠে ওঠে। দেশবাসী নগর-বাসী শোভা দেখে।

মহারাজ গঙ্গা সিং-এর আমল পর্যন্তই দুর্গ বেড়েছে, তারপর আর বাড়েনি। তাঁর আমলেই তিনি আলাদা প্রাসাদ তুললেন দুর্গের বাইরে। লাল পাথরের রাজপ্রাসাদ,—গড়নে আকারে মর্যাদা অটুট। তেমনি তার কারুকাজের বাহার। মহারাজার দুই কুমার, বড় কুমারকে দিলেন রাজবংশের অধিকার—রাজ অট্টালিকা। ছোট কুমার বিজয় সিং-এর জন্য বানালেন উদ্যান অট্টালিকা আলাদা একটি, একটু তফাতে। লাল পাথরের সে অট্টালিকা আজ পশু চিকিৎসার শিক্ষাকেন্দ্র। কুমার বিজয় সিং কি জানি কেন আত্মহত্যা করলেন নিজ প্রাসাদে। সেই হতে এই প্রাসাদে রাজপরিবারের আর কেউ ঢোকেনি কখনও, ঢুকতে চায়নি। মরুভূমির খোলা বুকের মতো খালি পড়ে ছিল প্রাসাদ এতকাল।

'লালগড়'—রাজপ্রাসাদ, মহারাজার বাসস্থান। এখানে এখন থাকেন মহারাজ কার্নি সিং। বলেন, এখানেও আমি পাহারাদার। যে ঘর যেমনি ছিল তেমনিই সাজিয়ে রেখেছি। বাবার ঘরের বিছানা তেমনি পাতা আছে, রোজ পুজো হয় ঘরে। নিজের জন্য একটা ছয় ঘরের বাড়ী করে রেখেছি, কোনো একদিন উঠে যাব সেখানে।

কার্নি সিং সময় পেলেই প্রাসাদ ঘুরে ঘুরে দেখেন। বংশানুক্রমের ফটোর ঘরে কোথায় ফটোর রং হাল্কা হয়ে আসছে; রাজবংশের শিকার—বাঘের ছাল সিংহের মাথা হরিণের সিং ভাল্লুক বাইসন অজগর নানাভাবে সাজানো পশুর ঘর, সেখানে কোন ছালে পোকা ধরেছে; খেলাঘর নাচঘর দরবার হল, রাজসিংহাসনে কোথায় কি একটু দাগ লেগেছে খুঁত ধরেছে—সঙ্গে সঙ্গে তা মেরামত করান। স্যুটিং-এর সখ আছে কার্নি সিং-এর, তবে শিকার নয়। এ লক্ষ্যভেদের সখ। এই একটি সখের জন্য যা বাড়তি খরচ করেন। কার্নি সিং নিজ বংশের ইতিহাস লিখেছেন, লিখে ডক্টরেট উপাধিও পেয়েছেন।

বিকানীরের রাজবংশের দেবী হলেন 'কার্নিমাতা'। দেবীর নামেই এই মহা-রাজার নাম। কার্নিমাতার মন্দির বিকানীর হতে মাইল কুড়ি দূরে 'দেশনোক' গ্রামে—থর মরুভূমির ধার ঘেঁষে।

মরুভূমির মধ্য দিয়ে পিচঢালা পথ পেরিয়ে গ্রামে ঢুকি। কার্নিমাতার মন্দিরের সামনে আসি। পুরাতন মন্দির, মন্দিরের সামনের দিকটা নতুন—শ্বেত পাথরে গড়া। শ্বেত পাথরের গায়ে নিখুঁত নক্সা কাটা। নক্সার মধ্যে কেবল সারি সারি ইঁদুর। কার্নিমাতার মন্দিরে ইঁদুরের প্রাধান্যের কথা শুনেছি বিকানীরে। বলেছে, ইঁদুর দেখে ঘাবড়ে যেও না। ইঁদুর হয়তো উঠবে গা বেয়ে—ভয় পেও না। বহু ইঁদুর দেখবে ওখানে, তারি মধ্যে যদি সাদা ইঁদুর দেখতে পাও তবে জানবে তোমার বহু সৌভাগ্য। পা তুলে তুলে হেঁটো না মন্দিরে। পায়ের নীচে ইঁদুর পড়তে পারে। মন্দির পরিক্রমা করবার কালে মেঝেতে পা ঘষতে ঘষতে যেও। কার্নিমাতার বাহন ইঁদুর। ইঁদুরের বিশেষ সমাদর মন্দিরে।

মন্দিরের ভিতরে ঢুকলাম। ইঁদুর দেখব জানি, কিন্তু এত ইঁদুর এমনভাবে দেখব কল্পনায় আনিনি। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে ইঁদুর। একটার উপর একটা গাদা গাদা জড়ো হয়ে ঘুমোচ্ছে এখানে ওখানে। জলের পাত্র হতে জল খাচ্ছে। দেবীর সামনে রাখা ভোগপাত্র হতে ভোগ খাচ্ছে। দেবীর ঘাড়ে চড়ছে মাথায় চড়ছে, দেবীর বেদীতে জটলা বেঁধে পড়ে আছে। দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনায় রাখা জয়ঢাকটার উপরে কয়েকশ' উঠে গা এলিয়েছে। থামের উপরে, পঞ্চপাত্রে কোশাকুশিতে ইঁদুরের ভীড়। নিশ্চিন্তে পা দুখানা পেতে ফেলবার স্থান নেই একটু। ইঁদুরের মহোৎসব অহোরাত্র। সারা রাজস্থানের ইঁদুর যেন এসে ঢুকেছে এই মন্দিরে।

মন্দির,—দূরে হতে সুবাস আসে মন্দিরের ধূপ ধুনো চন্দন পুষ্পের। আর এ মন্দিরের ভিতরে বাইরে শুধুই এক বাস—ইঁদুরের অঙ্গবাস।

দেবীর মূর্তি সিঁদুরে লেপা, ছোট। মোটামুটি একটি দণ্ডায়মান নারী-মূর্তি। কার্নিমাতার প্রসিদ্ধি দেশজোড়া। বহু ভক্ত আসে পুজো দিতে মধ্যপ্রদেশ গুজরাট রাজস্থানের নানা স্থান হতে। কার্তিক মাসে দেবীর পুজো হয় বিপুল আয়োজনে, যেমন হয় মা দুর্গার পুজো বাংলাদেশে আশ্বিন মাসে। লোকে মানে, কার্নিমাতা মা দুর্গাই এখানে এই নামে।

এই কার্নিমাতা স্বর্গের দেবী নন, এই রাজস্থানেরই মানবী—দেশনোকের এক চারণকন্যা। শিশুকাল হতেই অধ্যাত্মশক্তির অধিকারিণী ছিলেন। বিকারাও যখন এই পথে বিকানীর আসেন, কার্নিমাতার আশীর্বাদ পান। তিনি বলেন, যাও, রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর। তোমার পিতার চেয়ে তুমি খ্যাতিমান হবে, দেশ-বিদেশের মান পাবে।

কার্নিমাতার আশীর্বাদ নিয়ে বিকারাও বিকানীর গড়েন। পুরুষানুক্রমে রাজারা কার্নিমাতারই আশ্রিত, তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে লড়াইতে নামেন—শুভ কাজ করেন।

তখন কার্নিমাতার মন্দিরে মাতৃমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, কার্নিমাতা দেহরক্ষা করেছেন। বিকানীরের রাজা লড়াই করতে যাবেন। প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু আক্রমণ করেছে দেশ। দেবীর দোরে গিয়ে জোড় হাতে দাঁড়ালেন মহারাজা,—'মা তুমি আশীর্বাদ দাও, নির্ভয়ে যাই'। মার মাথার সোনার মুকুটের চূড়াটি খসে পড়ল। পুরোহিত সেটি নিয়ে রাজার মুকুটে পরিয়ে দিলেন। মার আশীর্বাদে এটি মাথা হতে নামায় সাধ্য কার! যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরলেন মহারাজা।

দেশনোক গ্রাম ছোট গ্রাম, কতিপয় লোকসংখ্যা। এই গ্রাম এখন কার্নিমাতার মন্দিরকে কেন্দ্র করে বিখ্যাত নগর এক। পবিত্র তীর্থস্থান। গ্রামের লোকদের অবস্থা ফিরেছে, বড় বড় কোঠা বাড়ী তুলেছে। জলের ট্যাঙ্ক, জীপ, মোটর, ইলেকট্রিকে জমজমাট।

দেশনোকের লোকরা তিন পুরুষ ধরে ব্যবসা করছে বাংলাদেশে, পূর্ববঙ্গে পদ্মার ওপারে। যার যখন বাসনা পূর্ণ হয়, কার্নিদেবীর মন্দির কেউ শ্বেতপাথরে সাজায়, কেউ দেবীর দোর সোনা-রূপোয় মুড়ে দেয়। দেশনোকের লোকেরা বলে, এত যে ইঁদুর এখানে, কোনো রোগের উৎপাত হতে দেখিনি কেউ কখনো। সেবারে বিকানীরে প্লেগ লাগলো, সব ইঁদুর এসে এখানে আশ্রয় নিল। মন্দিরে অসাবধানে কারো পায়ের চাপে যদি একটি ইঁদুর মরে তবে সে সোনার একটি ইঁদুর গড়ে দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে।

শিলচরের এক কাপড়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শ্বশুর দেশের লোক, আমাদের বাড়ীর উল্টো দিকেই এর দোকান, বড় দোকান সহরের। ইনি দেশনোকেরই লোক। কয়েক বছর বাদে বাদে আসেন। আমাদের সঙ্গে পরিষ্কার শিলেটি বাংলায় কথা বললেন। কোথায় আসাম আর কোথায় এই দেশনোক গ্রাম। কোথাকার মানুষ কোথায় যায় অন্নের সন্ধানে।

বিকানীর রাজধানীতেও মন্দির আছে, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, শিবের মন্দির। মন্দির বলতে সচরাচর যেমন আকাশচুম্বী উঁচু চূড়োর মন্দির বুঝি, এখানে তেমন নয়। মন্দিরও যেন এক একটি লাল পাথরের অট্টালিকা। ভিতরে বাইরে সমান বাহার। রাজার হাত যেখানে পড়েছে বিকানীরে সবেতে লাল পাথরের রূপ ফুটেছে। যেন রক্তকমল এক একটি।

মহারাজার গ্রীষ্ম কাটাবার প্রাসাদ 'গজনের-এ', বিকানীর হতে কয়েক মাইল দূরে। মরুভূমির মধ্যে মানুষের তৈরী জলটলটলে মস্ত এক হ্রদ। সেই হ্রদের পারে প্রাসাদ। উদয় অস্তের সূর্যের আলো লাগে প্রাসাদের গায়ে। প্রাসাদের ছায়া পড়ে হ্রদের জলে। আকাশের রং জলে পাথরে হাসে একসঙ্গে। হ্রদের পার ঘিরে ঘন সবুজ পাতায় ছাওয়া বট, নিম, জাম, জারুল বৃক্ষ সকল। প্রাসাদের গা লাগানো পোষা হরিণের ছড়ানো বন।

কার্নি সিং আমাদের নিয়ে জীপে করে ঘুরলেন বনে। হরিণের পিছনে তাড়া করলেন, হরিণ ছুটল, জীপও ছুটল তার পিছু পিছু। নৌকো করে হ্রদে ঘোরা হল। ঘরে ঘরে ঢুকে প্রাসাদ দেখা হল। পায়ে পায়ে চলে বাগানে বেড়ানো হল।

রাজত্ব নেই। রাজ-অট্টালিকা পড়ে আছে স্থানে স্থানে। রাজবংশের যাঁরা আছেন তাঁরা বইতে পারেন না এই ভার আর। দেশ-বিদেশের বহুমূল্য কাঁচ পাথরে সাজানো ঘর স্তব্ধ আজ। মহলে মহলে ঝাড়লণ্ঠনে বাতি জ্বলে না, কিংখাবের পর্দায় আলো লুটোপুটি খায় না। জনহীন সব।

সন্ধ্যে হল। ফিরে আসি বিকানীরে।

ভাই পান্নালাল এই বিকানীরেরই লোক, জাতিতে বাল্মিকী—চলতি ভাষায় মেথর। তিনি এম পি হয়েছেন. সহরে জমি কিনেছেন, বাড়ী তুলেছেন। দশের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন এখন। রাত্রিতে তাঁর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে এলাম।

ভাই পান্নালাল বললেন, কারো নিন্দে করি না, কাউকে দ্বেষও করি না—কেবল নিজের একটা দুঃখের কথা বলি তোমাদের। আমার বয়স এখন পঞ্চাশ, তখন আমি ছিলাম আট বছরের বালক—বেয়াল্লিশ বছর আগের কথা। সহরের বাইরে আমাদের পাড়া। একদিন আমাদের বাড়ীতে এক সাধু এলেন থাকতে। বাইরের দিকের ছোট্ট একটা ঘরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হল। তিনি আছেন। আমাদের সখ হল, ঘরখানার সামনে ঢাকা বারান্দার মতো একটু 'সজ্জা' তুলতে গেলাম। রাজার লোক এসে বাধা দিল। যেটুকু তুলেছিলাম ভেঙে দিয়ে গেল। একটু 'সজ্জা' তুলবারও অধিকার নেই আমাদের। সেই আমার আট বছরের কচি বুকে বড় আঘাত লাগলো সেদিন। এখন এই দেখ আমি সহরের বুকে বাড়ী তুলেছি। পথের ওপারে রাজার কাকার বাড়ী,—আমি তার চাইতেও বাড়ী উঁচু করলাম। উপরে ঐ দেখ খোলা ছাদ ঢাকা ছাদ, থাম দিয়ে 'সজ্জা' বানিয়েছি। আমার স্ত্রী বলে এতখানি জায়গা এভাবে নষ্ট করছো কেন? বলি, 'ও লছমী এ যে আমি কেন করছি কতদিনের দুঃখ বুকে চেপে রেখে করছি তা তুই বুঝবি না'।

লাল পাথরের লাল অট্টালিকা আর হয় না। রাজার জয়ধ্বনিতে মুখরিত

হয় না নগর। তবু বিকানীর দিনে দিনে বড় হচ্ছে, দিকে দিকে নতুন আবাস উঠছে। আগের লাগানো শিশু গাছগুলি বড় হয়ে হাওয়ায় দুলছে, ছায়া ফেলছে। সড়ক বাজার জনগণে গমগম করছে। লোহার পল্লীতে যাযাবর লোহারুরা সংসার পেতে বসেছে। ইঁট পাথরের বাড়ী সবার। বাল্মিকী পল্লীর ঘরে ঘরে আজ বিজলী বাতি জ্বলছে। প্রতি বাড়ীর মাথার উপরে মাঝখানে উঁচু করা পাথরের টালিখানাতে খোদাই করা ছোট্ট নক্সাটি,—যেন রাজস্থানের সধবা নারীর কপালের উপরে সোহাগ চিহ্নের সোনার টিকলিটি।

....

জয়শলমের

....

'—সুদুর্গম দূর দেশ—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা 'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ নির্দয়—'

—এরি মাঝে জয়শলমেরের সহর। জয়শলমেরের চারদিকে দিনের আলোয় মরীচিকা খেলা করে। রাজস্থানের পশ্চিম প্রান্তে এ পথ পেরিয়ে আরো পশ্চিমে সিন্ধু প্রদেশে বাণিজ্য করতে যেত লোকে। যারা যেত, তারা গ্রামে গ্রামে তালুকদারদের টাকা দিয়ে দিয়ে যেত। তাদের আশ্রয় নিত। নতুন যারা এ নিয়ম জানত না তারা ডাকাতের হাতে পড়ত, টাকা হারাত জিনিসপত্তর হারাত,—প্রাণও হারাত অনেক সময়ে। এ পথ ছিল ভয়ের পথ। লোকে বলত ডাকাতের দেশ।

চারদিকে বিস্তীর্ণ বালুকারাশি। মাঝে মাঝে কাঁটায় ভরা বনকুলের ঝোপ, মনসা কাঁটা, আর কাঁটা বাবলার ঝিরঝিরে হাল্কা গাছ। এরা কেউ ছায়া ফেলে না তলায়। এক কাঁটার ছায়া আর এক কাঁটায় এসে মিলে মিশে যায়। দিগন্ত আড়াল করতে কেউ নেই, এখানে ওখানে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। দৃষ্টিপথ সুদূর খোলা। এরই মধ্যে দূরে দূরে লুকিয়ে আছে ছোট্ট ছোট্ট গ্রাম, কখনো হাত-ধরাধরি গলাগলি কখনো 'আড়ি আড়ি'—তফাৎ তফাৎ, আপন আপন ঘর আলাদা আলাদা। কুলকাঁটার ঝোপ কেটে ঘিরে রেখেছে যে যার বালির উঠোনটুকু। কি মানুষ কি জানোয়ার কারো উপায় নেই সেই কাঁটা বেড়া ডিঙিয়ে ভিতরে ঢোকে। বালির ভিতর কাঁটাভরা ডাল পুঁতে কাঁটার উপর কাঁটা চাপিয়ে ঘন ঠাস চওড়া মজবুত করে তৈরী এই কুলকাঁটার বেড়া। ঝড়ও উড়িয়ে নিতে পারে না এ বেড়া। বেড়ার সীমানার ভিতরে দু'খানা ছোট্ট গোল ঘর, আর একখানা লম্বা ঘর। লম্বা ঘরে থাকে ছাগল ভেড়া আর দুধ দেয় যে গরু সেই গরু। গোল ঘরে থাকে ঘরের মালিকরা।

পাঁচ-ছয় হাত ঘেরের গোল ঘর, বাবলা আর বুনো আকন্দের ডাল দিয়ে

বেড়া বানিয়ে তার উপরে মাটি লেপে হয় ঘরের দেয়াল। ঘরের মাথায় দেয় বর্ষায় গজিয়ে ওঠা ঘাসের ছাউনি। ঘরের একধারে মাটির একটি সিন্দুক, তাতে ফেলে রাখে জমানো টাকা, দু' একখানা বাড়তি জামা, ওড়না। আর কি রাখে জানি না। আগে হয়তো লুটের মালও এতেই রাখতো।

এইটুকু ঘরের মধ্যেই মেঝেতে উনুন খোঁড়া। কারো ঘরে একটা দুটো হাল্কা খাটিয়া, কারো ঘরে উটের লোমের কম্বল পাতা। শীতকালে শীতও বেশী এখানে। বন্ধ ঘরে একটু আগুন সম্বল করে কোনো মতে মুড়েসুড়ে শুয়ে থাকে বেশীরভাগ লোক।

আরাম আয়াস সুখ ভোগের কোনো আয়োজন কোনো উপকরণ নেই ঘরে। মরুর সন্তান, মরুতেই তাদের দিনের খেলা। যত্নে তোলা মাটির ঘর শূন্যই পড়ে থাকে দিনমানে।

বর্ষার মেঘ জল ঢালতে ঢালতে হাল্কা হয়ে সবে এসে পেঁাচেছে এখানে। উট গাধা গরুর গলায় লাঙল বেঁধে যে যতটা পারছে বালি চষছে। ভিজে বালি ফুঁড়ে সরু লাঙলের ফলা লম্বা লম্বা রেখা চিরে চলেছে। আল দিয়ে বাঁধ দেওয়া নেই বালি জমির সীমানা। যে যতটা পারছে লাঙলের ফলা সোজা চালিয়ে নিচ্ছে। এতখানি জায়গাতে ক'টাই বা বীজ রস পেয়ে অঙ্কুর মেলবে, দানা বাঁধবে! অনিশ্চতের স্থান তাই অনেকটা জুড়ে আশার বীজ ছড়াতে হয়।

মেঘোয়াল-জোয়ানের হাতে রঙীন সুতো বাঁধা। দেবীর আশীর্বাদ। বছরে প্রথম আজ লাঙল ধরবে। এই আশীর্বাদী সুতো হাতে বেঁধে চাষ করলে ফসল ভালো উঠবে। কোঁচড়ে তার বীজের দানা—বাজরা জোয়ার মুগ অড়হড় সব একসঙ্গে মেশানো। যেটা যেমন লেগে যায় জমিতে। বলা যায় না কোন শস্যটা কোন বছরে ফলবে ভালো। বালির জমি, এখানে একটা গম গাছ উঠল—ওখানে একটা অড়হড়, কিছু তফাতে একটা জোয়ার। এমনিতরো হাল্কা হাল্কা ক্ষেত।

ক্ষেতমুখী মেঘোয়ালী ফিরে ঘুরে দাঁড়ায় মহাজনকে সেদিকে আসতে দেখে। চার বছর আগে চারশ টাকা কর্জ নিয়ে বিয়ে করেছিল। বৌ মরে গেছে, আবার বিয়ে করবে। মহাজনকে এসে ধরে, আবার চারশ' টাকা দাও।

মহাজন উপায় পায় না। কোন ভরসায় আবার সে টাকা ধার দেবে। বলে, ওর ঘরজমি নিলাম করলেও তো চারশ' টাকা উঠবে না। মেঘোয়াল-জোয়ান মুখ নীচু করে কোঁচড়ের দানা মুঠো করে তোলে আর ঝুরঝুর করে কোঁচড়ে ফেলে। বলে, তা নইলে যে আমার বিয়ে করা হবে না। মাথায় হলুদ পাগড়ী গায়ে কুর্তা পরনে ধুতি—দীর্ঘ সুন্দর সুঠাম মেঘোয়ালী হাসে।

মহাজন বলে, আগে যে ধার নিয়েছিলি তার কটা টাকা শোধ করেছিস বল? জোয়ান গোঁফজোড়া বিস্তার করে আরো হাসে, বলে, এক পয়সাও না। কি করব, খেতেই কুলোয়নি। ধার শোধ করব কোত্থেকে? নির্বিকার জোয়ান, কোনো ভাবনা নেই মনে। এক বিয়ের ধার শোধ হয়নি বলে কি আর এমন হয়েছে? আবার ধার করে বিয়ে করবে।

নিকটেই মহাজনের গ্রাম। গা লাগালাগি বাড়ী এ গ্রামে। গ্রাম হতে গ্রামে যেতে, গ্রামে এসে গৃহে ঢুকতে পথের নিশানা নেই কোনো। বালিই পথ, বালিই মাঠ. বালিই গৃহের আঙিনা। এই বালির রাজ্যে ঘর বানাতে জল মাটি পায় কোথা হতে তাই ভাবি।

ক্বচিৎ কোথাও ডোবা তৈরী হয় বর্ষার জলে বালির ঢালুতে। বহু বছরের

বহু বর্ষার জলে হাল্কা আবরণের মতো শেওলা জমে জমে বালির উপরে পলি ফেলে। সেই পলিতে বর্ষার জল কিছুটা আটকা পড়ে কিছুদিনের জন্য, কিছু মাটিও মেলে।

বহু দূরে দূরে ইঁদারা, অতি কষ্টে মানুষের গড়া। লাল পিঁপড়ের সারির মতো বালির উপরে সারি সারি মেয়েরা চলেছে মাথায় কলসী নিয়ে। নিকটে দূরে নানাদিক হতে এই চলমান সারির বিরাম নেই দিন'ভর দিগন্ত খোলা বালু ভূমিতে। যখনই মেয়েরা বালি ভেঙে চলে, যেন জল উপলক্ষেই চলে। মাথায় কলসী ছাড়া দেখা যায় না।

ছাপ দেওয়া রঙীন ঘাগরা রঙীন কাঁচুলী রঙীন ওড়নায় মোড়া মেয়ের দল চলে যেন ফুলেভরা শিমুল পলাশ অমলতাস বৃক্ষ ঘুরে বেড়ায় বালির বুকে। মেয়েদের এই সাজটুকুই যা রঙের ফোঁটা এই মরুর জগতে। এটুকু মেয়েদেরই দান। ভারী কাপড়ের সাজ এদের,—বালির তাপ হতে রক্ষা করে দেহ ভারী কাপড়ে। হাতে কব্জী কনুই অবধি, কনুই হতে বগল—লম্বা বাহু ভরা হাতীর দাঁত অথবা হাড়ের বালা। গলায় চাঁদির টাকা-গাঁথা হার। মাথায় সিঁথির মাঝখানে বাঁধা 'বোরলা'র নানা রঙের কাঁচে পাথরে আলো ঝিকমিক করে, ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বহুদূর হতে।

মহাজনের বাড়ী 'শাম' গ্রামে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ সকলে। মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা সকলের বাড়ী। প্রতি বাড়ীর সামনে বালি-পাথর, উপরে মাটির চাতাল এক চিলতে, বসে গল্পগুজব করে বাড়ীর পুরুষরা।

নিজ নিজ আঙিনাটুকু ঘিরে ঘরগুলি শাম গ্রামবাসীদের।

মহাজনের অবস্থা ভালো, তিনখানা ঘরই লম্বা। নীচু সরু লম্বা ঘরখানায় ঢুকলাম। মেঝেতে কম্বল বিছানো। এই ঘরেই বাইরের আগন্তুকরা এসে বসে। ধার-সুদের লেনদেনও হয় বোধহয় এঘরে। পরিচ্ছন্ন ঘর। একধার ঘেঁষে মাটি দিয়ে গাঁথা লম্বা টুলের মতো সরু বেদী। তার উপরে কাঁথা কম্বল ভাঁজ করে তুলে রাখা।

মহাজনের ঘরে স্ত্রী নেই, বিপত্নীক। মহাজন আগেই গৃহে ফিরে এসেছিল, উঠোনের একপাশে গরম গরম বাজরার রুটী আঙুলে টিপে টিপে নরম করে খাওয়াচ্ছে শিশু নাতিটিকে। দাঁত না উঠতেই মরুর শিশু বাজরার রুটি খেতে শেখে।

ঘোমটায় ঢাকা পুত্রবধূ রান্নাঘরে কাঠের উনুনে বাজরার রুটি সেঁকে সেঁকে রাখছে থালা ভরে। মোটা মোটা একতাল রুটি। ডাল আর বাজরার রুটি দিনের খাদ্য ধনী দরিদ্র সকলের। সঙ্গে থাকে ঘি প্রচুর পরিমাণে। গৃহস্থের ঘরে ঘিয়ের অভাব নেই। পাল পাল গরু সকলের। এ গরু পালতে খরচ নেই। মরুর বুকে চড়ে বেড়ায়, নিজের চেষ্টায় আহার সংগ্রহ করে খুঁজে খুঁজে খায় যেখানে যে কয়মুঠো ঘাস পায়। বর্ষার ফোঁটা পেয়ে রাতারাতি বালি ভূমিতে এক রকমের ঘাস জন্মায়। সেই সবুজ ঘাস তিনমাস খায়, পরে সারা বছর ঘাসের শুকনো গোড়া চিবোয়। এরা বলে, এই ঘাসে প্রচুর প্রোটিন থাকে। তাই তিন মাসে সারা বছরের খাদ্যসম্ভার দেহে পেয়ে যায় পশুরা। পশুপাখী মানুষ উদ্ভিদ সবাইকেই ভূমির বিধান মানতে হয়। বাংলাদেশে গরু যেমন পাতনা ভরা জল খায় রোজ, এখানে তা নয়। চার পাঁচদিন বাদে বাদে গৃহস্থ একটু করে জল খেতে দেয়,— তাই তাদের যথেষ্ট। ছাগল ভেড়া উট গরু পালে এখানে এমনি করেই।

মরুভূমিতে চরতে চরতেই এরা দলে বাড়ে, মৃত্যু ঘটলে শকুনী গৃধিনী খেয়ে সাফ করে ফেলে। দুদিক হতে বুক আড়াল করে রাখা পাঁজরের দু'সারি সাদা হাড় আকাশের দিকে হাত তুলে বালির উপর পড়ে থাকে।

এক এক গৃহস্থের দু'টি পাঁচটি নয়, শ'য়ে শ'য়ে গরু ভেড়া ছাগল উট। সবাই সবার আপন আপন পশুর দল চেনে। এদের মধ্যে যে পশু যখন দুধ দেয় তাকেই গৃহস্থরা বাড়ীর কাছে এনে রাখে।

উটের দুধ দুইয়ে আনলো এক মেঘোয়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উটের পেটের নীচে পিতলের ঘটিটা ধরে বাঁ হাত দিয়ে বাঁট টেনে দুধ দুইল দেখলাম। বেশী দুধ দেয় না উট, সের, সোওয়া সের মতো দেয়, তাই পিতলের ঘটিই যথেষ্ট দোয়াবার জন্য। থকথকে ক্রীমের মতো দুধ। ঘটি সমেত এনে সামনে ধরলো,—খেতে হবে একটু। স্বামী খেলেন, বললেন, নোনতা লাগল, গরুর দুধের মতো মিষ্টি নয়। রুক্ষদেশ কৃপণ ভূমি, এরা বলে আমাদের এমন দিনও যায় যে, আমরা কেবল উটের দুধটুকু খেয়েই জীবন ধারণ করি।

গাওয়া ঘি-এর স্বাচ্ছল্য এদেশে। ডালের মতো হুড়হুড় করে ঘি ঢালে এরা গরম গরম বাজরার রুটির উপরে। মহাজনের পুত্রবধূ তেমনি করে ঘি ঢেলে দু'থালায় দু'খানা গরম রুটি নিয়ে এসে বললো, খাও, খেয়ে যাও। আর কি আসবে এখানে?

মহাজনের বাড়ীর সামনে ছোট একটা মুদির দোকান। লঙ্কা হলুদ দড়ি কেরোসিন তেল নুন ছিটের কাপড়—টুকিটাকি সবই কিছু কিছু পাওয়া যায় দোকানে। সঙ্গে একটা রেশনের দোকান—বাজরা জোয়ারের। দূর দূরের গ্রাম হতে এসেছে নারী পুরুষ আপন আপন গাধা নিয়ে। রেশনের বাজরা জোয়ারের বোঝা চাপিয়ে নেবে গাধার পিঠে। আজ যারা এসে ভীড় করেছে এরা সবাই জাতিতে মুসলমান। রঙীন ছাপা কাপড়ের লুঙ্গি ছেলেদের পরনে, তাছাড়া আর কোনো তফাৎ নেই অন্যদের সঙ্গে। মেয়েদের সাজ এখানকার আর সব মেয়েদের মতোই। হিন্দু মুসলমান সব সমান। মাথার ভারী কাপড়ের রঙীন ওড়না লুটিয়ে পড়েছে বালির উপরে, গায়ে কাঁচ বসানো কাঁচুলি—দীর্ঘাঙ্গী তরুণীটিকে চেয়ে চেয়ে দেখি, যেন বালি ফুঁড়ে ওঠা লম্বা ডাঁটার উপরে কলাবতী ফুলের গুচ্ছ-খানি।

শাম গ্রামের গা লাগা মুচিপাড়া। নতুন দেশে নতুন জিনিস দেখার নেশা, বাড়ী বাড়ী ঢুকে ঘর আঙিনা দেখি। বর্ষার মেঘ এসে গেছে আকাশে, গ্রামের সবাই ছুটেছে ক্ষেতে। ফসল ফলাবার আশায়। বছরের এই একটি মাত্র লগ্ন, যে করে হোক কিছু দানা ঘরে তুলতে হবে। যুবকবৃন্দ নারী শিশু সব আজ ঘর-ছাড়া। দোরে দোরে শিকল তোলা। ছোট্ট দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকি।

খালি ঘরের একপাশে জড়োকরা চামড়া, উঠোনে চামড়ার টুকরো, চামড়ার তৈরী দোলা চৌবাচ্চায় চামড়া ভিজিয়ে রাখতে জল, উনুনে গরম ছাই, কাঠের থালা যেখানে যেটি থাকবার তেমনই আছে। যেন ঘরকন্না করতে করতে ছুটে চলে গেছে।

উঠোনে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো মগের মতো নক্সাকাটা চামড়ার ছোট্ট থলি সবার বাড়ীতে। প্রাতে সন্ধ্যায় 'বাইরে' যায় যখন জল নিয়ে যায় এতে করে। আসবাবহীন ঝকঝকে তকতকে গৃহস্থালি। ছাইপাঁশের স্তূপ পড়ে নেই কোথাও। কতটুকু বা আগুন জ্বলে, কাঠ কোথায়। তবু যা কিছু সংসারের

আবর্জনা সব হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায়, নয় বালির তলায় চাপা পড়ে। কাঁচা নর্দমার চিহ্ন নেই। জল যাবার নালা বলেই কিছু নেই এদের। যেখানে যেটুকু জল পড়ে বালি শুষে নেয়।

থেকে থেকে বালির ছোট ছোট টিলা। টিলাগুলি চলে চলে বেড়ায় বালিতে। বালির ঝড়ে এখানকার টিলা ওখানে যায়, পথের বালি উঠোনে ঢিবি তোলে। রাতারাতি বালির টিলা বালিতেই ভাঙে, বালিতেই আবার নতুন করে গড়ে ওঠে। মরুভূমির বালি নিয়ে ভাঙাগড়া এ এক চপল খেলা বাতাসের।

এই খেলার সুর লোকদেরও প্রাণে, বালির টিলার মতোই একটি যাযাবর মন এদের মধ্যে বাস করে। যত্নে গড়ে তোলা ঘর গ্রাম ছেড়ে যেতে একটুও পিছুটান বোধ করে না—দুর্দান্ত দুঃসাহসী মরু-সন্তান।

পথে পড়ে 'গিলাবালী' গ্রাম। বালির মাঝখানে বড় একটা গ্রাম, ছোট ছোট পাথরে গাঁথা বাড়ী সবার। এ গ্রামের অধিবাসীরা ছিলেন সমাজে উঁচু জাতের; ধনী ব্যবসায়ী। এক সময় রাজার সঙ্গে বনল না, রাজার মতে মত মিলল না; এক রাত্রিতে আপন আপন উট ছাগল গরু ভেড়া—যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে গ্রামের লোক চলে গেল গ্রাম ছেড়ে। রাজা টেরও পেলেন না। সেই হতে গিলাবালী গ্রাম তেমনি পড়ে আছে. আর কেউ আসেনি এখানে বসবাস করতে। ঘরের ছাদ উড়ে গেছে, দোর-জানালা খসে পড়েছে, কেবল পাথরের উঁচু নীচু দেয়ালগুলি দাঁড়িয়ে আছে। দূর হতে মনে হয়—একটু আগের দেখা,—শতেক উট যেন গলা উঁচু করে থমকে দাঁড়িয়ে আছে জটলা বেঁধে।

পায়ে চলা পথ সৃষ্টি হয় না মরুতে। একপা তুলে আর পা ফেললেই পিছনের পায়ের ছাপ বালি এসে ঢেকে দেয় ত্বরিতে। তবুও পথ আছে বৈ কি! জলের লোক জলের পথ জানে, সেই পথের নিশানা নিয়েই চলাচল করে। দেখেছি ছোট বেলায়—চিনাই বিল—নাম করা বিল, এপার ওপার দেখা যায় না দিনে। সেই বিলের জল কেটে নৌকোয় করে হাটের লোক হাটে ফিরতো, পথহারা নৌকোকে অন্য নৌকোর লোক হেঁকে ডেকে পথের নিশানা দিত। বালির দেশেও তাই। গরু চলে উট চলে মানুষ চলে, চলতে চলতে চলার একটা নিশ্চিত পথ থাকে তাদের মনে। সেই মনের পথ ধরেই জীপ চলেছে আমাদের নিয়ে।

উঠতি যৌবনের একজোড়া বর-বৌ চলেছে উটের পিঠে, আমাদের কিছু আগে আগে। বৌ বসেছে সামনে, রঙীন ঘাগরা ছড়িয়ে পড়েছে পা ঘিরে। মাথার 'বোরলা'র উপর উঁচু হয়ে আছে ওড়নার আঁচল। দৃপ্ত উন্নত ভঙ্গী, যেন রানী চলেছেন উটের পিঠের উপরে বসে। উটের পিঠের পিছনের খাঁজটাতে বসেছে ছেলেমানুষ স্বামী। উটের চলার তালে দুলতে দুলতে চলেছে দু'জনে। আকাশের গায়ে ফুটে ওঠা ছবি একখানি। মুখর তাদের মন. তারা কথা কইতে কইতে হাসছে। বৌ ঘাড় ঘুরিয়ে স্বামীকে দেখছে, স্বামী দেখছে বৌকে। তাদের নতুন জেগে ওঠা প্রাণের এই খুসীটুকু খোলা মরুতে ঝিলমিল করে উঠছে।

দলে দলে উট চলেছে পায়ে পায়ে বালি ছিটিয়ে। হাজার 'বহুরূপী' কিলবিল করে ছুটছে চারদিকে। বালির তলায় ঘর তাদের, বালির রঙে গায়ের রং। এই বালির নীচে ইঁদুর আছে, ছুঁচো আছে, সাপ আছে, 'পিনা' নাগ আছে। এই পিনানাগই মারাত্মক সবচেয়ে। এ সাপ লোকের আতঙ্ক। সরু লম্বা হলুদ রঙের সাপ। গাঁয়ের লোক বলে, মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে পিনানাগ ঘরে ঢুকে লোকের মুখের উপরে ফনা তুলে নিঃশ্বাস ছাড়ে। বিষাক্ত তার শ্বাস। শ্বাসের বিষেই

মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন পিনানাগ তার গলায় কামড় দিয়ে রক্ত চুষে খায়। সহরের লোকে বলে,—তা নয়, রক্ত চুষে খায় না। পিনানাগের ঐ নিঃশ্বাসেই কী বিষ আছে, গলায় ঘা হয়ে সঙ্গে সঙ্গে লোক মরে যায়।

জেলা কালেকটর বললেন, আমি আগে এই সাপের কাহিনী বিশ্বাস করতাম না। এখন কয়েকটা ঘটনা নিজে দেখেছি, তাই করি। চলতি বিশ্বাসে রক্ত চুষে খায় বলেই সাপের নাম পিনা-নাগ। একে ভয় পায় সবাই।

জীপ চলেছে। বেলা বাড়ছে। সামনে বালির বুকে মরীচিকা ধুক ধুক করছে। যেন সাগরের জলে থরথর কেউ কাঁপছে। বুনোফল মনসা কাঁটা বাবলার ঝোপগুলিকে মনে হচ্ছে যেন জলের ধারের বিশাল বৃক্ষ সব। তার ছায়াও যেন জলে পড়ে।

ঠিক এই মায়ার খেলার মাঝখানটিতে 'জয়শেলমের' সহর। সোনার বরন রাজধানী। হলুদ পাথরে গড়া বাড়ী অট্টালিকা প্রাসাদ দুর্গ সব। হলদু রঙের পাথর ছাড়া আর কোনো পাথর নেই এ তল্লাটে। সহরের মাঝখানে সবার মাথা ছাপিয়ে সুউচ্চ দুর্গ, দুর্গ ঘিরে সহর। বাড়ীতে বাড়ীতে ঠাসা সহর।

সহরের ভিতরে ঢুকি। সরু পথ, সরুতম গলি। প্রথম বর্ষার ফোঁটা ঝরছে টপটপ কয়েকটা। শুভ্রশ্মশ্রু শুভ্রকেশ গৌরবর্ণের এক বৃদ্ধ পাগড়ী চুরিদার কুর্তা খুলে কাচ্ছিপরা খালি গায়ে এসে দাঁড়িয়েছেন পথে। বর্ষার জলটুকু গায়ে মেখে নিচ্ছেন, তেলমাখার মতো দু হাতে পেট পিঠ থাবড়ে। বালকেরা লাফালাফি জুড়েছে ভেজার আনন্দে, ছড়িয়ে পড়েছে পথে পথে। যুবা প্রৌঢ়া ধীর গতিতে পথ চলছে, চলার অছিলায় ভিজতে চায় একটু। এই জলটুকু ভগবানের পরম আশীর্বাদ এখানে।

আরো কিছু ফোঁটা বৃষ্টি ঝরল। গলিপথ ধোওয়া একটু জল এসে থামল দোরগোড়ায়। গৃহস্থ গিন্নি লোহার কড়াইতে আঁজলায় সেই জলটুকু তুলে নিল, হয়তো মাটির গোয়ালঘর রান্নাঘর আঙিনাখানি—লেপে ফেলবে এই জল দিয়ে। কত কাজে লাগবে। জল কি নষ্ট করে?

খুশীতে ভরা সেই বৃদ্ধ পথ দেখিয়ে দেন, গলির ভিতর গলি পেরিয়ে 'বাপনা' পরিবারের বাড়ীর সামনে আসি।

নামকরা বংশ, বিপুল ঐশ্বর্য; বিরাট ধনী। রাজমন্ত্রীর পরিবার। তাছাড়াও ছিল এদের চীন দেশের সঙ্গে রুপোর কারবার। সেই ছিল এক কাল; সেই কালে পাঁচ ভাই পাঁচখানা বাড়ী তুলেছে এই লম্বা পথখানি জুড়ে। গা' লাগা বাড়ী, মনে হয় পথের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি একখানাই বাড়ী। এখন জনশূন্য ধরতে গেলে—কে কোথায় গেল কি জানি।

পথের এমাথায় ওমাথায় বিরাট তোরণ। পথের দু' ধারেই উঁচু প্রাসাদ। পথের উপরে দাঁড়িয়ে প্রাসাদের বাইরের সবটা দেখবার পরিসর নেই। ঊর্ধ্বমুখে আকাশ পানে তাকিয়ে বাড়ী দেখি। অপূর্ব পাথরের কাজ। নীচ হতে পাঁচতলা বাড়ীর ছাদের কার্নিশটুকু পর্যন্ত খোদাই কারুকাজ। কত থাম কত হাতী কত পাখী কত লতা কত ফুল;—কত জাফরী গবাক্ষ ঘুলঘুলি কপাট কুলুঙ্গি। যত সূক্ষ্ম কাজ তত দক্ষ কারিগরী। গলির ভিতর এ যেন ওড়নায় ঢাকা যুবরানীর গলার রত্নমণির হারখানি।

পাথরের সহর পাথরের বাড়ী, সব বাড়ীতেই কিছু না কিছু নক্সা খোদা পাথরের গায়ে। জাফরী গবাক্ষ, বেরিয়ে আসা 'ব্যালকনি'টুকু—সব কিছুতে হরেক

রকম নক্সা। আনাচে-কানাচে শিল্পের ছড়াছড়ি।

সহরের বৌরা মেয়েরা ঘোমটায় ঢাকা রুনুঝুনু নূপুর বাজিয়ে চলেছে নানা কাজে। নানা রঙের রত্নচন্দ্রহার দুলছে তাদের কটি ঘিরে।

বেলা পড়ো পড়ো। সোনার আলোয় ধোওয়া পথ।

একদল নারী চলেছে পথ দিয়ে, বাসন্তী গোলাপী হাল্কা ওড়নায় ঘোমটায় ঢাকা মুখ। শিবমন্দিরে পুজো দিতে চলেছে, এক হাতে অর্ঘ্যথালা আর হাতে পিতলের ঘটিতে কাঁচা দুধ। নারী, অর্ঘ্য সব মিলিয়েই যেন মহাকালের পূজার ফুলের ডালাখানি। অপরূপ ছবি। এই সময়ে এই ছবিখানি এখানে না দেখতে পেলে দেখা পূর্ণ হত না।

দোরে দোরে গাভীরা এসে দাঁড়াল। গৃহস্থরা ঘটি ভরে দুধ দুইয়ে নিল। সারাদিন গাভীরা বাইরে চরে বেড়ায়, গোধূলিলগ্নে একবার আসে, গৃহস্থের দোরগোড়ায় রাখা লোহার কড়াই ভরা গম কলাই সিদ্ধ খায়, দুধ দেয়,—চলে যায়।

সহরের ঠিক মধ্যিখানে রাজার দুর্গ। সেই তোরণের পর তোরণ, দ্বারের পর দ্বার, মহলের পর মহল—অন্ধি-সন্ধি জাফরী ঘুলঘুলি তোষাখানা চোরা-কুঠরি—ঝিলিমিলি আলো-আঁধারি এদিক সেদিক—এন্তার বিস্তার।

রাজা ছেড়ে গেছেন রাজ দুর্গ দু' পুরুষ আগে। সূক্ষ্মলতার জাফরী গেছে ভেঙে, দেয়ালের নক্সা গেছে ক্ষয়ে, পাথরের থাম আর পারে না বইতে ভার। রুপোর পালঙ্ক পড়ে আছে অনাদরে কাত হয়ে। তবুও দুর্গের মাথায় পতাকা উড়ছে আজও লাল কমলা রঙের। যদুবংশের পতাকা। যদুবংশের বংশধর বলে নিজেদের জানেন এঁরা।

দুর্গের শিখরে উঠলাম। দুর্গের পরিধি দেখলাম, সহর দেখলাম, নিকট দেখলাম, দূর দেখলাম, বহু দূরের দিগন্ত দেখলাম। সব এক রঙ। সব সোনার বর্ণের, প্রাসাদ নগর পথ মরুভূমি সব।

আকাশ দেখি, আকাশও আজ স্নান করেছে সোনার জলে বেলাশেষে। যেন দিগন্তজোড়া বৃষ্টি-ধোওয়া হলুদ মরুভূমিখানি উঠে গেছে আকাশে। এখানে ওখানে কালো কালো টুকরো মেঘগুলি যেন বনকুল বাবলা কাঁটার ঝোপ ঝাড়। সীমা-অসীমের এক অনির্বচনীয় মিলন। স্বর্গের ছবি।

দুর্গ হতে নেমে এলাম। দুর্গের বাইরের দিকের চওড়া বারান্দায় শ্বেত-পাথরের সিংহাসনখানি পড়ে আছে আজও তেমনি। রাজা দর্শন দিতেন এই সিংহাসনে বসে রাজ্যের জনগণকে এককালে। হলুদ প্রাসাদের কোলে শুভ্র সিংহাসনখানি যেন একফোঁটা শিশিরবিন্দু টলমল করছে হলুদ কলকে ফুলটির গায়ে।

চোখের দেখা শেষ হয়। ধীরে ধীরে তোরণ পার হই।

দুর্গের দেউড়িতে বসেছিল একটি অন্ধ বলিষ্ঠ যুবক, ব'স বসে পা দোলাচ্ছিল। সে গান ধরল—'হায়, আমি আকনের ডাল দিয়ে যে ঘর বাঁধলাম বালির টিলার উপরে এত কষ্ট করে, ঝড় এসে সব উড়িয়ে নিয়ে গেল এক নিমেষে'।

যেন ফটিক জলে গোলা ঘন নীল রং,—স্বচ্ছ উজ্জ্বল গম্ভীর।

ভাবি, আমরা ছবি আঁকি, সাদা ছোট্ট চীনেমাটির পেলেটে হাতের কড়ে আঙুলে জল তুলে নিয়ে ফোঁটা ঝাড়ি, 'ইনডিগো' গুলে নিই—জেল্লা ফোটাতে 'প্রুশিয়ান ব্লু' একটু ছোঁয়াই—এক টুকরো কাগজে অতল সাগরের রূপ ফোটাই। আর, এই সাগর ভরা এত রং নিয়ে সে কোন্ শিল্পী ছবি এঁকে চলেছেন ভুবনজোড়া সাদা পাতার উপরে দিবসরাত্তির ধরে!

শান্ত সাগর। ছলছল জল। ঝিরঝিরে হাওয়া যেন নীল সরোবরের বুক কাঁপিয়ে চলেছে। যেন ফাল্গুনের মন্দ মন্দ হাওয়া অভিসারিকার নীলাম্বরী আঁচলখানি ছুঁয়ে ছুঁয়ে খেলছে। এই শান্ত নীল সাগরের বুকে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে চলেছে আন্দামান-জাহাজখানি।

একরাত দু'রাত তিনরাত—চাররাত শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপ দেখা দিল আন্দামানের। আকাশের গায়ে ভোরের আলো ধীরে ধীরে ফুটছে আর সাগরের বুকে কুয়াশা ফুঁড়ে দ্বীপের ঢেউ জেগে জেগে উঠছে। দ্বীপ জাগলো, বনবনানীর মাথা জাগলো, নারকেল পাতা জাগলো,—জাগলো কঠিন পাহাড় পাথর নদী, জাগলো জনমানুষের বসতি। ভোর হল।

জাহাজ এসে 'চামাথ' দ্বীপের পাশ দিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারে ভিড়ল।

ছোট্ট বন্দর। মাসে দু'মাসে জাহাজ এসে লাগে এখানে। বাইরের জগতের সাড়া আনে দ্বীপবাসীর প্রাণে। কয়েকখানি পাটাতন ফেলা বন্দরের জেটিটুকু ভরে লোক দাঁড়িয়ে আছে নানাদেশের। দক্ষিণী গুজরাটী পাঞ্জাবী শিখ মারাঠী বাঙালী ওড়িয়া বর্মী চীনা,—হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলের ভীড়ে কমলা রঙের কাপড় গায়ে বৌদ্ধসন্ন্যাসীও এক, একপাশে দাঁড়িয়ে। সকল দেশের সকল বর্ণের লোকের ভীড় এই একখানি জেটির উপরে।

কালাপানির দেশ। দ্বীপান্তরের এক আতঙ্ক সবাইকে সেদিন একমন করে রেখেছিল—সেই শুরু হতে। সবাই সেদিন নিজের দেশ নিজের জাতি সব ভুলে ছিল এইখানে। সারা জীবনের দ্বীপান্তর। কত কয়েদী ছাড়া পেয়ে আর ফিরে যায়নি দেশে। এখানেই আন্দামানের আদিবাসী বিয়ে করে সংসার পেতেছে, ঘর বেঁধেছে। এই মাটিকেই নিজের মাটি করে নিয়েছে। ভারতের সব দেশের সেই সব কয়েদীদের সন্তানরা এখন সব একজাত, 'লোক্যালবর্ন'। আন্দামান এদের দেশ, মহৎ দেশ, বৃহৎ দেশ। যে দেশ সবাইকে আপন করে ডেকে নেয় স্থান দেয়, সে মহৎ বৈকি, বৃহৎ বৈকি?

দ্বীপে বিস্তৃত বসতি। ঢেউখেলানো সবুজ টিলা দ্বীপ জোড়া। কোনো বাড়ী টিলার উপরে, কোনো বাড়ী টিলার গায়ে কোলে পায়ের তলে। কাঠের বাড়ী সব। কোনো বাড়ী খুঁটির উপরে, কোনো বাড়ী পাকা ভিতের উপরে। একতলা দোতলা ছোট বড় নানা আকারের বাড়ী। এত বাড়ী, তবু মনে হয় সব যেন ফাঁকায় ফাঁকায় আল্‌গা করে বসানো। বাড়ীর ভীড় নেই, লোকের ভীড় নেই; সবুজের নিবিড়তায় এক স্নিগ্ধ পরিবেশ।

এ দ্বীপে ফুলের শোভা নেই বলতে গেলে। থেকে থেকে কয়েকটা গোলঞ্চ

রাধাচূড়া বাগানবিলাস জবা—এই পেলাম কেবল। আর আছে যূঁই চামেলীর ঝোপ দক্ষিণ দেশবাসীর আঙিনার কোণায়, বৈকালের কুঁড়ি তুলে খোঁপার মালা গাঁথে গৃহলক্ষ্মীরা, সাঁঝবেলায় সেই ফুল ফুটে ওঠে সৌভাগ্যবতীর কালো কেশ ঘিরে। ফুল কুমকুম সধবা নারীর সৌভাগ্য-চিহ্ন।

আন্দামানে হিন্দুদের মন্দির আছে, মুসলমানদের মসজিদ আছে, কৃশ্চানদের চার্চ, বর্মীদের প্যাগোডা, শিখদের গুরুদ্বার—সব আছে। ধর্ম নিয়ে তফাতে নেই কেউ কারো কাছ থেকে। সবাই দ্বীপবাসী। লোক্যালবর্‌ন ছাড়াও ভারতের সকল দেশের লোকের ভূমি এই আন্দামান। যে এসেছে ঠাঁই পেয়েছে। যে দেশের জমি কম—তারা এসেছে। যে দেশের মাটি চলে গেল অন্যের হাতে—তারা এসেছে। নিঃস্ব যারা তারা এসেছে, যারা ধনী তারাও এসেছে।

আন্দামানের মাটিতে সোনা। আন্দামানের দ্বীপ জুড়ে বন, বন জুড়ে বনস্পতি। দরিদ্ররা গায়ে খাটে—সোনা তোলে। ধনীরা কাঠের ব্যবসা করে—বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে ঘরে বন্দী করে। তাছাড়া আছে নারকেল সুপারী অফুরন্ত। আন্দামান শ্যামল দ্বীপ, সোনার দ্বীপ,—মালক্ষ্মীর অক্ষয় বেদী।

দ্বীপের বড় সহর পোর্টব্লেয়ার। সমুদ্রের পার ধরে বাঁধানো পথ, এখানকার 'মেরিন ড্রাইভ'। পথের দুধারে নারকেল গাছের বন। আর আছে থেকে থেকে 'পিলবক্স' জাপানীদের তৈরী। গত মহাযুদ্ধে জাপানীরা এ-দ্বীপ অধিকার করে বছর তিনেক ছিল এখানে। সেই সময়কারই তৈরী এগুলি।

মেরিন ড্রাইভে এক জায়গায় উঁচু একটা কাঠের 'প্যাভেলিয়ান'। যেতে আসতে এখানে বসে সমুদ্রের হাওয়ার মুখোমুখি হয়ে খানিকক্ষণ সাগরের শোভা দেখা যায়। প্যাভেলিয়ানের সামনে জলের মাঝে 'স্নেক আয়রল্যান্ড', এক টুকরো পাথরের দ্বীপ। দ্বীপের মাঝখানে একগোছা হাল্কা গাছ। যেন বিড়ে বাঁধা অনন্তনাগ ফনা তুলে আছে, জলের উপরে।

এখানকার টুকরো টুকরো দ্বীপের হরেক রকমের নাম। ভঙ্গীর সঙ্গে ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে এদের নাম চলতি হয়ে যায়। যেমন গীটার দ্বীপ, ফ্ল্যাট দ্বীপ, সাইলেন্ট দ্বীপ, মেডিটেশন দ্বীপ,—আরো কত নাম।

মেরিন ড্রাইভের পথ ধরে বৃষ্টির জলের রিজার্ভার 'জহরলেক' হয়ে পোর্ট-ব্লেয়ার দ্বীপটা পুরো একবার ঘুরে আসি মোটরে করে। 'লিট্‌ল আন্দামান' 'কারনিকোবর' 'গ্রেটনিকোবর' 'কাচাল' 'নানকৌরি'—এখানকার বড় বড় দ্বীপগুলি দেখে ফিরতি পথে আন্দামানে কয়দিন থেকে যাবার কথা। তখন আন্দামানকে ভালো করে দেখব। কাল জাহাজ ছাড়বে। আবার কয়দিনের জন্য সমুদ্র-বাস।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। ঘরে ফিরলাম। আজান ও আরতির শঙ্খ একসঙ্গে কানে এলো।

লিট্‌ল্ আন্দামান সাগরের মাঝে ঘন বনের দ্বীপ একটি। পোর্টব্লেয়ার হতে বেশ কিছুটা দূরে। ধীরে ধীরেই এলো অবশ্য জাহাজ। লিট্‌ল আন্দামান ওঙ্গেদের দ্বীপ। ওঙ্গেরাই কেবল থাকে এই দ্বীপে। এই ওঙ্গেরাই এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন আদিম জাতি। কয়েক বছর আগেও বাইরের লোককে ঘেঁষতে দিত না দ্বীপের কাছে। তীর ছিল, ধনুক ছিল, বিষ ছিল; তীরের ফলায় বিষ মাখিয়ে বনেব আড়াল হতে ছুঁড়ে মারতো। অজানা মানুষ সম্বন্ধে এমনিই ছিল এদের আতঙ্ক।

সেই ওঙ্গেরা আজ অনেকটা বশে এসেছে, কাছে এসে হেসে দাঁড়াতে সুরু

করেছে। বিমলের কাছে এদের গল্প শুনেছি অনেক। একই জাহাজে এসেছি কলকাতা হতে আন্দামানে। আপন আনন্দে আপনি ভরপুর বিমল। সঙ্গে একটি 'বক্স' গ্রামোফোন, আর গোটা পাঁচেক অতি পুরাতন রেকর্ড। বাজিয়ে বাজিয়ে রেকর্ডগুলির এমন অবস্থা—সুরে অ-সুরে একটা ধ্বনি বাজে এখন শুধু। আর আছে একটি পিঠ-ন্যাড়া হাতল-ভাঙা ফোল্ডিং চেয়ার। বনে জঙ্গলে কাজ করতে যায় যখন, এ'দুটি তার সঙ্গী। মাসের পর মাস দ্বীপে থাকতে থাকতে একটু গান শুনতে না পেলে মাথাটা যেন কেমন করে। চেয়ারটাও নিই সঙ্গে। সারাদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে একটু আরাম করে না বসলে বেশীদিন খাটা যায় না একটানা।

দেখতাম জাহাজে দুপুরে রাত্রে সবাই যখন বিশ্রাম নিত, কি ঘুমিয়ে পড়ত,—বিমল একা আমাদের কেবিনের পাশে ফাঁকা ডেকটুকুতে হাতল-ভাঙা চেয়ারটাতে বসে মনের আনন্দে চোখ বুজে ভাঙা হাতলে তাল ঠুকত, আর পাঁচখানি রেকর্ড ঘুরে ফিরে বাজাতো।

এই রেকর্ড ক'খানার মধ্যে একখানা ছিল ওঙ্গেদের গানের। কথা সুর কিছুই না, শুধু একটা ধ্বনি। যেন নিভৃত বালুতটে সমুদ্রের ঢেউয়ের গুনগুন গজরানি। ধাক্কা দেওয়া ধ্বনি। বিমলরাই তুলেছিল এই রেকর্ড।

ওঙ্গেদের সঙ্গে ভাব জমাবার কাজে বিমল দশ বছর কাটিয়েছে এখানে আর এখানকার আশেপাশের দ্বীপে ইটালীয়ান 'এনথ্রপলজার' 'সিপ্রিয়ানী' সাহেবের সঙ্গে। সারা অঙ্গে এমনি ঘা হয়ে গিয়েছিল শেষের দিকে। মাংস গলে গলে পড়তো বনের পোকামাকড়ের কামড় হতেই হয়েছিল ঘা। কলকাতায় ফিরে বহুদিন থাকতে হয়েছিল হাসপাতালে।

কলকাতা হতে আন্দামান সারা পথ জাহাজে বিমলের কাছে ওঙ্গেদের কথা শুনতে শুনতে এসেছি। সেই রেকর্ডটা বারে বারে বাজিয়ে ওঙ্গেদের গানও আমাকে শুনিয়েছে কতবার। এখনো সেটা শুনতে শুনতে চলেছি। বিমলের উৎসাহে আমাকে শুনতেই হচ্ছে। এই জাহাজে বিমলও চলেছে শ্রীকরুণাকেতনের দলের সঙ্গে গ্রেট নিকোবরে। পথে আমাদের সঙ্গে নামবে লিট্‌ল্ আন্দামানে একবার তাদের দেখতে। পাঁচ বছর পরে আসছে সে এদিকে। মনটা উন্মুখ হয়ে আছে অতি কষ্টে আপন-করা জানা মুখগুলি দেখতে।

নীল সাগরের বুকে সবুজ দ্বীপের আভাস জাগতেই দূরবীন নিয়ে খোলা ডেকে ভীড় করেছি সকলে। যতই দ্বীপ ফুটে উঠছে দু'চোখে দূরবীনের চাপ চেপে পড়ছে। কে আগে ওঙ্গে দেখবে। কেবল গুঞ্জন উঠছে—'ওঙ্গে কোথায়, ওঙ্গে'। ভেবেছি আমরা যেমন দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি, ওরাও তেমনি আমাদের জাহাজটা দেখতে পাচ্ছে,—আর, ওরা দেখছে বহুদূর হতেই,—সমুদ্রে জাহাজের কালো বিন্দুটা ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই।

ডেকের উপরে সারি সারি মাথার সঙ্গে দূরবীনের মুখও ঘুরে ঘুরে ফিরছে। যতই জাহাজ তীরের দিকে এগোচ্ছে দূরবীনের ভিতর দিয়ে বন-রেখার এপ্রান্ত হতে ওপ্রান্ত চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে দেখতে। শিকারী দৃষ্টি সবার চোখে। পরিষ্কার বালুতট, সেখানে কালো পাথরের মতো ওঙ্গে ঘুরে বেড়ালে কতদূর হতে দেখতে পাবার কথা।

জাহাজ যতটা পারল এগিয়ে গিয়ে নোঙর গাড়লো। না, ওঙ্গে নেই, দৃষ্টি-পথে কোথাও নেই তারা।

জাহাজে শতাধিক যাত্রী, সবারই ইচ্ছা ওঙ্গে দেখে, লিট্‌ল্‌ আন্দামানে নামে। জাহাজের ক্যাপ্টেন ঝুঁকি নিতে নারাজ। কড়া হুকুম তার, আমার স্বামীর সঙ্গে মাত্র ছয়জন নামতে পারবে দ্বীপে। মনি, বিমল আগে হতেই বলে রেখেছিল চুপি চুপি,—এরা দু'জন আর তিনজন অফিসার নিয়ে আমি এক—চার, সব মিলে ছয়-জনকে নিয়ে বোট রওনা হল। ছোট বোট, ঢেউ-এ উঠিপড়ি করে এগোচ্ছে তীরের দিকে। বিমলের দৃষ্টি সোজা সম্মুখে, সে এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে বনের কিনারা, সাগরের তীর, বালির পার। দূর হতে তাদের দেখতে পাবে, দূর হতে উল্লাসের প্রতিধ্বনি উঠবে,—মনের এতখানি আগ্রহে দুঃখ জমে উঠেছে। বিমলের মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। কেবল তার একাগ্র দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে বনের প্রান্তরেখার উপরে।

একদিন নয় দু'দিন নয়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিমল থেকেছে এ দ্বীপে। এদের সঙ্গে খেয়েছে, এদের একই ঘরের ভিতরে মাচার বিছানায় রাতের পর রাত ঘুমিয়েছে। বিমল জানে এদের ভাষা, এদের সুখে দুঃখে অংশ নিতে পারে। বিমল বলে, এদের ভাষা না শিখে আমার উপায় কি ছিল? ঘুমিয়ে থাকতাম, এদের কলবল কথার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যেত। আধো ঘুমের মধ্যে এদের কথা শুনতে শুনতেই জেগে উঠতাম। দিনরাত কথা শুনে শুনে কানেরও এক রকম অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

সেই বিমল আজ চলেছে পাঁচ বছর পরে তাদের দেখতে। যাদের শিশু দেখেছে তারা হয়তো বালক হয়েছে, বালকরা কিশোর হয়েছে। বড়রা আরো বড় হয়েছে। তারা সবাই আজ তাকে দেখলে ঝাঁপিয়ে এসে পড়বার কথা। কোথায় সব?

হঠাৎ বিমল চেঁচিয়ে ওঠে—'টংকুটে'—কুয়েব্বয়—তাম্বালাই—উ-ঈ—উ-ঈ। উল্লাসে বিমল উঠে দাঁড়ায়, দু'হাত উপরে তুলে নাড়ে, আনন্দে উচ্ছ্বাসে চীৎকার করে আওয়াজ ছাড়ে—উ-ঈ—উ-ঈ।

সবাই তো আছি, দেখছি, কিন্তু বিমলের চোখেই পড়লো—বনের ধারে গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে একটা ছোট্ট কালো রঙের 'কেনো' ছিল ডাঙার উপরে তোলা। তার ভিতরে গা লুকিয়ে বসেছিল একদল ওঙ্গে। কি জানি, জাহাজ আসতে দেখে কি ভেবেছিল মনে। বিমলের ডাক শুনে কালো পিঁপড়ের মতো পিল পিল করে ছড়িয়ে পড়লো ওঙ্গেরা সাদা বালিতে। বিমলকে চিনেছে তারা, উল্লাসে নেচে উঠলো। ওঙ্গেরা নাচছে ডাঙায়, বিমল নাচছে বোটে। আর দু'দিক হতে শব্দ উঠছে—উ-ঈ, উ-ঈ।

টেনে হিঁচড়ে বোটটাকে আর একটু এগুনো গেল। বোট হতে জলে নেমে ডাঙায় উঠতে হবে, এছাড়া উপায় নেই। ঢেউ পারে আসছে যাচ্ছে, যাবার মুখে নামলে হাঁটুজল। বিমল ও মনি ধরলো আমার দু' হাত, লাফিয়ে জলে পড়লাম, সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢেউ এসে কোমর অবধি ভিজিয়ে দিল। খদ্দরের শাড়ী ভিজে আরো ভারী হল। ভারী শাড়ী ভারী দেহ, বিমল ও মনির সাহায্যে কোনো মতে ডাঙায় উঠলাম। ডাঙায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি সুরু হল। যেন অকস্মাৎই এলো বৃষ্টি।

ওঙ্গেরা বিমলকে ঘিরে ধরেছে, জড়িয়ে ধরেছে। গায়ে যাদের কিছু নেই, বৃষ্টিতে ভেজার ভাবনা কি তাদের। উপর হতে জল ঝরছে, গা গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। হাওয়ায় পল্লব নড়ে, ঝুরঝুর করে জল ঝরে পড়ে। এরাও গা ঝাড়া

দেবে, বৃষ্টি শেষের সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জল শুকিয়ে যাবে।

পুরুষ ওঙ্গেরাই ছিল বনের ধারে, মেয়েরা ছিল বনের ভিতরে। ধ্বনির ইঙ্গিতে কিলবিল করে একদল মেয়ে বন হতে বেরিয়ে এলো। মনে হল বন হতে তারা আলাদা কেউ নয়, যেন গাছেরই কালো কালো ছায়া সব। হাতে তাদের কাঁচ পাম গাছের মতো এক একটি পাতা—মাথার উপরে ধরা। চোখ আর মাথা ঢাকার ছলনা আর কি! জাপানী হাতপাখার মতো সবুজ পাতা, আসতে আসতে বনপথ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে মাথায় ধরেছে। প্রয়োজনে নয়—এও একটা খেলা। মেয়েরা এসে ঘিরে দাঁড়ালো, হাসি কথায় কলকলিয়ে উঠলো।

শান্তিনিকেতনে আমাদের সাঁওতাল মেঝেন চাঁদমনির দু' বছরের উলঙ্গ মেয়েটা ঠিক এমনি করেই হাঁটে উঠোনময়। এরা যেন সবাই সেই চাঁদমনির বাচ্চা মেয়েটা। হাসি এদের মুখে মুখে ফিরছে, তারি মধ্যে একটু বেশী হাসির রোল উঠলো যেন। আর উঠলো তা আমারই দিকে চেয়ে। একজন যেন দু'হাতে একটা ভারী জিনিস তুলবার ভাবটা দেখালো। আবার হাসির রোল উঠলো।

বিমল এরি মধ্যে আমার পরিচয় দিয়েছে তার দিদি বলে। বিমল বললো, এরা বলছে, তোমার সঙ্গে যে তোমার দিদি এসেছে, সে খুব ভারী। শুনে আমাদের দলও হো হো করে হেসে উঠলো। ওঙ্গেরা তা দেখে আবার হাসলো।

হাসি একটা সর্বদেশীয় সর্বকালীন ভাষা। কত সহজে অচেনাজন আপন হয়ে যায়, ব্যবধান ভেঙে কাছে এসে পড়ে।

নারী পুরুষ সবাই এরা আকারে ছোট। কুচকুচে কালো এদের দেহের রঙ। কালো অনেক রকম দেখেছি,—রাত্রির রঙ কালো—সব রঙ মিশে তাতে এক হয়ে যায়,—তা দেখেছি। গভীর গুহার অন্ধকার—সেই কালো দেখেছি। আরো কত কালো দেখেছি। কিন্তু এদের গায়ের এ কালো রঙ আলাদা। যেন কাঠের আগুনে রান্না করা মাটির হাঁড়ির তলাটা। শুকনো ভূষোকালি কেউ মাখিয়ে দিয়েছে এদের সর্বাঙ্গে। যেন ঝাড়লে এখুনি উড়বে রঙ। রুক্ষ রঙ। দেহের ত্বকে মসৃণতা সেই সাঁওতালদের মতো।

অঙ্গে এদের রোম নেই, পরিষ্কার চামড়া। মাথায় হালকা ছোট্ট ছোট্ট বিড়ের মতো পাক খাওয়া চুল। ঘাড়ের কাছ কানের পাশ সুন্দর করে কামানো। আগে এরা ঝিনুক ঘষে ধারালো করে তাই দিয়ে কামাতো, এখন যুদ্ধের সময়ে ভেসে আসা কাচের বোতলের ভাঙা টুকরো দিয়ে চড়চড় করে কামিয়ে ফেলে। মাথাও কামায় এরা থেকে থেকে।

বিমল এক এক করে মেয়ের হাত ধরে টেনে আনে, বলে,—এ 'চিলেমে',—চিলেমে মানে চাঁদ। এ 'মারলেই',—মারলেই মানে নারকেল। বলে, এ টওগা গেগী, চিনকো নেগী, বেট্টিবেগী, এন্-উ-গু। বলে, জানেন দিদি—এই এন-উ-গু বাচ্চা ছিল, তখন ওর মা মারা যায়। ওর ঠাকুরমা ওকে মানুষ করে। এখন কত বড় হয়েছে। বিমলের খুসী ধরে না। যেন নিজেরই কন্যা কিশোরী হয়ে উঠেছে দেখতে না দেখতে।

নারী পুরুষ সবারই এদের সুন্দর স্বাস্থ্য। টওগাগেগী এদের মধ্যে একটু পুষ্ট। বয়স এদের বোঝা ভার। আন্দাজে মনে হয় টওগাগেগীর বয়স কুড়ি বাইশ হবে। মুখের ভিতরে কি একটা লতা বা শিকড়ের টুকরো নিয়ে চিবোচ্ছিল সে। সেটা চিবোতে চিবোতেই এসে আমার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে আর আমাকে দেখছে। দেখছে, আর মুখ হাঁ করে করে শিশুর মতো লতা চিবোচ্ছে। লতার কষে দাঁতগুলি,

মাঢ়ী দু'পাটি গেরুয়া রং হয়ে আছে। কি লতা জিজ্ঞেস করাতে সে যে ভঙ্গীতে পেটটা এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেইভাবে দাঁড়িয়েই হাঁ করে মুখ থেকে লতার ছিবড়েটা জিব দিয়ে ঠেলে দিল। থুতুতে ভেজা জবজবে ছিবড়েটা থুতনিতে লাগলো বুকে পড়লো পেটে ঠেকলো, পেট হতে গড়িয়ে নীচে পড়লো। একটু উপুড় হয়ে বা কাত হয়ে মুখের জিনিস ফেলে দেবার ভঙ্গী জানে না এরা। ভালো-মন্দ শোভন-অশোভন ছুঁতে পারেনি এখনো এদের।

বিমল ছুটে ছুটে বেড়ায়। এ দ্বীপে নারকেল গাছ ছিল না আগে। বিমল বলে, আমাদের কালে আমরাই এগুলি লাগিয়েছিলাম। এখন কত বড়টা হয়েছে। বিমল জড়িয়ে ধরতে চায় গাছগুলিকে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে—গায়ে পাতায় হাত বুলোয়।

এ দ্বীপের বনে হিংস্র পশু বাঘ সিংহ নেই। আছে বুনো শুয়োর হরিণ সাপ গোসাপ।

বনের যত গভীরেই হোক না কেন, ওঙ্গেদের ঘর গৃহস্থালি দেখে যেতে হবে, মনে ছিল সখ। বিমল খবর নিয়ে জানলো এই দল ওঙ্গে অস্থায়ী বাসা বেঁধে আছে কাছেই, বনের ভিতরে। এরা তাই করে. কিছুদিন বাদে বাদেই বনের ভিতরে স্থান পরিবর্তন করে। কিছুকাল থাকে, শিকার করে, মৌচাক ভাঙে, মাছ মারে, হেসে খেলে বেড়ায়। আবার হয়তো পুরাতন ডেরায় ফিরে যায়, নয়, নতুন করে আর কোথাও ডেরা বাঁধে। ঘরের মায়া নেই এদের, নেই এদের কোন পিছটান। যত্নে যে ঘর বানায়, যে মাচার বিছানায় ঘুমোয়—সব ফেলে মুহূর্তে চলে যায়। জিনিসপত্র সরাবার ঝামেলা নেই। নিরাবরণ চিরশিশুর দল বনের ভিতরে সমুদ্র-সৈকতে হেসে খেলে ঘোরে, দেহটাকে নিয়ে যেখানে ইচ্ছে চলে গেলেই হল। বর্তমানই এদের জগৎ। যখন যেখানে থাকে, যে ঘর বাঁধে সেটাই এদের আশ্রয়।

আমাদের ঘিরে নিয়ে চললো ওঙ্গের দল তাদের নতুন বাসস্থানে। আমার ডাইনে বামে সামনে পিছনে হেলে দুলে চলেছে মেয়ের দল। চামড়ার বেল্টের মতো সরু একটা লতার বাকল, তাই দিয়ে কারো কারো পিঠে শিশুসন্তানটি বাঁধা। যেন একটা মাত্র দড়ির দোলনায় বসে আছে শিশুটি।

ঘন বন, বৃষ্টির জলে পচা পাতায় পিছল মাটি। গাছের শিকড়ে শিকড়ে জাল বিছিয়ে রেখেছে মাটিতে। তা থেকে পা আটকে আটকে রেখে পা ফেলছি। সরু একটা নালা মতো, তার উপরে একটা গাছ ফেলা, চলাচলের জন্য। পুরোনো গাছ, জলে ছায়ায় পলকা হয়ে আছে কাঠ। ওঙ্গের দল কতক লাফ দিল, নালা ডিঙোলো, কতক ঐ কাঠের উপর দিয়েই তরতর করে পেরিয়ে গেল। আমি পার হতে যেতেই মচমচ করে কাঠ ভেঙে গেল। ওঙ্গে নারীপুরুষ হেসে কুটিকুটি হল।

আমার সামনে চলেছে বেট্রিবেগী। পিঠের দিকে কোমরের কাছে ডেবে যাওয়া শিরদাঁড়া ফণা তোলা সাপের দেহের মতো ঘাড় পর্যন্ত উঠে গেছে। ছোট সুপুষ্ট নিতম্ব। ছোট্ট মেয়ের মতো দুলতে দুলতে চলেছে। ছোট্ট খুকীর মতোই ছড়িয়ে ছড়িয়ে পা ফেলে ফেলে পথ চলছে। চলছে আর ফিরে ফিরে তাকিয়ে হাসছে। সুন্দর দেহ, সুন্দর স্বাস্থ্য। মনে হল. বড় সুন্দর বড় সুন্দর। সুন্দরের কোনো মাপকাঠি নেই। স্থান-কালের অপেক্ষা শুধু। আজ এই গহন বনে বেঁটে কালো ন্যাড়ামুণ্ড উলঙ্গ ওঙ্গে মেয়েটিও এক অপরূপ সৌন্দর্য মেলে ধরলো সামনে। যত দেখি তত মুগ্ধ হই।

অস্থায়ী আস্তানা। কয়দিন থাকবে এইখানে নিজেরাই জানে না। বনের ডাল কেটেছে পাতা কেটেছে, উপরে চাল দিয়েছে, ঘরের ভিতরে মাচা বেঁধেছে।

কালই হয়তো আবার ঘর বাঁধবে আর এক জায়গায়, মুস্কিলটা কি? ঘড়ি নেই এদের, ঘড়ি ধরে সময়ের হিসাবও নেই। বনের মাঝে চলতে চলতে থামে, ঘর বাঁধে, সেই ঘর ফেলে আবার চলে।

নতুন বাসার সবুজ পাতা শুকোয়নি এখনো। কাঁচা ডালের বাসি পাতার সোঁদাগন্ধ ভুরভুর করছে। মাঝখানে একটুখানি খোলা উঠোনের মতো রেখে গোল হয়ে ঘিরে চালা তুলেছে। বনের কি গাছ জানি না, কেয়াপাতার মতো গড়ন পাতার কিন্তু লম্বায় সাত-আট হাত মতো। মোটা ঘন সবুজ রঙের পাতাগুলি কেটে এনে চালে ফেলেছে, দেখে মনে হয় সবুজ রঙের করোগেটের টিন দিয়ে চাল ছাইয়েছে। দোর ঝাঁপের বালাই নেই। দেয়াল ঘেরার ঝামেলা নেই। চালটাই সামনের দিক মাথা সমান উঁচু হয়ে পিছন দিকে মাটির সঙ্গে লাগা। বাঁশ আর ডালের খুঁটি। শোবার জন্য বসবার জন্য একই ব্যবস্থা—বাঁশ দিয়ে ডাল দিয়ে মাচান বাঁধা। আব্রু আড়াল নেই ঘরে কারো। মাঝখানে খোলা গোল উঠোন-টুকুতে মোটা মোটা কাঠে আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে বসানো আছে একটা বালতি। আজকাল মাঝে-মধ্যে যাবা আসে এখানে, এটা ওটা প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে আসে এদের জন্য সভ্যতাব নিদর্শনস্বরূপ। বালতিটাও সেইভাবেই পেয়েছে এরা। অনেক সময়ে সমুদ্রে ভেসে আসা টিন বোতলও সংগ্রহ করে সাগ্রহে।

বালতিতে দুটো বাচ্চাশুয়োর সিদ্ধ হচ্ছে গরম জলে। বাচ্চা দুটোর মাথা দুটো ঊর্ধ্বমুখী, যেন দুচোখ বুজে ছুঁচলো মুখটা তুলে গলা-জলে গা ডুবিয়ে বসে আছে। মায়ের বুকের দুধ-খাওয়া বাচ্চা,—কচি বাচ্চা বুনো শুয়োরই এরা শিকার করে বেশী। হরিণও কম। ওঙ্গেরা যা শিকার করে, যে খাদ্য আহরণ করে, দলের সবাই মিলেই তা সমান ভাগে খায়। একান্নবর্তী দল এরা।

এদের চালে গোজা একহাত লম্বা একটা সরু ডালের মতো টুকরো বিমল টেনে আনলো। পবগাছের শিকড। এব একদিকটা পিটিয়ে থেঁতো করা। অনেকটা ছবি আঁকাব ফ্ল্যাট ব্রাশের মতো। তালপাতার ডাঁট দিয়েও এরকম করা যায়। দেয়ালে ছবি আঁকবাব সময়ে বালির অস্তবার উপরে ছবির জন্য 'গ্রাউন্ড' তৈরী করতে তালপাতাব ডাঁট থেঁতলে তুলির কাজ চালিয়েছি কতবার। এও ঠিক সেই রকম দেখতে। বিমল ডালটা হাতে নিয়ে বললো,—শুয়োর সিদ্ধ হয়ে চর্বিটা যখন গলে ভেসে উঠবে, এই তুলির ডগা দিয়ে চর্বিটা তুলে তুলে সবাই চুষে চুষে খাবে। জলটা ফেলে দেবে। সিদ্ধ মাংসটা ভাগ করে খাবে। মাথাটা কুরকুর করে চিবোবে।

বুনো শুয়োর রাঁধবার আবো এক পদ্ধতি আছে। বড় বড় শুয়োরের পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের কবে আগুনে আগে লোমগুলি পুড়িয়ে নেয়। পরে থান থান করে মাংসেব টুকরোগুলি কাটে। মাটিতে গর্ত করে আগুন জেবলে তার উপরে- এরা বলে 'উলি'—'কুকিংস্টোন'—এক রকমের পাথর, সেই পাথর ফেলে দেয়। পাথর আগুনের তাতে লাল হয়ে উঠলে তার উপরে এদের বিশেষ এক রকমের পাতা আছে, সেই পাতা বিছিয়ে দেয়। পাতাব উপরে মাংসগুলি রেখে আবার সেই পাতা দিয়ে ঢেকে তার উপবে ভালো করে মাটি চাপা দেয়। ঘণ্টা দুয়েক পরে পাথরের গবমে মাংস রান্না হয়ে যায়। নুন খেতে জানে না এরা, শেখেনি এখনো।

আগুন এদের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু। আগুন চাই-ই। আগুন নিবোয় না কখনো। কারণ আগুন জ্বালতে জানে না এরা। কবে কোনকালে আগুন

পেয়েছিল সেই আগুন জিইয়ে রেখেছে একইভাবে। যখন ঘর ছেড়ে যায়, মাচা ছেড়ে যায়, বনের এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় যায়, হাতের তীর ধনুক টোটা দা ছাড়া কেবল একটি জিনিসই যত্নে সঙ্গে নিয়ে যায়, তা হচ্ছে এই আগুন। সবার হাতে হাতেই একটি করে জ্বলন্ত ডাল থাকে। জলে ঝড়ে নিভলেও সব কয়টাই নিভে যায় না একেবারে।

বনে ধুপ প্রচুর, রজন প্রচুর। ধুপ রজন জ্বালায় ঘরে, মশা সাপ আসে না গন্ধে। বন হতে মধু সংগ্রহ করা বিশেষ কাজ ওঙ্গেদের। নারীপুরুষ দুই-ই এই কাজ করে। বনে এক রকমের গাছের পাতা—অনেকটা জামরুল পাতার মতো,—সেই পাতা চিবিয়ে থুতুর সঙ্গে রস হাতে নিয়ে তেল মাখার মতো সারা গায়ে মাখে। খানিকটা চিবোনো পাতা, রস মুখে রেখে দেয় মুখভরা জলের সঙ্গে মিশিয়ে। তারপর গাছে উঠে মৌচাকের কাছাকাছি গিয়ে মুখ হতে সেই রস ফু-ফু করে চাকে ছিটিয়ে দেয়। সব মৌমাছি চাক ছেড়ে উড়ে যায়। সহ্য করতে পারে না এই গন্ধ মৌমাছিরা।

কাঠ খুদে বালতির মতো বানায় ওঙ্গেরা, তা থাকে পিঠে বাঁধা। সেই বালতিতে চাকটা কেটে নিয়ে নেমে আসে। বনে প্রচুর মধু। ফলও বহুতরো।—লটকা, ডেউয়া জাতীয় ফল, কাঁঠালের মতোও এক রকম ফল আছে। আরো নানা ফল—দেখা হল না, সময় হল না। বনের ফল বনের মুল ফুলের মধু বুনো শুয়োর সমুদ্রের মাছ আর রাশি রাশি ঝিনুক এদের খাদ্য।

দাঁত এরা মাজে না, মজাতে জানে না। গা ধোবার প্রয়োজন বোধ করে না। মাটি কাদা গায়ে লাগে, শুকিয়ে আপনি ঝরে পড়ে গা হতে।

ওঙ্গেদের মধ্যেও আছে সমাজবিধি। এদের মধ্যে দল দল ভাগ করা আছে, সেই সেই দলেই বিয়ে করতে হয়। অন্য দলে কাজ চলে না। অনেক সময়ে কোনো যুবতী মেয়ে নেই বলে, যুবক ছেলেকে বিধবা প্রৌঢ়াকেই বিয়ে করতে হল—এমনও হয়। বহুক্ষেত্রে এই রকম বিয়েতে সন্তান-সন্ততি হয় না।

ওঙ্গেদের বংশ খুব বেশী বাড়ে না। এমনিতেই এদের সন্তান হয় কম। যাও-বা হয়, জল আছে ঝড় আছে, বুনো জানোয়ার আছে, বিষাক্ত পোকা-মাকড় সাপ আছে, দৈব-দুর্ঘটনা আছে। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে আঙুলে গোনা কয়েকটা। শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশী।

দৈহিক নিয়ম অনুসারে মেয়েরা যুবতী না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে হয় না। এদের জীবনেও নানা অনুষ্ঠান আছে। মেয়ে প্রথম যুবতী হলে তাকে তিনদিন ঘরের ভিতরে মাচার উপরে বসিয়ে রাখে। তিনদিন পরে অন্য মেয়েরা তাকে বাইরে নিয়ে যায়—স্নান করিয়ে আনে। স্নানের পরে সবাই মিলে সাজাতে বসে মেয়েকে।

দু'রকমের মাটি,—একটা সাদা মাটি আর একটা লোহার মরচে পড়লে যে রঙ হয়—সেই রঙের মাটি। আমরা বলি 'রেড অক্সাইড', এখানে বলবো গেরিমাটি। এই সাদামাটি আর গেরিমাটিই প্রসাধনের উপকরণ। মেয়েদের মধ্যে যারা সাজাতে দক্ষ, তারা মুখে জল নিয়ে হাতের তেলোয় সেই জল ছিটিয়ে মাটির চাকাটা হাতে ঘষে। পরে ঘষা চন্দনের মতো থকথকে মাটিটা নতুন যুবতীর মুখে গায়ে লেপে দেয়। অঙ্গের কোথাও দেয় সাদা মাটি লেপে, কোথাও দেয় গেরিমাটি। থুতুতে জলে পদার্থটা আঠার মতো কাজ করে। মাটি মাখানো হয়ে গেলে একটা বেতের ফালি কাঠি দু'ভাঁজ করে তা দিয়ে ভিজে মাটির উপর আঁচড় কেটে কেটে নক্সা অনুযায়ী মাটি চেঁছে ফেলে। যে জায়গার মাটি তুলে নেয় সেখানে দেহের রং

ফুটে ওঠে। সাদামাটি লালমাটি আর দেহের কালো রং—তিন রং মিলিয়ে সারা অঙ্গে আঁচড় কাটা নক্সা হয়। বেতস বনের ডোরাকাটা আলোছায়ার খেলা এক—যুবতীটি। বেশ সময় লাগে এই প্রসাধনে। থুতু এদের বিশেষ উপাদান। গালের দিকে নক্সা কাটতে কাটতে হয়তো থুতনীর মাটি শুকিয়ে এলো, তাড়াতাড়ি থুতু ছিটিয়ে মাটি ভিজিয়ে নিল।

নতুন যুবতীর সাজ হয়ে গেলে নাচ-গান হয়, খাওয়া-দাওয়া হয়। সেইক্ষণেই সে বিবাহের উপযুক্ত হল বলে জানলো সবাই।

এই দলের 'পো-রাঙা-বেগী'—ছোট মেয়েটা কয়দিন আগেই যুবতী হল। মাটির নক্সা এখনো মিলিয়ে যায়নি দেহ হতে।

ওঙ্গে পাত্র-পাত্রী নিজেরাই নিজেদের বিবাহ ঠিক করে জানায় দু'পক্ষের পিতামাতাকে। অনেক সময়েই জানাবার প্রয়োজন হয় না, পিতামাতা টের পায় তাদের সন্তান কোথায় যায়, কার কাছে যায়। অভিভাবকরা তখন নিজেদের মধ্যে একদিন দিন ঠিক করে। পাত্রীকে নিয়ে আসে পাত্রের বাড়ীতে। ঘরের ভিতরে একটা মাচায় ব'স পাত্র, একটা মাচায় বসে পাত্রী। পাত্রকে বলা হয় পাত্রীর হাত ধরে তার মাচায় তুলে নিতে। বর মাচা হতে নেমে এসে কনের হাত ধরে টানে। লাজুক কনে একটু একটু করে এগোয়, যেন জোর করেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভাবটা। বর কনেকে নিয়ে মাচায় তোলে। বর বসে, কনে বসে বরের কোলে। ধীরে দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করে। নিঃশব্দে দুতিন মিনিট সেই আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। বিয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। বর-বৌ নেমে আসে। গুরুজনদের কোলে বসে, সবাইকে এক এক করে সেইভাবে আলিঙ্গন করে। শ্রদ্ধা সম্মান-দেখাবার এই রীতি এদের।

লিকলিকে মেয়ে 'এন্‌টন্‌জা-লয়' বালিকা বললেই হয়,—এর বিয়ে হয়েছে গেল পূর্ণ-চাঁদে। এন্‌টন্‌জা-লয়-এর দু' কাঁধে কনুইয়ের ভর দিয়ে জোয়ান 'তাইবে' দাঁড়িয়ে আছে সামনে। চওড়া বুকের সবটা দিয়ে যেন আগলে আছে আপন সম্পত্তি। ভীরু মেয়ের সকল নির্ভয় 'তাইবে'র বুকে, 'তাইবে'র চোখে।

বিবাহ এদের অপরিহার্য। জীবনযাত্রা চলে না দুজন না হলে। নারী-পুরুষের কাজ আলাদা আলাদা ভাগ করা। তাই দুজন নইলে পূর্ণ হয় না জীবন-ধারণ। মেয়েরা জাল দিয়ে ছোট মাছ ধরবে,—কাঁকড়া ঝিনুক তুলবে, বনের ফল-মূল সংগ্রহ করবে। ছেলেরা করবে শিকার, তীর ধনুক দিয়ে বড় বড় মাছ মারবে। উঁচু গাছের ফল পাড়বে, মগডালের মৌচাক ভাঙবে। নারী-পুরুষের মিলিত পরিশ্রমে জীবন চলবে।

দুটো জাল নিয়ে কাঁকড়া ধরে মেয়েরা। কাঁকড়া ধরতে দুটো জালই লাগে। এক হাতের জাল দিয়ে জল হতে কাঁকড়া তুলে অন্য হাতের জালটা উলটে জালের মুখটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে দেয় এটার মুখে। মস্ত মস্ত কাঁকড়া। এর দাঁড়া দিয়ে এরা পাইপের কাজ চালায়। দাঁড়ার টুকরোগুলি ধুয়ে পরিষ্কার করে তাতে তামাক পাতা পুরে দাঁতে চেপে পাইপের মতো টানে। খুব হাসিমুখে আমেজ করেই এই পাইপ খায়। আজকাল তামাক খেতে শিখেছে এরা। বাইরের লোক যখন আসে এ দ্বীপে, নুন তামাক নিয়ে আসে দেবার জন্য। এই করে করে ভাব হয়েছে এদের সঙ্গে এতকাল পরে।

বর্মা হতে সমুদ্রে ভেসে আসা মোটা বাঁশ পারে এসে ঠেকে মাঝে মাঝে। সেই বাঁশ দিয়ে খাবার জলের বাসন বানায়। কবে কোন দুর্যোগে কোথায় জাহাজ-

ডুবি হল, কোন্ ভাঙা জাহাজের কবেকার লোহালক্কর টুকরো টুকরো হয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে একদিন পারে এসে লাগলো,—পাথর দিয়ে সেই লোহা পিটিয়ে তীর বানালো। শক্ত কাঠের তীরও বানায়। আর বানায় পাথরের তীর—ঘষে ঘষে ছুঁচোলো করে নিয়ে।

শিশুর যখন জন্ম নেবার সময় হয়, প্রসূতির সঙ্গে তার স্বামীও পাশের মাচায় শুয়ে শুয়ে প্রসববেদনা অনুভূতিতে অনুভব করে। মায়ের মতো পিতাও যন্ত্রণায় কাতর হয়। সে সময়ে প্রসূতির স্বামী ছাড়া আর কোনো পুরুষ লোক থাকে না সে ঘরে। মেয়েরা থাকে—মায়ের কোলের শিশুরা থাকে—আর থাকে বালকরা। বালকদের থাকা নিষেধ নয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে প্রসূতির স্বামী তখন উঠে পড়ে। তার তখন অনেক কাজ। মধু পেড়ে আনতে হবে, কাঠ কেটে আনতে হবে, বিশেষ গাছের বাকল ছাড়িয়ে আনতে হবে। লম্বা পট্টির মতো প্রসূতির তলপেট শক্ত করে জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধে দেয় এই বাকল দিয়ে। প্রসূতির খাবারও তখন তাড়াতাড়ি স্বামীকে সংগ্রহ করে আনতে হয়। অনেক কাজ।

এদিকে বয়স্কা মেয়েরা তখন লেগে যায় প্রসূতি ও শিশুর সেবার কাজে। প্রথমে পাতা দিয়ে সদ্যোজাত শিশুর গা পরিষ্কার করে। পরে সেই রকম গেরিমাটি ও সাদামাটি—সাদামাটিকে বলে এরা 'ওয়েকালা',—এই দুই মাটি তেমনিভাবেই মুখের জলেতে থুতুতে মিশিয়ে হাতে নিয়ে শিশুর সর্বাঙ্গে লেপে দেয়। আগুনের তাপে দুহাত গরম করে করে শিশুকে খুব ভালো করে সেঁক দেয়। বাঁশের চাঁচ দিয়ে এরা শিশুর নাড়ী কাটে।

এই এক ঘরের মধ্যে এদের সবকিছু। কেউ মরে গেলে শবদেহ এরা বাইরে নিয়ে যায় না। যে মারা গেল তার মাচারই নীচে বড় করে গর্ত করে। পরে দুহাতে চোখ ঢাকা, হাঁটু মুড়ে বসা অবস্থা—এই ভঙ্গিতে শবকে এনে লম্বা বাকল দিয়ে বেঁধে সমুদ্র-শিয়রী করে সেই গর্তে শুইয়ে দিয়ে মাটি চাপা দেয়। এই সময়ে তিন চাঁদ পর্যন্ত এদের শোকের সময়। এরা গুনতে জানে না। তিন পর্যন্ত হিসাব রাখতে পারে শুধু। এরা দেখে আকাশে একবার চাঁদ গোল হল, আবার গোল হল, আবার হল। তিন গোল চাঁদ হয়ে গেলেই মাটি খুঁড়ে মৃতের চোয়ালের হাড়টা শুধু বের করে নেয়। এখানকার মাটির গুণ হোক, বা সমুদ্রের জল হাওয়া নুন—যে কোনো কারণেই হোক, তিন মাসেই শবদেহ গলে মিশে যায়। চোয়ালের হাড়টা তুলে নিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলে। 'টি-বচু' গাছের আঁশ আঁকের মতো কিন্তু আরো সরু আর আরো লম্বা গাঁট, সেই টি-বচু গাছের আঁশ হতে বের করা সুতো লাল মাটি সাদা মাটিতে রাঙিয়ে সেই সুতো দিয়ে চোয়ালের সামনের দাঁতের পাটি থুতনীর কাছটা ঘিরে পুরো চোয়ালটা জড়িয়ে জড়িয়ে নক্সা করে। যে ব্যক্তি শবদেহ মাটিতে পুঁতেছিল সে প্রথমে সেই চোয়ালটা মালার মতো গলায় ঝোলায়। তারপর আত্মীয় আপনজনরা এক এক করে সবাই একবার এই মালা গলায় পরে। কিছুদিন এইভাবে মালাটি গলায় গলায় ঘুরবার পর তা বাইরে বনে একটা জায়গায় পুঁতে দেয়, নয়তো সমুদ্রে ফেলে দেয়। বিমল বলল, এদের পরিত্যক্ত ঘর খুঁড়লে যে সব কঙ্কাল পাওয়া যাবে, দেখবেন কোনোটাতে চোয়ালের হাড় নেই।

যেদিন মৃতের চোয়ালটা তোলে সেইদিনটা হলো যেমন আমাদের শ্রাদ্ধদিবস, —তেমনি।

চোয়ালটা গলায় ঝোলাবার পর ঘরের মধ্যিখানে যে সর্বক্ষণ আগুন জ্বলে, সেই আগুন ঘিরে আত্মীয় বান্ধবরা সবাই নাচে। এই অনুষ্ঠানে কেবল বড়রা— বিবাহিতরাই থাকে। তারা একবার করে নাচে আর অন্যের কোলে বসে মুখোমুখি দুজনে ফুঁপিয়ে কাঁদে; আবার উঠে নাচে। চীৎকার করে এরা কাঁদে না, ফোঁপানোই এদের কান্না। এই কান্নায় চোখের জল পড়ে বৈকি? জল পড়ে— চোখ দিয়ে নাক দিয়ে জল পড়ে। এই পালা সাঙ্গ হলে উঠে পড়ে। তখন হাসি, নাচ খাওয়া গান হয়। শোকের কালের শেষ হয়।

চাঁদকে ওঙ্গেরা ভালোবাসে। চাঁদের আলো ভালোবাসে। চাঁদ যে সরু থেকে বড় হয়, বড় হয়ে আলো বেশী দেয় এই বোধটা আছে। পূর্ণ চাঁদের আলোয় ঘরের বাইরে এসে নাচে সেদিন। গভীর রাত অবধি নাচে।

নারী পুরুষে অবৈধ আচার নেই এদের মধ্যে। কদাচিৎ যদি ঘটে এমনি—শাস্তি-বিধান আছে সেজন্য। বিমল বলেছিল, তারই আমলে ঘটেছিল এমন ঘটনা একটা। 'ওয়াগেগী' ছিল সবচেয়ে সুন্দরী যুবতী এদের মধ্যে। যেমন স্বাস্থ্য-বতী, তেমনি শ্রীমতী; লাবণ্যময়ীও। এমনটি আর একটিও ছিল না এ বনে। বিমল বলে, ওয়াগেগীর স্বামী 'ওফেগীলি' থাকে আমার সঙ্গে, যেখানে যাই সঙ্গে সঙ্গে যায়। কখনো বা বনের ভিতরে কয়েকদিন কেটেই গেল। সে সময়ে সিপ্রায়েনী সাহেব কিছুদিনের জন্য বাইরে গেছেন, আমি একলাই আছি।

এই রকম একদিন ঘুরতে ঘুরতে কয়েকদিনের জন্য বনের গভীরে চলে গেছি। ফিরে এসে শুনি একটা কিসের গোলমাল। চিনকোগেগী,—মেয়েটাকে আমি খুব ভালোবাসতাম, বাচ্চা মেয়ে; তার বাপ নাকি দোষী ওয়াগেগী সম্বন্ধে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াগেগীর স্বামী উধাও সামনে হতে। হৈ হৈ কান্ড। ততক্ষণে চিনকোগেগীর বাপ প্রাণভয়ে বনের ভিতরে গাছের উঁচু ডালে উঠে গেছে। উঠে গিয়েও নিস্তার নেই। ওয়াগেগীর স্বামী নীচ হতে তাকে তীর ছুঁড়েছে। অনেক করে ওয়াগেগীর স্বামীকে ঠান্ডা করে চিনকোগেগীর বাপকে গাছ হতে নামিয়ে আনা হয়। তখনো তীরটা তার পিছনের মাংসে গাঁথা, ঝুলছে। আমিই টান মেরে তীরটা খুলি। চার ইঞ্চি লম্বা পাথরের ধারালো তীর। আমার সঙ্গে যা ওষুধ ছিল তাই দিয়ে ক্ষতস্থান কোনমতে বেঁধে দিই।

বহু চেষ্টায় সেবারে এ ব্যাপার ঠান্ডা হয়। আমি যখন চিনকোগেগীর বাপকে শুইয়ে তার পিছনে ওষুধ লাগাচ্ছি, তার বৌ খবর পেয়ে এসে রাগে গর্জন করতে করতে লাথি মারতে লাগলো তার স্বামীর মুখে।

বিমলই বলে, এই কয়েক বছর আগে দুজন বর্মী ব্যবসায়ী নৌকো নিয়ে ঝিনুক শামুক সংগ্রহ করে বেড়াতো দ্বীপে দ্বীপে। একদিন এলো এই দ্বীপে,— মাছ ধরছিল সমুদ্রে মেয়েরা, এক মেয়ের উপরে অত্যাচার করলো। পুরুষেরা কেউ ছিল না ধারেকাছে, শিকারে গিয়েছিল। ফিরে এসে যখন শুনলো, সঙ্গে সঙ্গে বর্মী ব্যবসায়ী দুজনকে বর্শা দিয়ে গেঁথে মেরে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। দিয়ে, এতখানি সমুদ্রপথে 'কেনো' ভাসিয়ে পোর্টব্লেয়ারে এলো বলতে যে, তারা এই করেছে।

বর্মীদের মেরেছে বলে এদের কোনো শাস্তি পেতে হল না। প্রথমত ব্যবসায়ীরা বেআইনী এসেছিল এদের দ্বীপে। এদের দ্বীপে অনুমতি ব্যতিরেকে আসা বারণ সরকারের। দ্বিতীয়ত দোষ করেছিল তারা। আমি সেদিন ছিলাম পোর্টব্লেয়ারে। আমি তো এদের ভালো করে খাইয়ে দিলাম আরো, মাছ মাংস

নিজের হাতে রান্না করে। আমাদের রান্না কিন্তু বেশ খায় এরা। ভাতও খায়। দেখলাম তো কয়েক বারই।

দিল্লী হতে আমরাও উপহার এনেছি ওঙেগদের জন্য, গোটা চল্লিশেক প্যাকেট। প্যাকেটে আছে তামাক পাতা, নুন, দেশলাই, আর লাল কাপড়ের একফালি টুকরো;—যদি কাপড় পরতে শেখে এইভাবে। সবাইকে একটা করে প্যাকেট দেওয়া হল। তামাক পাতা পেয়ে সবাই খুশী। দেশলাই, নুনটা বৃষ্টিতেই ভিজে গেল। লাল কাপড়ের টুকরোটা নাড়ল চাড়ল, কি করবে বুঝতে না পেরে কেউ মাচার উপরে ছুঁড়ে রাখলো, কেউ রাখলো গাছের ডালে ছুঁড়ে। তামাক পাতাটা কিন্তু যত্ন করেই রাখলো সবাই। পাম গাছের মতো গাছের কাঁচ পাতাটায় তামাকটা মুড়ে বেঁধে রেখে দিল। ঠিক যেন একটি কেয়াফুল দেখতে হল।

বেট্টিবেগী আপন মাচায় উঠে সরু মাচার দুদিকে দুই পা ঝুলিয়ে ঘোড়ায় চড়ার মতো করে বসলো। দু' হাঁটুতে দু'হাত রেখে বসে বসে হাসতে লাগলো। যেন রাজরানী বসেছে সিংহাসনে—ভাবখানা। বেট্টিবেগীর হাসিখানিই বারে বারে আমার মন টানছে। সবার দিকে তাকাই, তারা কি বলে বিমলের কাছ হতে বুঝে নিই, আমি যা বলি বিমলকে তাদের বুঝিয়ে বলতে বলি, আর ফিরে ফিরে বেট্টি-বেগীর দিকে চাই। সেও হাসে, আমিও হাসি। বেট্টিবেগীর চালার কাছে এগিয়ে আসি। বেট্টিবেগীর চালার সামনে ঝোলানো কাঠের বালতিতে মধু—শক্ত একটা লতার তুলি হাতে ডোবানো। শিশু বৃদ্ধ যার যখন মন চায় মধুর তুলি তুলে তুলে চোষে, আবার ডুবিয়ে রেখে দেয়। বেট্টিবেগীর আহ্লাদ হয়েছে বেশ বুঝতে পারছি। আমাদের দেখে, না, তাকে আমরা বিশেষ ভাবে দেখছি সেইজন্য আহ্লাদ,—কি জানি, আহ্লাদে দুলতে দুলতে উঠে মধুর তুলিটা তুলে খানিক চুষে মধু খেয়ে নিল।

বেট্টিবেগীর মাচার পাশে তার স্বামীর প্রৌঢ়া বোন—বিধবা, উঁচু হয়ে বসে সরু বেত দিয়ে টুকরী বুনছে। ফল পাড়তে যখন গাছে ওঠে, বাকলে বাঁধা সবার পিঠে এই রকম টুকরী থাকে এক একটা। সুন্দর বুননি। বেট্টিবেগী তার টুকরী-টাই দিয়ে দিল, যেন ফল পাড়তে দরকার হবে আমার। বেট্টিবেগীর স্বামী দিল তার তীর ধনুকটা। তারও আহ্লাদ হয়েছে, নিজে সে আর একটা বানিয়ে নেবে কালই।

এখানে এই যে এদের ঘর দেখলাম এ তো দুদিনের ঘর। এদের আসল ঘর দেখবার ইচ্ছে ছিল। কোথায় কোনখানে সেই ঘর, দিনও শেষ হয়ে এলো, সময়েও তো কুলোবে না।

বেট্টিবেগীর কাছ হতেই খবর পাই, এদেরই ছেড়ে আসা বাড়ী সমুদ্রের ধারেই, একটু দূরে। যাবো কি? দিন থাকলেও বনে অন্ধকার ঘনিয়েছে। চারদিকে তাকালাম, ভাবলাম। বললাম, না,—যাবো।

দলের অনেকে ক্ষুব্ধ হলেন। ভয় পেলেন জাহাজে উঠতে হবে সমুদ্রপথ বেয়ে। তরঙ্গের ঐ তো অবস্থা। দিনের আলো থাকতে থাকতে যাওয়াই নিরাপদ।

মনি, বিমল, বেট্টিবেগী ও তার স্বামীকে নিয়ে ততক্ষণে চলতে সুরু করেছি। চলছি না তো, ছুটছি। বেট্টিবেগী তাড়াতাড়ি একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ হাতে তুলে নিল। আমার হাতে কাঠের খণ্ডের মতো এক চাবড়া রজন তুলে দিল। বেট্টিবেগী খুব খুশী, খুব আগ্রহ তাদের আসল ঘর দেখাতে। বলেছিলাম কিনা, যে, দেরী হয়ে যাবে, রাত হয়ে যাবে, অন্ধকার হয়ে যাবে—ফিরবো কেমন করে? তাই

বৌট্টবেগী রজনটা দিল, বললো, যাবার সময়ে এইটে জ্বালিয়ে নেবে, পথ দেখতে পাবে। এই রজন এমনি করেও জ্বালায়, আবার এ দিয়ে টর্চও তৈরী করে এরা। কাঠকয়লা গুঁড়ো করে রজন গুঁড়ো করে মিশিয়ে পাতায় জুড়ে লম্বা লম্বা টর্চের মতো বানায়।

বৌট্টবেগী চলেছে আগে আগে। নেচে নেচে চলেছে। হাতের জ্বলন্ত কাঠখানা রেখেছে হাওয়া-মুখী করে, সমুদ্রের জোর হাওয়া লেগে আগুন পুরপুর শব্দে জ্বলছে, ফুলকি ফুটছে। পায়ের কাছে জমিটাতে বেশ কিছুটা আলো পড়ছে।

সমুদ্রের পার ধরে চলেছি, পরিষ্কার বালি। পথ চিনতে কষ্ট নেই, কেবল শুকনো বালিতে প্রতিপদে পা বালির ভিতরে ঢুকে ঢুকে যাচ্ছে। বিমল এক রকম আমাকে টেনে টেনে নিয়ে চলেছে। সময়ের তাড়া, সঙ্গীদের তাড়া, জাহাজে ফিরবার তাড়া,—সব ছাপিয়ে রাত্তির বেলা বোট হতে সিঁড়িতে ওঠা জাহাজে ওঠা,- সে এক আতঙ্ক।

সমুদ্রের পার থেকে একটুখানিক বনে ঢুকে পেলাম ওঙ্গেদের আসল বাড়ী। গোল বাড়ী। বাড়ীটা ঘিরে বাইরের খানিকটা জমি লতাপাতা কেটে পরিষ্কার করা। সমুদ্রের কাছাকাছি জমি, মাটিতে বালিই বেশী। প্রথম রাতের আবছা আলোতেও ঝকঝক করছে বালি জমি। পাশে স্তূপাকার ঝিনুকের খোলা, যেন ঝিনুক দিয়ে বেড়া ঘিরে রেখেছে বাড়ীর সীমানা। বাড়ীর আবর্জনা দেখে নাকি সে বাড়ীর সভ্যতা বোঝা যায়; এদের আবর্জনা একমাত্র এই ঝিনুকের খোলা। কত ঝিনুক না জানি খেয়েছে এরা—এই এক ঘরের লোকেরা। মুড়ি-মুড়কীর মতো ঝিনুক খেয়েছে।

শক্ত মজবুত বাড়ী। বড়। গোল একটি মাত্রই ঘর। এই একটি ঘরই একটি গ্রাম। দলের সব লোকরা থাকে এই ঘরে। ঘরের দেয়াল বলে কিছু নেই। উপর হতে গোল চালটাই নেমে এসে মাটি ছুঁয়েছে। একটি মাত্র ছোট্ট দরজা, তাই দিয়েই সবাই ঘরে ঢোকে, বাইরে আসে। দিনের আলোও ঢোকে না এঘরে। ঘাস, পাতা, ডাল দিয়ে পুরু করে চাল ছাওয়া।

বৌট্টবেগীর হাতের জ্বলন্ত কাঠটা নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। গোল ঘরের মাঝখানে খানিকটা গোল জমি ছেড়ে চারদিক ঘিরে ছোট ছোট বাঁশের মাচা—গোল হয়ে নেমে পড়া চালের সঙ্গে গা-লাগা। দু'হাত আড়াই হাত উঁচু কাঠের খুঁটির উপরে নিপুণ মাচাগুলি ছোট ছোট খাটের মতো। লম্বায় একটু বেশীই ছোট, পা মুড়ে শোয় এরা। এই এক একটি মাচায় বাবা মা তাদের শিশু-সন্তান-দের নিয়ে শোয়। সন্তানরা বড় হলে সবাই যখন আঁটে না এক মাচায়, তখন পাশের মাচাতে বড় সন্তানরা ঘুমোয়। বাঁশের বাতা আর বেত দিয়ে তৈরী মাচাগুলি। গায়ের ঘষায় ঘষায় চকচকে মোলায়েম হয়ে আছে। মাচার চারদিকে ডাল বাঁধা - ফ্রেমের মতো, মাথার দিকের ডালটা একটু মোটা। এটাই এদের বালিশ। এই ডালটায় মাথা রেখে ঘুমোয়। যেখানে যেটুকু এদের হাতের কাজ,—বড় নিপুণ।

এই রকম এক এক ঘরে এক এক দলের পুরো লোক থাকে। যেমন এই দলে ছিল চৌত্রিশজন। আপন আপন মাচার মাথার উপরে চালে গোঁজা থাকে আপন আপন সম্পত্তি,—তীরধনুক, ফল পাড়বার টুকরী, আর কচি বেতস পাতার শুকনো গোছা। এই জিনিসটি মেয়েরা সর্বদা হাতে মজুত রাখে।

বেতস লতার কচি ডগাটা কেটে আনে জঙ্গল হতে। ডগার ঠিক মাঝখানের

না-খোলা পাতাটা টেনে বের করে নেয়। সেই মুড়ে থাকা নরম কচি হালকা সবুজ পাতাগুলি নখ দিয়ে সরু সরু করে চিরে ঘরের ভিতরে চালের বাতায় ছায়াতে ঝুলিয়ে রাখে। রোদে শুকোলে মড়মড়ে হয়ে যায়, গুঁড়িয়ে যায়। ছায়ায় শুকিয়ে এ পাতার রঙ হয় উজ্জ্বল খয়েরী—যাকে বলে গোল্ডেন ব্রাউন, আর মোলায়েম হয় পশমের মতন। এই নরম পাতাগুলি গোছা সমেত দু'ভাঁজ করে ফুদনার মতো বানিয়ে ডগার দিকটা ঝিনুক দিয়ে পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে সমান করে কাটে। দেখতে হয় যেন সোনালী খয়েরী রং-এর একটি বড় কদম ফুল। এই ফুলটি মেয়েরা 'মারে কেয়াগে'র পাতা দিয়ে বিনুনী করা বেল্টের মতো সরু ফিতেয় ঢুকিয়ে কোমরে বাঁধে। ফুলটি সামনে ঝোলে। চলার সঙ্গে নাচে দোলে; কিন্তু স্থানচ্যুত হয় না কখনো।

ওঙ্গে মেয়েদের সকল লজ্জার আবরণ এই একটি ফুল।

ওঙ্গেরা ঘর ছাড়ার কালে সঙ্গে নেয় শুধু আগুন, আর মেয়েরা নেয় একটি জিনিষ—এই বেতস পাতার শুকনো গোছা। জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দুটি বস্তু।

রাত হয়ে গেছে। বোটে উঠলাম। দ্বীপের কালো বনের মাথায় শুক্লা তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী। লিটল্ আন্দামান—ওঙ্গেদের আপন স্থান। সাদা বালুতটে দাঁড়িয়েছিল তারা। বোট ছাড়লো। বনের ঘন অন্ধকারকে সমতরো করে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

কার-নিকোবর

নীলের কোলে এই শ্যামলের শোভা কেমন করে ধরি।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ এসে পৌঁছলো কার-নিকোবর দ্বীপের সামনে। জাহাজ হতেই দেখি দ্বীপভরা শুধুই নারকেল গাছের ঝোপ। বন নয়, নারকেল গাছের যেন ঘনঠাস জঙ্গল।

মাইলখানেক দূরে জাহাজ নোঙর গাড়ল। জাহাজ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে ছোট মোটর বোটে উঠলাম। বোট এগিয়ে চললো। সবুজ দ্বীপের ধার ঘিরে বালুতট রোদের আলোয় রুপো হয়ে জ্বলছে। কোরাল-ভাঙা বালি, শুভ্রতার বর্ণ। জলের নীচে কোরাল ছড়ানো। একেই জলে ময়ূরকণ্ঠী রঙ তার সব রঙ নিয়ে নিয়ে খেলা করছে। সাগর জলে নীল সবুজের এত রঙ এত বাহার আর এত কাছ হতে—এ আর দেখিনি আগে; অপূর্ব।

তীরের কাছাকাছি এসে বোট থামলো। ঘাট হতে একটা 'কেনো' এগিয়ে এলো। বোট আর এগোবে না। এই জলপথটুকু 'কেনো'তে যেতে হবে। ছোট্ট কেনো; দুই নিকোবরী দুই বৈঠা হাতে তাতে, আর দুজন মাত্র যাত্রী উঠবে এতে। আমার স্বামী আর আমিই হলাম প্রথম যাত্রী।

লম্বা সরু কেনো। একটা গোটা গাছ খুদে তৈরী এদের নৌকো। কেনোর

একপাশটায় একটু তফাতে কেনোর মাপে একটা লম্বা কাঠ পাশাপাশি ভাসে জলের উপরে, দুদিকে তার দু'টুকরো কাঠ দিয়ে কেনোর সঙ্গে জোড়া। একা কেনো তাল রাখতে পারে না ঢেউ-এর সঙ্গে, উল্টেপাল্টে পড়ে। এই লম্বা কাঠখানি কেনোর ভারসাম্য রাখে। কেনোকে অকূল সাগরে বেসামাল হতে দেয় না।

তীরের কাছে আসতে কয়েকজন নিকোবরী তৈরী ছিল জলে নেমে পড়ে কেনো ধরলো, সমুদ্রের ঢেউ পারে গিয়ে ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে কেনোটাকে টেনে বালির উপরে এনে ফেললো। ঢেউ চলে গেল, আমরা ডাঙা পেয়ে গেলাম। এবারে আর ভিজলাম না।

শুকনো সাজে শুকনো পায়ে বালিতে নেমে পড়লাম। তীরে দাঁড়িয়েছিলেন বিশপ রিচার্ডসন, পরনে বেগুনি রঙের সিল্কের লম্বা সাজ;—নীল সবুজের মাঝে রঙটি যেন এক আঁজলা কোমলতা। মনটা খুসীতে উপচে উঠলো। বিশপের সঙ্গে ছিলেন দ্বীপের কাপ্তেন, ক্যাপটেন, স্কুলের ছাত্রছাত্রী বহুজন, আর ছিলেন লাহিড়ীভাই—দিল্লীতে ছিলেন, আমার মেজদার বন্ধু। এইখানে অপ্রত্যাশিত এই চেনামুখ প্রাণে সন্তোষ ঢেলে দিল।

সবার হয়ে বিশপ রিচার্ডসন আহ্বান জানালেন। এই দ্বীপেই জীপ গাড়ী ছিল কয়েকটা, বালির উপর দিয়ে গাড়ী সোজা রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

লম্বা পথ, পথের দু'ধাঁরে নারকেল বন। কেরেলায়ও দেখেছি অগণিত নারকেল গাছ, এখানে তার চেয়ে অনেক বেশী। কেরেলায় ছিল প্রতিটি গাছের গোড়া পরিষ্কার। এখানে গাছের গোড়ায় ঝোপঝাড় জঙ্গল। এত গাছ, কে খবর রাখে, কে পরিষ্কার করে। নারকেল গাছে গাছে ঠাসা পথের দু'দিক, যেন সবুজ ভেলভেটের পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছে কেউ পথের দু'ধারে।

কার-নিকোবর কবে হতে কোথা হতে এর উৎপত্তি—কত কথা কত গল্প তা বলে। সমুদ্র এক সময়ে একে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে তাদের কাছ হতে। আবার নিয়ে জড়িয়ে। মালয় ব্রহ্মদেশের সঙ্গে এ দ্বীপও যুক্ত ছিল এককালে অনেকে গল্পও প্রচলিত আছে, যে, ব্রহ্মদেশের এক কুমারী কন্যা সন্তান-সম্ভবা হলে তাকে একটি কেনোতে করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। ভাসতে ভাসতে কেনো এসে ঠেকে এই দ্বীপে। কিছুদিন পরে রাজকন্যার একটি পুত্রসন্তান জন্মে। সেই পুত্র বড় হয়। মা নানা বেশে নানা স্থানে ছদ্মরূপে পুত্রকে দেখা দেয়। তাতে যে সন্তান হয়—সেই হল প্রথম নিকোবরী।

পনেরোটি গ্রাম নিয়ে কার-নিকোবর দ্বীপ। এদিককার সব দ্বীপের তুলনায় এখানে লোকসংখ্যা বেশী। তবু, কত জমি কত গাছ প্রতি লোকের ভাগে। স্বচ্ছল জমি, স্বচ্ছল আহার।

কার-নিকোবরে প্রায় সবাই কৃশ্চান। বিশপ রিচার্ডসন অসাধ্য সাধন করেছেন,—যা নাকি ড্যানিশরা ইটালিয়ানরা বৃটিশরা পারেনি। তারা এসেছে, বারে বারে ব্যথ হয়ে ফিরে গেছে। ড্যানিশ ইটালিয়ানদের পরে বৃটিশ আমলে এক ইংরেজ মিশনারি ফাদার ধর্মের দিক থেকে কোনো সুবিধে না করতে পেরে শেষে একটা স্কুল খুললেন এখানে। নিকোবরী ছেলেদের পড়াতে লাগলেন। ছাত্রদের মধ্যে একটি ছেলে বিদ্যায় বুদ্ধিতে ফাদারকে মুগ্ধ করলো। ফাদার তাকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বর্মায় পাঠিয়ে দিলেন। তখনকার দিনে বর্মার সঙ্গেই এ দ্বীপের ফাদারদের যোগাযোগ ছিল বেশী। বর্মাই ছিল দ্বীপের সহর। সেখান হতে ফিরে এসে সেই নিকোবরী ছেলেটি, ফাদার রিচার্ডসন—দেখতে দেখতে গোটা কার-নিকোবর-

বাসীদের কৃশ্চান করে ফেললেন। ইনি এখন কার-নিকোবরবাসীদের মাথা।

যেতে যেতে বিশপ রিচার্ডসন গল্প বলছিলেন,—গত যুদ্ধে জাপানীরা যখন এ দ্বীপ দখল করে—বছর আড়াই মতো ছিল তারা,—তখন যারা একটু লেখাপড়া জানে তাদের উপর খুব অত্যাচার করেছিল। অনেককে জাপানীরা মেরে ফেলেছে, ভেবেছে তারা বুঝি বৃটিশের স্পাই। আমাকেও দুবার মারতে চেষ্টা করেছিল। প্রথমবার পালিয়ে যাই; দ্বিতীয়বারে যেদিন আমার প্রাণনাশের রায় দিল সেইদিনই ওদের আত্মসমর্পণ করতে হল। হাসলেন বিশপ।

কার-নিকোবরের ভিতরে ঢুকে প্রথমেই নামলাম চার্চের সামনে। বিশপের আমলেরই চার্চ, লম্বা কাঠের বাড়ী। হলে ঢুকবার আগে পায়ের জুতো খুলে ফেললেন বিশপ, বললেন, ইউরোপীয়ানদের মতো জুতো নিয়ে ঢোকা—এটা এখনো পারি না আমরা।

চার্চের ভিতর বিশেষ কিছুই নেই। বাড়ীর অলঙ্কারের মধ্যে অলটারের পিছনে রঙীন কাচের জানালা,—তিনটে হলুদ তিনটে সাদা রঙের কাচের পাপড়ি। এই কাচ রস্ দ্বীপের চীফ কমিশনারের বাড়ী হতে খুলে আনা। সে বাড়ী এখন ভেঙে গেছে, কিছু নেই।

অলটারের সামনে বিশপের দাঁড়িয়ে বলবার ডেস্ক, হাঁটু মুড়ে প্রার্থনা করবার একটি টেবিল, নীচে একটি ছোট কুশন। আর কোনো আসবাব নেই ঘরে, ঝাড়া-ঝাপটা ঘর। মেঝেতে মাঝখানে লোক চলাচলের জায়গাটুকু বাদ দিয়ে সকলের বসবার জন্য পর পর চাটাই পাতা। চাটাইয়ের উপরে পা পড়তে নীচু হয়ে আঙুল দিয়ে টিপে দেখলাম, নরম চাটাই, পুরু, ভিতরে যেন এক পার্ট তুলো দেওয়া। বিশপ বললেন, এখানে যে বিখ্যাত প্যাণ্ডেনাস ফল হয় সেই পাতা দিয়ে সবাই চাটাই বোনে। নরম মোলায়েম। এরই উপরে শোয় সবাই।

বিশপের স্ত্রী এই দেশেরই মেয়ে। তিনিও উপস্থিত ছিলেন এখানে। পরনে রঙীন লুঙ্গি, গায়ে বর্মী মেয়েদের মতো লম্বা হাতের সাদা ব্লাউজ,—তাদের মতোই সাজ। এদেব মেয়েদের সাজ বর্মা দেশেরই মতো। ছেলেরা পরে নানা রঙের ডোরার উপরে নানা রঙের ফুল ছাপা ছিটের ছোট ছোট ইজের, অনেকটা শিখদের কাচ্ছির মতো। রঙ এরা সবাই খুব পছন্দ করে। যারা একটু শিক্ষিত, তারা পরে প্যাণ্ট সার্ট।

নিকোবর ভারতের একটি জেলা। জেলায় জেলায় যেমন ভারত সরকারের কাজ হয়, এখানেও হচ্ছে। দ্বীপের উন্নতির জন্য নানা রকম বিভাগ খোলা হয়েছে, নানা কর্মী কারিগর এসেছে বাইরে হতে। নানাদিকে কাজ চলছে।

নতুন একটা জেটি তৈরী হচ্ছে পাকাপোক্তভাবে। ষ্টীমার সোজা সোজা থামবে এখানে। নামতে উঠতে বোট বা কেনোর হাঙ্গামা থাকবে না এখনকার মতো। স্কুলে স্কুলে জোর পড়াশুনা চলছে, কয়েকটা স্কুল ঘুরে দেখলাম। নিকোবরী মেয়ে শিক্ষয়িত্রীও আছেন কয়েকজন। ছাত্রছাত্রীদের হাসিমুখ, সুন্দর স্বাস্থ্য। শক্ত গাট্টাগোট্টা চেহারা সবার; চওড়া কব্জী, মজবুত গড়ন।

'ট্রেনিং কাম প্রডাকশন' সেণ্টারে ছেলেরা কাঠের টেবিল টিপয় ট্রে চেয়ার তৈরী করছে, লোহা পিটিয়ে দা ছুরি বানাচ্ছে। মেয়েরা কাপড় কেটে নিয়ে জামা সার্ট সেলাই করছে। বেডকভারে রঙ-বেরঙের এমব্রয়ডারী তুলছে।

নারকেলের দেশ, অপর্যাপ্ত নারকেল। ব্যবসায়ীরা কতবার নারকেল, নারকেলের ছোবড়া নিয়ে ব্যবসার চেষ্টা করেছে। 'কয়েরের' কারখানার কথাও ভেবেছে।

দেখেছে, তৈরী জিনিসও নিয়ে যেতে জলপথে স্টীমারে খরচ পড়ে যায় বেশী। ব্যবসা জমতে পারেনি। এখন সরকার পক্ষ থেকে 'স্মল স্কেল ইণ্ডাসট্রি'তে নারকেলের তেল হচ্ছে স্থানে স্থানে। বৃষ্টির দেশ, তেলের জন্য নারকেল শুকোতে দেরী হয়। পথের পাশে পাশে পিলবক্সের মতো ছোট ছোট পাকা ঘর, নীচে আগুন দিয়ে উপরে নারকেল রেখে শুকোনো হয়। সাবানও তৈরী হচ্ছিল—লম্বা লম্বা বারসোপ। কষ্টিক সোডা ফুরিয়ে গেছে, কাজ বন্ধ হয়ে আছে। খবর গেছে পোর্টব্লেয়ারে, কবে কষ্টিক সোডা আসবে তবে আবার কাজ সুরু হবে। সাগর-ঘেরা দ্বীপ, ঐ একটি জাহাজের উপরেই নির্ভর সবকিছুর। পনেরো দিনে একবার আসে জাহাজ, তাও সেই জাহাজেই যে দরকারী জিনিসটা আসবে তার ঠিক কি?

প্রতি গ্রামে এদের 'কমিউনিটি হাউস' আছে,—গ্রামের অতিথিশালা। গ্রামের অতিথি স্বজন এলে থাকে এই ঘরে। গ্রামের সকলে একত্র হতে হলে এইখানেই জড়ো হয়। আলাপ-আলোচনা বিচার-বিধান এইখানেই করে। কেনো বাইচের সময়ে এইখানেই সবাই ভীড় করে।

চলার পথে একটি কমিউনিটি হলে থামলাম। নারকেল বনের ছায়ায় সাদা বালির মাঝখানে সমুদ্রের তীরে হল। খুঁটির উপরে মস্ত এক লম্বা কাঠের ঘর, তিনদিকে ঘেরা বারান্দা, সবটাই কাঠের। উপরে উঠে মন চায় না নামি। সাগরের উজ্জ্বল ঢেউ, উন্মাদ হাওয়া, সুনীল আকাশ,—বুকের দরজার পাট দুটো যেন দড়াম করে খুলে অনন্তের নীলে মিশে গেল।

ছাগল শুয়োর নারকেল খায় এখানে, আর আমরা টাকা টাকা দাম দিয়ে নারকেল কিনি বাজারে। তাও ভালো পাই না। নারকেল খাওয়া ছেড়েই দিয়েছি বলতে গেলে। এখানে শুনি দুবেলা শুয়োরকে ঝুনো নারকেল খাওয়ায়—রোজ সকালে দুটো আর বিকেলে দুটো করে এক-একটাকে।

কৌশলকুমার—সুকুমার পার্শী যুবক, এখানকার এস-ডি-ও; বললো, এখানে তিন ভাগের এক ভাগ নারকেল লোকেরা খায়, এক ভাগ খায় শুয়োর, আর বাকী এক ভাগ দিয়ে তেল হয়। ধান নেই চাল নেই এদেশে। শুয়োরকে খাওয়াবে কি? যে জন্য বেশী করে মুরগী পালতে পারে না এরা আধুনিক নিয়মে। দানার অভাব।

কৌশলকুমারই নিয়ে গেল পাশের বাড়ীতে। এক মহিলা কাঠের একটা লাঠি মতো, তাতে ঘষে ঘষে নারকেল কুরিয়ে মুরগীগুলোকে খেতে দিচ্ছেন। নারকেল কুরনি লোহার হয় জানি, পা-কুরনি হাত-কুরনি। বটিদা-এর মতো পা চেপে বসে কোরাও, হাত দিয়ে চেঁছে চেঁছে কোরাও, তা বুঝি; কিন্তু এমন পদ্ধতি তো দেখিনি। নেড়েচেড়ে লাঠিখানা দেখি। কাঠ নয়, তালপাতার ডাঁটের মতো—গায়ে শক্ত শক্ত কাঁটা—এখানকার এক রকম জংলী পাম গাছের ডাঁট। জঙ্গল থেকে দা দিয়ে ফটাফট কয়েকটা কেটে আনে, ঘরে রেখে দেয়। ক্ষয়ে গেলে আবার আনে। ছুরি দিয়ে নারকেলগুলি মালা হতে তুলে, বাঁ হাতে ধরে ডাঁটটা দাঁড় করিয়ে, ডান হাত দিয়ে তার গায়ে ঘষ ঘষ করে নারকেলগুলি ঘষে মুহূর্তে ফুরফুরে ভাতের মতো কাঁড়ি-কাঁড়ি নারকেল কুরিয়ে ফেললেন।

ভদ্রমহিলা এই স্তূপাকার নারকেলকোরা লম্বা কাঠে গর্ত করা শুয়োরের খাবার বাসনে ঢেলে দিলেন, শুয়োরদের নাম ধরে ডাকলেন। শুয়োরগুলি চরে বেড়াচ্ছিল ধারেকাছে কোথাও, ডাক শুনে ছুটে এসে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নারকেল কোরাগুলি খেতে লাগলো। আর আমি সেই কবে ছেলেবেলায় মামাবাড়ীতে

লক্ষ্মীপুজোর নাড়ু গড়তে এতগুলি নারকেলকোরা কলাপাতার উপরে স্তূপ করা দেখেছিলাম, সেই কথা মনে পড়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

কমিউনিটি হলের আঙিনায় বড় একটি গোল ঘর। আগে এইটিই ছিল এদের কমিউনিটি হল। কাঠের লম্বা বাড়ীটা তুলেছে নতুন। এই গোল ঘরই বিখ্যাত 'মৌচাক ঘর',—'বি-হাইভ' ঘর। মৌচাকটা উল্টে দিলে যেমন দেখতে হয় তেমনি আর কি। আমার কিন্তু মনে হয় সামান্য ছোবড়া সমেত ঝুনো নারকেলের মালাটা উল্টে দিলে ঠিক এমনটি দেখায়। এটার সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশী। এদের সব বাড়ীই এই রকম, নতুন দু'চারটে ছাড়া।

খুব উঁচু খুঁটির উপরে প্রকাণ্ড এক গোলঘর, মানে ঘরের মেঝে অবধি ঝুঁকে পড়া প্রকাণ্ড এক উঁচু গোল চাল; প্রকাণ্ড একটা আধখানা নারকেল মালা উল্টে রাখা। তক্তা আর বাঁশের বাতার মসৃণ মেঝে। মেঝেতেই ঘরের দরজা—মেঝের খানিকটা দরজার আকারে কাটা। লম্বা সরু একটা মই লাগানো থাকে দরজার মুখে। সারাদিন তা বেয়ে ওঠে নামে ঘরকন্নার কাজ নিয়ে সবাই ক্ষণে ক্ষণে। চালের ভিতর দিকটা বড় সুন্দর। কাঠের ফ্রেমের গায়ে সরু সরু বাঁশের বাতাগুলি অতি পরিপাটি করে বেত দিয়ে বাঁধা। শন দিয়ে যে চাল ছেয়েছে—তার একটি শনও দেখা যায় না ভিতর থেকে। নিপুণ বুনিন; মজবুত বাঁধন। প্রতিটি বাতায় চিকন বেত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেঁধেছে—যেন বাঁধনের নক্সা কেটেছে চকচকে বাতাগুলি ঘিরে।

নতুন পুরাতন দুই বাড়ীর মাঝখানে বালির আঙিনায় মোটা কাঠের খুঁটির উপরে মোটা কাঠের ফ্রেমে মস্ত এক বাঁশের বাতার মাচা। যেন প্রকাণ্ড পালঙ্ক একখানা। বিকেলে লোকেরা আসে, এর উপরে বসে, গল্প-গুজব করে। এই-ই এদের বৈঠকখানা, ড্রইং রুম—গোটা গ্রামের।

সমুদ্রের অতি নিকটেই নাকি আলুনী জল পাওয়া যায়। এমন কি সমুদ্রের তীরে হাত তিনেক বালি খুঁড়েও মিঠে জল পায় লোকে।

বলদে ঘানি ঘুরিয়ে নারকেল তেল বের করছে, তাজা তেলের সৌরভে সুরভিত জায়গাটা, দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘানি ঘুরছে দেখতে লাগলাম।

পাশের বাড়ীতে কুয়ো আছে, সেই জল দেখতে ডাকলেন স্বামী। সাদা বালির আঙিনায় ছোট্ট কুয়ো, তিন হাত নীচে জল, হাতের নাগালেই ধরতে গেলে। বালি-চোয়ানো জল টলটল করছে। এ জল যত তোলে তত জমা হয়, নামে না কখনো। কুয়োর ধারে 'রোয়াইল' গাছের মতো গাছে থোকা থোকা লাল ফুল ধরে আছে; ছোট ছোট ফল—টক। দক্ষিণে এঁরা এই ফল খুব খান।

এই গৃহস্থের বাড়ীখানা দোচালা। মৌচাক ঘর নয়। জাপানীদের আমলে জাপানীরা ইন্দোনেশিয়া থেকে মিস্ত্রি এনেছিল তাড়াতাড়ি ঘর তুলে দেবার জন্য। তারাই খুব নীচু খুঁটির উপরে এই রকম দোচালা বাড়ীর পত্তন করে এখানে। বাইরে ভিতরে তাই একটু জাপানী-ছোঁওয়া। যেটা এদের গোল ঘরে আদপেই নেই। এখানে এই দোচালা ঘরের ভিতরে জাপানীদের মতো বেড়া দিয়ে ঘরগুলি ভাগ ভাগ করা। একটা ঘরে রান্নাঘর। লোহার একটা বড় চৌকো টবের চৌবাচ্চা। সেই চৌবাচ্চা ভর্তি বালি আর ছাই। তারি উপরে মাঝখানে কাঠ জ্বলে, রান্না হয়। ঘরে আগুন লাগবার কোনো ভয় নেই। এরাই হলো এদের মধ্যে কিছুটা আধুনিক।

গৃহস্বামীর বুড়ী মা পা মেলে বসে ভাতভরা এনামেল-এর প্লেটটা মুখের

সামনে টেনে নিয়ে ভাত খাচ্ছিলেন। মাথা ভরা সাদা চুলগুলি খোলা—ঘাড়ে পিঠে ছড়ানো। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, রুগ্ন দেহ। ঘরে ঢুকতেই খাওয়া ফেলে এগিয়ে এলেন, হেসে হাততালি দিয়ে 'বাঃ বাঃ' বলে উঠলেন। খুব খুশী হয়েছেন, ঘরে অতিথি এসেছে। পুত্রবধূ তাড়াতাড়ি ধরে বসিয়ে দিল তাকে। ভাষা জানি না, ভাষা বুঝি না কেউ। খুসী জানাতে কি করবেন—আসবার সময়ে তাক হতে তুলে একটি সমুদ্রের ঝিনুক আমার হাতে দিলেন।

প্রতি গ্রামে একজন করে কাপ্তেন থাকে, অর্থাৎ মুরুব্বি। সে পুরুষও হতে পারে, নারীও হতে পারে। পুরুষ হলে তাকে বলে 'কাপ্তেন', নারী হলে তাকে বলে 'রানী'। গ্রামের লোকেরাই তাদের কাপ্তেন ঠিক করে। গ্রামের ভালোমন্দের সকল দায়িত্ব কাপ্তেনের।

সব গ্রামের কাপ্তেনরা জমেছেন সদরের কমিউনিটি হল-এ। বিশপ রিচার্ডসনও আছেন। স্বামীর সঙ্গে সবাই মিলে সুবিধে-অসুবিধের নানা কথা আলোচনা করবেন।

বড় ভালো এঁরা। জাপানীরা এখানে অনেকখানি জমির নারকেল গাছ কেটে তখনকার মতো তাড়াহুড়ো করে রানওয়ে করেছিল, সেইটেই এবারে ভারত সরকার থেকে বড় করা হচ্ছে, পোক্ত করা হচ্ছে। মিলিটারীর লোক এই কাজের ভার নিয়েছে। কুলি-মজুর নিয়ে তারা প্রায় দু'হাজারজন আছে এখানে। জমি আরো নিয়েছে, আরো নারকেল গাছ কেটেছে। সরকার জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে চাইছে। এঁরা বলছেন, না, দেশের কাজে জমি দরকার জমি নিয়েছে। তার জন্য টাকা দেবে কেন? আমরাই বা নিতে যাবো কেন? তবে ওরা এতগুলি লোক এসেছে, আমাদের বহু নারকেল পেড়ে নিচ্ছে—এতে আমাদের বড় ক্ষতি হচ্ছে। আবার এও বুঝি হাজারের উপরে কুলি এসেছে বাইরে থেকে, অফিসাররা সবার উপরে নজর রাখবেই বা কেমন করে?

কাপ্তেনরা আরো বললেন, শুনেছি তোমরা রিফিউজী বসাবে। আমাদের অনেক জমি আছে,—ভালো কথা। তবে, আমাদেরও সংসার দিন দিন বাড়বে—সন্তান-সন্ততি বেড়ে চলবে,—সে কথা মনে রেখে করো সব।

পুরুষানুক্রমে এ-দ্বীপে 'আকুজি' পরিবারের কারবার নারকেল বেত বাঁশ কাঠ সবকিছুর। বহুকাল এই ব্যবসা এদের একচেটিয়া ছিল। ভারত সরকার এখন ভাগ করে দিয়েছে—অর্ধেক ব্যবসা আকুজিদের, অর্ধেক থাকবে সমবায় পদ্ধতিতে। ভারত সরকারের ইচ্ছা সবটাই সমবায় পদ্ধতিতেই হয়। এঁরা বলেন, এখনো তাদের সে ক্ষমতা হয়নি, আরো সময় চাই। বলেন, চাল খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে আমাদের বেশকিছু বছর ধরে। চালেরই টানাটানি পড়েছে।

আকুজিদের দোকান—দ্বীপের 'কনাটপ্লেস'। বাইরের যাবতীয় দ্রব্য—খাদ্য প্রসাধন বাসন কাপড় ওষুধ অনুপান বাতি ব্যাটারী সব পাওয়া যায় এই দোকানে। এ তল্লাটে আকুজিদের ব্যবসা চার পুরুষ ধরে। এঁদের এই ব্যবসার কাজে নিজেদেরই কয়েকখানি জাহাজ সর্বদা চলাচল করে এই নীল জলে। তাছাড়া আছে দ্বীপে প্রচুর নৌকো, কেনো, মোটর-লঞ্চ ছড়ানো। প্রতি দ্বীপেই এদের এমনিতরো দোকান, আধুনিক গেস্ট হাউস। এই আকুজিদের সাহায্য ছাড়া এসব দ্বীপে আসা বা কাজ করা প্রায় অসম্ভব ছিল আগে। এখনো সরকারী লোকেদেরও এদের সাহায্য নিতে হয় কথায় কথায়।

কার-নিকোবরে আকুজিদের দোকান অফিস গেস্ট-হাউস বসত-বাড়ী নিয়ে

মস্ত এক এলাকা। সামনে সাজানো বাগান। আমরা যেমন বাগানে ইঁটের সারি সাজিয়ে ফুলের কেয়ারি ঘিরি—বাগানের পথ সাজাই, তেমনি এখানে করেছে বোতল দিয়ে। জাপানীদের আমলের রাশি রাশি বিয়ারের বোতল দিয়ে সাজিয়েছে এরা বাগান বাগিচা পথের দু'ধারে। মাটিতে মুখ গুঁজরে কাত হয়ে পড়ে আছে হাজার হাজার হলদেটে রঙের খালি বোতলগুলি। আঙিনায় আছে পোষা পায়রা অজস্র, তারের জালে ঘেরা। আছে জীপ মোটর ট্রাক নতুন পুরাতন চারদিকে ছড়ানো।

তিন চার হাত লম্বা 'কিং কোকোনাট' গাছগুলিতে সোনালী রঙের নারকেল ঝুলে আছে ছড়া সমেত মাটি ছুঁয়ে। আকুঁজি ভদ্রলোক বললেন,—এ তো তবু মাটি ছুঁয়েছে, অনেক জায়গায় মাটি খুঁড়ে ফেলতে হয়েছে—নারকেলকে স্থান দেবার জন্য। 'কিং কোকোনাট' ছোট গাছই হয়, ছোট ছোট গাছে ফল ফলে বলেই এর বাহার। আকুঁজি ভদ্রলোক বললেন,—এই জন্যই এই গাছ এনে লাগিয়েছিলাম এখানে। গেটের দু'ধারে দুটি লাগালাম—এ মাটির এমনই গুণ,—গাছ দেখছি হুসহুস করে উপরে উঠে যাচ্ছে।

বিশপ রিচার্ডসন এখানেও আছেন আমাদের সঙ্গে। সমবায় দোকানের তিনিও একজন মালিক। বয়স আশির উপরে। এ'র আগে যে ইংরেজ ফাদার এসেছিলেন এখানে তখন ইনি ছিলেন বারো বছরের বালক। সেই সময়কার হিসাব মতে এ'র বয়স প্রায় নব্বুইয়ের কাছাকাছি। এখনো সোজা শক্ত, সব জায়গায় ঘুরে বেড়ান, সব উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মোটর আছে একটা, মোটর খারাপ হলে সাইকেলে চড়েই চলে যান মাইলের পর মাইল পথ।

দ্বীপের ধারে ধারে তটভূমিটুকু আর গ্রামের আঙিনাটুকু ছাড়া সকল ভূমিই গাছ জঙ্গলের সবুজে ভরা। গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে চলেছি, মুস, টিউব, কিনমাই, লাপাটি, মালাকা—পেরিয়ে আসি হেড কোয়ার্টার 'এড়িয়া'। বিমলও নেমেছে দ্বীপে, এখানে তার সঙ্গে দেখা।

বিমল ধরলো তাদের সঙ্গে যেতে হবে। নানা গ্রামে তার বন্ধু ছড়িয়ে আছে, এক বন্ধুর বাড়ী নিয়ে গিয়ে দেখাবে আমাকে।

বিমল, মনি এতক্ষণ অদৃশ্য হয়ে ছিল, নিজেদের খেয়াল খুসীতে হেঁটেছে, ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছে। এতক্ষণে অনেক মাইল পথ হাঁটা হয়ে গেছে তাদের। চেনা মানুষও কয়েকটি মিলে গেছে। এবারে দল হতে আমাকে দলছাড়া করে নিয়ে চললো বিমল তার এক বিশেষ বন্ধুর গ্রামে।

প্রখর রৌদ্র। নারকেল পাতার ফাঁকে ফাঁকে সেই রোদ্দুর সাদা বালিকে যেন তুলে ধরছে। যেমন চোখ রাখা যায় না সূর্যের দিকে, তেমনি চোখ বন্ধ করি আলোয় জ্বলে ওঠা বালুরাশি দেখে।

জীপ এসে থামল 'পারকা' গ্রামে বিমলের বন্ধু রুবনের ঘরের সামনে। আকাশজোড়া নারকেল গাছ, ভূমিজোড়া বন;—তারি মাঝখানে পরিষ্কার খানিকটা বালি। সেই বালিতে উঁচু উঁচু খুঁটির উপরে কয়েকখানা ঘর মিলে একটি গ্রাম। যেন একটা গোল আঙিনায় একান্নবর্তী একটি পরিবার। এক হিসেবে তাই, বেশীর ভাগ আত্মীয়স্বজনদের নিয়েই এক একটি গ্রাম এদের।

'রুবন রুবন' বলে বিমল সাড়া জাগালো। রুবন এ গ্রামের কাপ্তেন। রুবন বাড়ীতে নেই। রুবনের মা বসে আছেন ঘরটার নীচে খোলা মাচানের উপরে। প্রতি বাড়ীতেই ঘরের নীচে এমনি এক মাচান বাঁধা—দিনের বেলা গিন্নিরা কর্তারা

বসেন, শিশুরা খেলা করে।

রুবনের মা হেসে এগিয়ে এলেন, বিমলকে চিনলেন। রুবনের বাবা নেই, মারা গেছেন। এই গ্রামে থাকেন রুবনের কাকা, গোলগাল নাড়ুগোপাল চেহারা, গোল ভুঁড়ি। ছোট একটা রঙীন জাঙ্গিয়া পরে খালি গায়ে তিনিও বসে আছেন মাচায়। দেবর-ভ্রাতৃবধূ নিশ্চিন্তে বসে গল্প করছিলেন, মদ খাচ্ছিলেন। তাড়ি-নারকেল রসের বোধ হল। ভাতের তাড়ির মতোই সাদাটে রং। ক্ষুদে ক্ষুদে ভারী ভারী চোখ দু'জনেরই। পিট পিট করা তাকানোটি,—মিট মিট করা হাসি। দেবর ভদ্রলোকের সোনাবাঁধানো সামনের দুটি দাঁতে চমক খেলতে লাগলো।

রুবনের খুড়োমশায় বসে আছেন, পাশে আস্ত গোটা গোটা দুটি বড় নারকেল মালা। মুখবন্ধ গোল ঘটির মতো দেখতে। নারকেল মালাটা না ভেঙ্গে কি করে যেন ভিতরটা পচিয়ে,—আমরা বলি নারকেলের চোখ,—সেই চোখের ফুটো দিয়ে পচা পদার্থটা বের করে ফেলে। সুন্দর পাত্র হয়ে যায় জল রাখতে, তাড়ি রাখতে। পাত্র দুটোর ফুটো দুটোতে ছিপি আঁটা। বেত দিয়ে বাঁধানো পাশাপাশি পাত্র দুটি, দুই-এর উপরে একটিই বেতের হাতল। হাতলে ধরে জোড়া মালা হাতে ঝুলিয়ে চলাফেরায় অসুবিধে নেই। চমৎকার 'ওয়াইন-বটল'।

রুবনের মা হাসি হাসি মুখে দা দিয়ে আধখানা মালার পিঠ ভাঙলেন, ফাঁকা গোল মালাটা উপুড় করার মতো উল্টে রাখলেন, তার উপরে আর আধখানা মালা বাটি রাখার মতো বসিয়ে দিলেন। ষ্ট্যাণ্ডসমেত তিনটি ওয়াইন গ্লাশ বানালেন আমাদের তিনজনের জন্য। খুড়োমশায় ছিপি খুলে নারকেলের ঘটি হতে তাড়ি ঢেলে বাটিগুলি ভর্তি করে দিলেন, নিজের বাটিটা ভরে নিলেন, রুবনের মার বাটিও ভরে দিলেন। রুবনের মা একচুমুকে বাটিটা শেষ করে আবার ভরে নিলেন। অতিথি এসেছে বাড়ীতে, খুবই যেন ব্যস্ত; সেজন্যই বিমল বলল, খান না খান, বাটিটা হাতে তুলে নিয়ে খাবার ভান করুন, নইলে এদের মনে লাগবে।

বিমলের সঙ্গে কথা হচ্ছে রুবনের মার। রুবন গেছে এড়িয়া গ্রামে। রুবনের আরো দুটি ছেলে হয়েছে এর মধ্যে। পাশে বসে আছে রুবনের বোন শিশু-সন্তান কোলে নিয়ে। বোনকে আর যেতে দেননি শ্বশুরবাড়ী, জামাই এখানেই থাকে। মাথার উপরে ঘর দেখিয়ে বললেন, ঘরে রুবনের স্ত্রী ভ্রাতৃবধূরা আছে, রান্নাবান্না করছে।

তক্তার দরজা মেঝে হতে তোলা, চালের কাঠের সঙ্গে শিকল গাঁথা। সেই খোলা মুখে সরু সোজা একটা মই ফেলা।

আঁতকে উঠি, এদের শিশুরা এই মই বেয়েই তো 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করে। সেইটার দিকে তাকিয়ে আছি। এই মই বেয়ে সাহস পাই না উঠতে। অথচ এদের বাড়ীর ভিতরটা দেখতে পাবো না এখানে এসে, এদের ঘরকন্না দেখবো না একবার, এই ভাবনাটাও বড় দুঃখের আমার পক্ষে। বিমল উৎসাহ দিল। মই বেয়ে এক সময়ে উঠলাম উপরে,—বিমলই এক রকম টেনে তুললো আমাকে।

বৃহৎ গোলাকার ঘর। ঘরের মাঝখানটায় তক্তার মেঝে, দু'দিকে বাঁশের বাতা। সেই বাতার ঝিরঝিরে ফাঁক দিয়ে তলা হতে আলো ঢোকে, হাওয়া ঢোকে; ঢোকে না কেবল বালি। বালি ওড়ে, আথালিপাথালিও ওড়ে; কিন্তু ফোয়ারার মতো উঁচু হয় না। ঘরে ঢুকতে পারে না। তাই এদের উঁচু উঁচু খুঁটিতে ঘর করা হয়।

বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে প্রথমটায় মনে হল ঘর অন্ধকার। একটুক্ষণ লাগলো চোখকে অভ্যেস করিয়ে নিতে। পরে মেঝের বাতার ফাঁক দিয়ে আসা আলো-টুকুই যথেষ্ট মনে হল।

মাথার উপরে 'কার', সংসারের জিনিষপত্র কিছু কিছু তুলে রাখা তাতে। চালে ঝুলছে হাতের তৈরী নানা আকারের বেতের ঝুড়ি। ঘরের একধারে লম্বা চওড়া ঢাকনা খোলা এক কাঠের সিন্দুক, সিন্দুক ভরা ছাই। ছাইএর তলায় বালিও আছে বললো। সেই ছাইয়ের উপরে তিন তিনটে করে পাথর বসানো দুটি উনুন। উনুনে বসানো 'চাড়ি'র মতো মুখ খোলা বড় বড় দুটি মাটির হাঁড়ি। কাঠের আগুন, জল ফুটছে হাঁড়িতে। উনুনের উপরে ঘরের চাল হতে দাড় বাঁধা ঝুলছে কাঠের একটা ফ্রেম। সেই ফ্রেম থেকে ঝুলছে বাঁশের তৈরী বড় বড় চালুনী ঠিক গরম জলের উপরে। চালুনীতে আছে গোটা গোটা আছোলা কচু, কাঁচা কলার ছড়া, রাত-আলুর স্তূপ। ভাপে সিদ্ধ হচ্ছে কিছু, কিছু জলে সিদ্ধ করে তুলে রেখেছে চালুনীর উপরে। ছোট ছোট বাঁশের চিমটায় গাঁথা আছে এক এক সারি সার্ডিনের মতো ছোট ছোট মাছ, পোড়া। অমনি করেই আগুনে পুড়িয়ে রেখে দিয়েছে উনুনের তাতে; গরম থাকবে খাবার সময়ে। হাঁড়ির গরম জল বৃথায় যায় না, কিছু না কিছু সিদ্ধ হচ্ছেই। সিদ্ধ জিনিসই এরা খায় বেশী। কোনায় অনেকগুলি কলসীর মতো কাঠের হাঁড়ি, বাকলের দড়ি দিয়ে বাঁধা গা, বাঁধা মুখ। কোনোটাতে তাড়ি, কোনোটাতে জল।

অবস্থাপন্ন ঘর, ঘরে খাদ্যসামগ্রী ভরা। প্রকাণ্ড সবুজ প্যাণ্ডেনাস—দু'হাতে তুলতে পারলাম না, এত ভারী,—কচু, রাত-আলু, সারি সারি কলার কাঁদি। বেতের ঝুড়িতে গোছা গোছা নানা আকারের নানা গাছের তাজা পাতা,—কোনোটা লম্বা কোনোটা গোল, কোনোটা পাতলা কোনো পাতা ভারী। এইসব সবুজ পাতা লাগে এদের রান্নার কাজে। বিশেষ পাতায় বিশেষ খাবার মুড়ে সিদ্ধ করে হাঁড়িতে ফেলে।

কাঠের ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে 'কারে'র কাঠ, চালের বাঁশ। কালো হয়ে গেছে বেতের ঝুড়িগুলি। নানা রকম ঝুড়ি, গোল ডালার মতো ঝুড়ি, গামলার মতো ঝুড়ি, সাজির মতো ঝুড়ি—হরেক রকমের ঝুড়ি। অতি সুন্দর বেতের কাজ। নিজেদের কাজের জন্য নিজেরা তৈরী করে, নিখুঁত করে বানায়, মজবুত করে বানায়। সখের জিনিসের রূপই আলাদা। ঝুড়ি এদের নিত্য প্রয়োজনের বস্তু। নানা কাজে ঝুড়ি লাগে। জঙ্গল থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে আনে ঝুড়িতে করে। শাক পাতা তুলে আনে ঝুড়িতে করে। মাছ ধরে আনে ঝুড়িতে করে।

বৌ তিনজন গোল হয়ে বসেছে ঘরের একধারে, সিদ্ধকরা একরাশি প্যাণ্ডে-নাসের 'কোয়া' নিয়ে। প্যাণ্ডেনাস এ দেশের বিখ্যাত ফল, সৌখীন খাদ্য। কেয়া গাছের মতো গাছ, কিন্তু ঝোপ নয় তেমন। মাটি হতে কিছুটা উপর পর্যন্ত ওঠে গুঁড়িটা। কাণ্ডের মতোই মোটা মোটা শিকড় ঝোলে সজারুর কাঁটার মতো গাছের চারদিকে। মাটি পর্যন্ত নামে সে শিকড়। এই দ্বীপে এই গাছ অসংখ্য। সাদা সাদা মোটা সোজা শিকড় ঝোলা প্যাণ্ডেনাস গাছ বনে পথে ডাইনে বাঁয়ে যেখানে সেখানে। আনারসের মতো অনেকটা গড়ন প্যাণ্ডেনাসের, তবে গায়ের রঙটা সবুজ, আর আকারে বৃহৎ। এত বৃহৎ যে লোকেরা বাঁকে ঝুলিয়ে কাঁধে বয়ে আনে। আনারসের মতো গা ভর্তি চোখ, এক একটা চোখ এক একটা 'কোয়া', এক একটা কোয়া তাল আঁঠির মতো বড়। পাইন ফল যেমন আলগা করে করে

খোলা যায়, প্যাণ্ডেনাসেরও তেমনি এক এক করে কোয়াগুলি খুলে নেয়। পরে কোয়াগুলি অনেকক্ষণ জলে সিদ্ধ করে। সুসিদ্ধ হয়ে সবুজ কোয়াগুলি পাকা তালের মতো রঙ ধরে।

রুবনের ভাইঝি তিন চারটে সুপারীর খোল জুড়ে তার উপরে সিদ্ধ করা প্যাণ্ডেনাসের কোয়াগুলি রেখে ছুরি দিয়ে একটা একটা করে ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছে। বৌ তিনজন কাঠের বড় একটা গোল চাকতিতে সেই ছাড়ানো কোয়া ঝিনুক দিয়ে চেঁছে চেঁছে ক্বাথ বের করে রাখছে।

এও ঠিক তালক্ষীর বের করবার মতোই তালের আঁঠি থেকে। তবে তাল-ক্ষীরের চেয়ে প্যাণ্ডেনাস ক্ষীর অনেক ঘন। রঙ ঠিক তালক্ষীরের রঙ।

নীচের মাচা হতে তাদেরই একটা ছোট ছেলে কি যেন চাইছে চেঁচিয়ে। রুবনের বৌ কাছের ছোট্ট একটা পাটাতন তুলে কয়েকটা চাঁছা কোয়া নীচে ফেলে দিল। ছেলেটি পাথর দিয়ে তা' ভেঙে আঁঠির ভিতরের শাঁসটা বের করে বাদামের মতো খেতে লাগলো। বাতার ফাঁক দিয়েই দেখা যায় সব।

বৌ তিনজন খুব ব্যস্ত, চাকতি ঘিরে বসে তিন দিক হতে তিনজনে প্যাণ্ডেনাস চাঁচছে আর ক্বাথ বের করছে। আর আমাদের বিস্ময় ও ঔৎসুক্য দুই-ই একসঙ্গে দেখে হাসছে। একটি বৌ হাতে করে একটু প্যাণ্ডেনাসক্ষীর আমার হাতে তুলে দিল খেয়ে দেখতে।

শুনেছি এর স্বাদ গন্ধ কড়া। লাহিড়ীভাই বলছিলেন আজই যে, ও খেলে সঙ্গে সঙ্গে নাড়ি উল্টে আসে। ভয়ে ভয়ে মুখে দিলাম। ভালোই তো লাগলো। তালক্ষীরের মতোই স্বাদ, তেমনিই মিষ্টি।

ক্ষীরের গাদার দিকে তাকিয়ে ভাবি এত ক্ষীর কি একদিনেই খাবে এরা? শুধোলাম, এই ক্ষীর কি এমনিই খায়, না, আর কিছু করে!

রুবনের ভাইঝি ডালার লম্বা পাতাগুলি দেখিয়ে বললো, ক্ষীরগুলি এই পাতায় মুড়ে মুড়ে সিদ্ধ করা হবে, কালও খাওয়া যাবে। পিঠের মতো হবে। আরো খানিকটা ক্ষীর তুলে দিল হাতে বৌরা খাবার জন্য। এবারে নারকেলও কেটে এনে দিল। নারকেল দিয়ে খেতে হয় ক্ষীর। খেলাম, খুব ভালো লাগলো। অল্প খেলেই পেট ভরে যায়। জমাট খাদ্য।

বনের মূল ফল আর সমুদ্রের মাছ—অপর্যাপ্ত খাদ্যসম্ভার। বনে যায়, মাটি খুঁড়ে মূল আনে, গাছ হতে ফল আনে, সমুদ্রে মাছ ধরে। যার যত ইচ্ছে খাও—অকুলান নেই।

মনে পড়লো, বিশপ রিচার্ডসন দুঃখ করে বলেছিলেন,—ভারত সরকার এদের চাল খাওয়াতে শেখালো, এরা চাল খেতে শিখলো। এবারে এরা অনাহারে অর্ধাহারে কষ্ট পাবে।

নীচে নেমে এলাম। মা সেই মাচানেই বসেছিলেন, তখনো দেবর আর ভ্রাতৃবধূ হাসি মুখে খুসী মনে নারকেল-ঘাটি থেকে তাড়ি ঢালছেন আর খাচ্ছেন। খুব খোসমেজাজে আছেন। রুবনের মা পান সেজে খাওয়ালেন চুন সুপারী দিয়ে। নারকেল কুরনি, বেতের টুকরী উপহার দিলেন।

গ্রামের সামনেই সমুদ্র। গ্রামের বাইরে সমুদ্রতীরে কমিউনিটি হল। উঁচু গোল ঘর। ঘরের নীচে আছে 'বাইচ' খেলার কেনো। এই কেনোকে পাহারা দিতে হয়, খাওয়াতে হয়, পুজো দিতে হয়। গ্রামের বুড়োরা এই কাজ করে। কেনোর খাওয়া ও পুজো ঠিকমতো না হলে 'স্পিরিট' চটে যাবে।

স্পিরিটের কথা শুনতে শুনতে ঘরের নীচে এসে দাঁড়াই। চমকে দেখি ঠিক আমার মাথার উপরে দুটো পা লটপট হয়ে ঝুলছে। খটখটে দুপুরে রোদ্রে নির্জন সমুদ্রতীরে হঠাৎ মাথার উপরে দু'খানি পা হাঁটু অবধি ঝুলতে দেখলে কে না ভড়কাবে?

মুখ তুলে দেখি। পায়ের মালিক পিটপিটে চোখ মেলে মুখ বাড়িয়ে দেখলো একবার। নির্বিকার মুখ, আবার জাল বোনায় মন দিল। গ্রামেরই এক বুড়ো, কেনো পাহারা দিচ্ছে ঘরে বসে, আর মাছ ধরা জাল বুনছে হাতে। মেঝের কাটা দরজা দিয়ে পা ঝুলিয়ে বসেছে বুড়ো।

সমুদ্রের ধারে পুঁতে রাখা লম্বা খুঁটির উপরে রঙীন কাপড়ের ফালি, আর নারকেল সুপারীর পাতায় ফল বাঁধা। সমুদ্রের ধারে স্পিরিটকে এরা সকলের আগে পুজো দেয়, যেন সে এখানেই খুসী হয়ে থাকে—গ্রামে আর না ঢোকে। রেগে যেন জল ঝড় না আনে।

স্পিরিটকে এদের বড় ভয়। সবচেয়ে সম্মান দেয় তাকেই। গ্রামে ঢুকতে স্পিরিটের খুঁটি, পথের মোড়ে স্পিরিটের খুঁটি,—'আর এগিও না' করে করে ঘরের ভিতরেও খুঁটি সকলের। ভাবখানা—ঘরে যদি বা ঢুকেই পড়, তবে খুসী থাকো—এই তোমাকে পুজো দিচ্ছি। ছিটের কাপড়, সুপারী আর নারকেল পাতা শুকিয়ে মড়মড় করে খুঁটির উপরে।

এখানে সমুদ্রের ধারেই কবরখানা, গাছের মোটা মোটা ডাল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে বালির উপরে পর পর কাঠের ক্রুশ গাঁথা। হিন্দুর কবরও আছে পাশে অল্প দু'একটা,—বালি খানিকটা উঁচু করা। কৃশ্চানরা তাদের বিধিমতোই কবর দিয়ে রাখে। হিন্দুরা বছর খানেক বাদে হাড়গোড় তুলে সমুদ্রে ফেলে দেয়। কবরের পাশেই গ্রামের প্রসূতি-ঘর। আসন্নপ্রসবা নারী কিছুদিন আগেই এসে এই গৃহে বাস করে। সঙ্গে থাকে স্বামী, আর কোলে যদি শিশু থাকে তবে সেই শিশুটি। খাবার এখানে রান্না করে খায় কেউ, বাড়ী হতেও রান্না করে দিয়ে যায় কারুর। যার যেমন সুবিধে। এখানেও সন্তান প্রসবের বেদনা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী ভাগ করে নেয়, অনুভবে যন্ত্রণা টেনে নিয়ে কাতরায়।

গ্রামের বাইরে এই ব্যবস্থা। আঁতুর ঘরের পাশেই কবর, তার পাশেই স্পিরিট পুজোর নিশান খুঁটি। সন্ধ্যের পর জায়গা জুড়ে থাকে কেবল ঢেউয়ের গর্জন, বাতাসের শোঁ শোঁ, আর কেনো পাহারা দিতে রিক্ত ঘরে একটি কি দুটি বৃদ্ধ।

হেড কোয়ার্টার 'এড়িয়া'য় সমুদ্রের তীরে সম্প্রতি তৈরী হয়েছে অতি সুন্দর একটি রেস্ট হাউস। সেখানে দুপুরের খাওয়া সেরে 'কাকানা' গ্রামে এলাম। আজ এখানে 'ভলি বল' ম্যাচ। বার বার তিনবার নয়, পাঁচবারের খেলায় জিততে হবে। খেলবে মেয়েরা। দুই দল খেলোয়ার, একদল 'চুকচুকিয়া' গ্রামের, আর দল 'কাকানা'র।

ছোটখাটো শক্ত স্বাস্থ্যবতী মেয়ের দল। এরা সবাই গিন্নিবান্নি মহিলা। সকলেই মা। কারো তিন সন্তান, কারো পাঁচটি। দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম স্কুলের মেয়ের দল বুঝি। ভলি বল খেলতে এরা খুব ভালোবাসে।

কার-নিকোবরের মেয়েরা সাইকেল চড়ে, পুরুষের সাইকেল সব। এরা নৌকো বায়, ভলিবল খেলে। সহজ ভঙ্গী সবল স্বাস্থ্য। দেখে বড ভালো লাগে।

দুপুর—বেলা আড়াইটে তিনটে, চকচকে রোদ্দুর উপরে নীচে;—দুমাদ্দুম হাতে হাতে বল মেরে খেলা চলতে লাগলো। একদল পরেছে সবুজ লুঙ্গি, অন্য

দল পরেছে সাদা ফুলের ছিটের লুঙ্গি। গায়ে বর্মা দেশের মেয়েদের মতো জামা কারো, কারো সাধারণ ব্লাউজ।

একটানা পাঁচবার ভলিবল খেলা সোজা কথা নয়। শক্ত হাতের কব্জী চাই। সমানে সমান চলেছে দুদল। চুকচুকিয়ার দলই জিতলো শেষ পর্যন্ত।

খেলার পর নাচগানের আয়োজন। একধারে প্রকাণ্ড একটা 'ব্রেডফ্রুট'-এর গাছ, বড় বড় ঘন সবুজ পাতা, কাটা কাটা নক্সা পাতার কিনারে। সেই পুরো গাছটাকেই লাগে তাই যেন সাজানো গাছ একটি। সেই গাছের তলায় কচি নারকেল পাতার ঝালর ঝুলিয়ে গেট বানিয়ে স্টেজ করা হয়েছে। কত সহজ, কত সুন্দর এই 'ওপন এয়ার' স্টেজ। স্কুলের বড় ছেলেমেয়েরা হাতে হাত ধরে গোল হয়ে নাচলো গাইলো, তাদের নিজেদের নাচ গান। ছোট ছেলেরা অভিনয় দেখালো জেলে-জেলেনীর। হিন্দি গানও শিখেছে, গাইলো, ভাঙরা নাচ নাচলো। হাসিতে হাত-তালিতে জায়গাটা মুহুর্মুহু ভরে উঠলো।

কালো লম্বা চওড়া খাকী প্যাণ্ট পরা এক বলিষ্ঠ প্রৌঢ়—এই গ্রামেরই কাপ্তেন, এই আঙিনায় যত বাড়ী সবই তার সম্পত্তি। তিনি খেলার শুরু থেকে এতক্ষণ থেকে থেকে চারদিক ঘুরে এক একবার দেখা দিয়ে চিৎকার করে সকলকে বাহবা দিচ্ছিলেন আর গাছের আড়ালে ভীড়ের পিছনে লুকিয়ে পড়ছিলেন। দেখে সবাই হাসছিল। নেশায় বুঁদ হয়ে থাকাই নাকি স্বভাব তাঁর।

আসবার সময়ে ছাড়েন না, বলেন, তুমি মা তো!

বলি, হ্যাঁ।

—ব্যস্, সালাম। কপালে হাত রেখে খুসীতে দুলতে দুলতে চলে গেলেন।

কর্নেল তাদের ক্যাম্প চা খেতে নিয়ে এলেন। বিরাট রানওয়ে তৈরী হচ্ছে। একপাশে লম্বা লম্বা টিনের ঘর এদের থাকবার জন্য। তৈরী ঘর, যেখানে ইচ্ছা 'ফিট' করা যায়। মাঠের মাঝে জঙ্গলের মাঝে রাতারাতি গ্রাম বসানো যায়।

মনটা কেবলি খচখচ করছে। চা খাচ্ছি, চা খেতে খেতে সেই কথাই ভাবছি,—প্রসূতিকে আমরা যত সাবধানে রাখি,—সঙ্গ দিয়ে ঘিরে রাখি। যাতে কোনো রকম ভয় না পায় সেদিকে কত লক্ষ্য রাখি। মৃত বিকৃত হতে আড়াল করে রাখি। আর, এখানে কবরের পাশেই প্রসূতি থাকে, দিন কাটায়, মাস কাটায়,—কত নির্জন সন্ধ্যা, নিঃঝুম দুপুর নিরালা কাটায়। এ কেমন করে হয়?

বিশপ রিচার্ডসনও আমাদের সঙ্গে চা খাচ্ছেন। কথাটা বলি বলি করে বলেই ফেললাম, 'কেন এই ব্যবস্থা, কেন এই রীতি?' ধীর গম্ভীর বিশপ অতি ধীরে বললেন—জীবনের সুরু আর জীবনের শেষ তো পাশাপাশিই থাকবে।

বিশপের স্ত্রীও এসেছেন চায়ের আমন্ত্রণে। কম বয়সী স্ত্রী, বিশপের দ্বিতীয় পক্ষ। বিশপ পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন। বেশীর ভাগ সেসনেই অনুপস্থিত থাকতেন। এখান থেকে দিল্লী যাওয়ার হরেক হাঙ্গামা। পণ্ডিতজী ওঁরা হাসতেন, বলতেন, ঘরে যে যুবতী স্ত্রী বিশপের। বিশপের এই পক্ষের দুই কন্যাও এসেছে সঙ্গে। বড় কন্যাটি যুবতী হয়ে উঠছে, ছোটটি বালিকা। বড় কন্যার হাতে কচ্ছপের খোলের আংটি, কালো সরু তারের মতো।

বিমলের ভাব সবার সঙ্গে—জানা-অজানায় তফাত নেই। বিমল মেয়েটির হাতের আংটিটা খুলে আনলো, বললো—এই আংটি ছেলেরা মেয়েদের দেয়—যাকে যার পছন্দ হয়ে যায়। কোনো মেয়ের হাতে আংটি দেখলে অন্য ছেলেরা বুঝে নেয় সে আর কারো পছন্দের জিনিস হয়ে আছে। আংটির ব্যাপার নিয়ে

মেয়েটি লজ্জা পাচ্ছে দেখলাম। হাতের আড়ালে মুখ ঢাকছে, মুচকি হাসি হাসছে, মিটিমিটি তাকাচ্ছে। আংটিটা তাকে ফেরত দিলাম। বিবাহের প্রথম সূচনা এই আংটি।

কৌশলকুমার বললো, আজকাল বেশীর ভাগ ছেলেরা মেয়েদের চিঠি দেয়। ছেলেমেয়েতে ভাব হল, একদিন ছেলে বিয়ের প্রস্তাব করে মেয়েকে চিঠি দিল। মেয়ে সেই চিঠি তার অভিভাবককে দেখালো। তখন ছেলেমেয়ের দুই পক্ষের অভিভাবক তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। অনুষ্ঠান আর কিছুই নয়। কৃশ্চানরা তো চার্চেই যায়, বিয়ের পরে ভোজ হয়। যারা কৃশ্চান নয় তারা শুধুমাত্র ভোজনোৎসবই করে। তবে, অভিভাবকেরাই ঠিক করে দেয় মেয়ে বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ীতে যাবে, কি, বাপের ঘরেই থাকবে। এটা তাদের মতেই ঠিক হয়। অনেকেই মেয়েকে নিজের ঘরে রেখে দেয়, জামাইও সঙ্গে থাকে। বললো, 'কাচালে' আরো সহজ বিয়ের ব্যাপারটা। ছেলেমেয়ে মেলামেশা করে, অভিভাবকরা টের পায়, একদিন বিশেষভাবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। মেয়ে চলে আসে শ্বশুরবাড়ীতে, নয় তো ছেলে চলে যায় মেয়ের বাড়ীতে থাকতে। হয়ে যায় বিয়ে।

বাড়ীঘর সবকিছুই খোলামেলা। শিকল তালার প্রয়োজন নেই। চুরির কোনো কথাই ওঠে না। লাহিড়ীভাই বলেন, এখানে এরা এত ভালো, আপনি বোঝা নিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়েছেন,—পথের ধারে বোঝা রেখে চলে যান, পরদিন এসে তুলে নিন,—কেউ ছোঁবে না তা।

চারদিকেই তো সমান ঘন নারকেল বন, কোন গাছ কার—হিসেব রাখা ভার। বলি, অন্যের গাছ থেকে নারকেল পাড়ে না এরা? লাহিড়ীভাই বললেন,—এই তো মজা, কেউ কারো গাছে হাত দেবে না।

দলে দলে লোক চলেছে পথে, সমুদ্রে মাছ ধরতে। পুরুষদের হাতে দা, গিন্নিদের হাতে ছুরি, ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে খালুই, পুত্রবধূ বা কন্যার মাথায় এক এক বোঝা শুকনো নারকেল পাতার ডাল। পুরো এক একটা পরিবার এক এক দলে।

এই দ্বীপের মাছ ধরার কাহিনী বলছিলেন লাহিড়ী বৌদিদি। সন্ধ্যে রাত্রিতে দ্বীপের এ এক শোভা। শুকনো নারকেল পাতার এক একটা লম্বা ডাল লতা দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধা। নারকেল পাতার ছড়ানো পাতাগুলি মুড়ে থাকে এইভাবে। এই ডালের মাথায় আগুন লাগিয়ে জলের ধারে ধারে হাঁটে, সেই আলোয় তীরের কাছে অল্প জলে মাছ আসে, কাঁকড়া আসে, 'ষ্টার ফিস' আসে। বৌ-মেয়েরা একজন আলো ধরে চলে, বাড়ীর কর্তা বা বড় ছেলেরা জলে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে দেখতে যায়—মাছটা কাঁকড়াটা দেখলেই দা দিয়ে কোপ দেয়, তুলে পারে ছুঁড়ে ফেলে। ছোটর দল কুড়িয়ে আনে, গিন্নি ছুরি দিয়ে মাথাটা কেটে খালুইতে ভরে।

একটি ডালের আলো শেষ হয়ে আসে তো আর একটি ডাল জ্বালিয়ে নেয় সেই আগুনে। ঐ আলোর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে সবাই, চলতে চলতেই মাছ ধরে। সারি সারি আলো সমুদ্রের পার ধরে চলতেই থাকে। সাগরতীরে এ এক খেলা সন্ধ্যাকালে। যেন আলেয়ার নৃত্য—চলতে থাকে পার জুড়ে।

নিশ্চিন্ত আরামে আছে দ্বীপবাসীরা। বনে হিংস্র পশু নেই,—এক আছে বুনো শুয়োর, তা—তাড়া না করলে তারাও করে না তাড়া। সাপও তাই।

লোকেরা নিজেরা মাছ ধরে, নিজেরা খায়। বিক্রি করে না, পয়সার প্রয়োজন নেই। নারকেল চাইলে এমনিই দেয়, বাজারে বেচার রেওয়াজ নেই। সমুদ্রের হাওয়ায় দ্বীপের মাঝে সহজ আনন্দে আছে দ্বীপবাসী। পুরুষদেরও তেমন কাজ নেই, মেয়েদেরও বেশী কিছু করতে হয় না। ভারত সরকার বলে, তোমাদের ঘরে ঘরে জলের নল বসিয়ে দেবো। এরা বলে, কি দরকার? এখন যদি বা মেয়েরা একটু জল তোলার কাজ করছে, তখন সেটুকুও আর করবার থাকবে না। ছেলেরা স্কুলে পড়ছে অবশ্য, স্কুল হয়েছেও স্থানে স্থানে; এরা বলে. পড়াশুনা করে তখন হয়তো নারকেল গাছে চড়ে নারকেল পাড়তে চাইবে না আর। তবে সেই পড়ার কি প্রয়োজন? মেয়েদের গহনার চাহিদা নেই; নিজ নিজ সম্পত্তি বাড়াবার লালসা নেই। অভাব নেই কোনো কিছুর। দ্বীপে যা আছে যথেষ্ট আছে। আনন্দময় দিনগুলি এদের, শান্তিময় এদের জীবন।

জাহাজ ছাড়বে রাত দশটায়। সারারাত চলবে। এবারে যাবো কাচাল, নানকৌরী হয়ে গ্রেট নিকোবরে। জাহাজে রাত্রের খাবার সময় সাড়ে ছয়টা হতে আটটা পর্যন্ত। আটটার পরে শেষ হয়ে যায় খাবারের পাট।

এত তাড়াতাড়ি ঘুম পায় না। উপরের ডেকে খোলা হাওয়ায় গিয়ে বসি। আকাশ ভরা তারা জ্বলজ্বল করে। তারার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ বুজে এলো। নীচে নেমে কেবিনে ঢুকলাম। শুয়ে পড়ার আগে বিছানার পাশে 'পোর্টহোল'টা দিয়ে একবার তাকালাম। একছড়া তারার মালা পড়ে আছে কার-নিকোবরের বালুতট ঘিরে।

এখনো মাছ ধরছে নিকোবরীরা।

কাচাল

ভোরে জাহাজ নোঙর গাড়লো 'কাচাল' দ্বীপের কাছে এসে। খবর এলো হয়তো নামা হবে না কাচালে। হাওয়া খারাপ। তাছাড়া জাহাজের বোটের কি যেন কি গোলমালও হয়েছে।

কাচালে নামবার জন্য তৈরী হয়ে চা খাচ্ছি আর শুনছি সব মন্তব্য—যাঁরা আমাদের নিয়ে যাবার ভার নিয়েছেন, তাঁদের। মনে হচ্ছে না-যদি যাই তবেই যেন খুসী হন সবাই। ঝঞ্ঝাট কমে। এদিকে জাহাজের জলে পড়েছে টান, খাদ্যে টানাটানি। জাহাজে এসেছে মস্ত একটি দল ভারত সরকারের তরফ থেকে, গ্রেট নিকোবরে কাজ করবার জন্য। এত বড় দল আগে আর আসেনি এভাবে। তিনমাস থাকবে দ্বীপে দলটি, তাদের খাওয়া-থাকা কাজ করার সকল সামগ্রী জাহাজ থেকে নামানো নিয়ে প্রচুর সমস্যা সামনে। কর্তাব্যক্তিদের বদন বিরস। সব মিলিয়ে এক করুণতর ভাব। এমন সময়ে কাচাল দ্বীপ হতে রানীচাঙার ছোট্ট একখানি মোটর বোট এলো আমাদের নিতে। তাতে উঠলাম মাত্র চারজন। বিমল, বিনোদ, মনি ওরা কেনোতে চললো। একটু চলেই মোটর বোটের ইঞ্জিন

বন্ধ হয়ে যায়, আর লোকেরা বৈঠা চালায়। এই করে করে তীরের কাছে এলাম।

তীরের নারকেল গাছের পাতাগুলি অবিরত হাওয়ার ধাক্কা খেয়ে উল্টে পিছন দিকে গোল হয়ে ছড়িয়ে আছে। যেন দশ বারোটি প্রপেলারের বৃহৎ আকারের 'ঊষা ফ্যান'—এক একটি ষ্ট্যাণ্ডের উপরে দাঁড় করানো রয়েছে। সুইচ টিপলেই বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকবে।

নারকেল গাছ এরা লাগায় না। গাছ থেকে নারকেল ঝরে পড়ে তলায়, জল মাটি পেয়ে আপনিই চারা হয়—বেড়ে ওঠে, ফল ধরে, ফল ঝরায়।

কাচাল দ্বীপের এই জায়গাটায় সমুদ্র খানিকটা খাঁজ কেটে ভিতরে ঢুকে গেছে। এখান হতেই সবাই জলপথে নামে, তীরে ওঠে। কাঠের পাটাতন ফেলা জলের উপরে এগিয়ে আসা ঘাট, কাশীর স্নানের ঘাটের মতো। নারী পুরুষ শিশুর দল ভীড় করেছে ঘাটে। মেয়েদের পরনে ছিটের রঙীন লুঙ্গি, ছেলেদের পরনে ছিটের রঙীন ইজের। ঘাটে যেন ফুল ফুটে আছে থোকা থাকো নানা রঙের।

রানীচাঙা হাত ধরে টেনে তুললেন ঘাটে, সাদা নয়নতারার মালা পরালেন গলায়, হাসলেন,—এসেছি বলে খুসী হয়েছেন বোঝালেন। পরে বাহুতে বাহু জড়িয়ে নিয়ে চললেন বাড়ীর দিকে। ঘাটের পারেই রানীচাঙার বাড়ী। কচি নারকেল পাতার ঝালর দিয়ে সাজানো হয়েছে পথ, ফটক, প্যাণ্ডেল।

কাঁচা সোনার রঙে একটুখানি ছুঁয়ে দেওয়া সবুজ রঙ—কচি নারকেল পাতার। স্নিগ্ধ রঙ। না-ফোটা পাতা ডাল সমেত কেটে মাঝখানে চিরে পাতাগুলি আলগা করে দিয়ে ঝুলিয়েছে, কোথাও খুঁটিতে দাঁড় করিয়ে বেঁধে পাতাগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে। একটি কচি গাছের মতো নতুন পাতা শোভা মেলেছে। যেন রূপকথার সোনার গাছ এক একটি। কোথাও বা পাতাগুলিতে বুনানি তুলে ফটকের থামের গা ঢেকেছে, প্যাণ্ডেলের চাল বানিয়েছে। কচি পাতার রঙে যেন সাগরের শীতল হাওয়া সুশীতল হয়ে প্রাণে এসে লাগছে।

রানীচাঙার বাড়ীর সামনে বালির আঙিনা। আঙিনার ধারে গাছ কয়েকটা, তারপরেই নীল সাগর।

রানীচাঙার বাড়ী কাঠের, কাঠের খুঁটির উপরে। বড় বড় ঘর, সামনে খোলা বারান্দা। আঙিনায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সাদা ফুলে ভরা, পাতা আমাদের দেশের জামরুল গাছের মতো, তবে ফুলগুলি ছোট ছোট। রানীচাঙা বললেন, এর নাম 'ইসা'। জংলী ফল, খাওয়া যায়, তবে খান না এঁরা। ফলগুলি কি রকম হবে! জামরুলই হবে মনে হচ্ছে। ফল ধরেনি, তাই নিশ্চয় করে বলতে পারছি না। কাগজের উপরে কলম দিয়ে এঁকে দেখাই—এই রকম ফল হয় তো? এমনিতরো থোপা থোপা?

রানীচাঙা বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ।

তাহলে জামরুলই হবে। জামরুল খাই আমরা দারুণ গ্রীষ্মে। সরস ফল। দুপুরে দিবানিদ্রার পর শুকনো গলায় এই ফল খেতে অমৃত লাগে। এখানে জলভরা হাওয়া, নারকেলের হেলাফেলা,—লোকে জামরুল চিবোতে যাবে কোন দুঃখে?

অতি পুরাতন বৃক্ষ, বৃক্ষে ফুলের সমারোহ, নীচে তলা ঘিরে ছায়া। তলায় শুভ্র মিহি বালি ছেয়ে আছে সাদা ফুলের রেণুতে পাপড়িতে। দিনের আলোয় নীল সাগরের ধারে এ যেন এক স্বপ্নলোক।

মন্দিরের মোহান্তের মতো গ্রামের প্রবীণ প্রধান নতুন প্রধানকে বসিয়ে যায় গদিতে। আবার বংশ পরম্পরায়ও হতে থাকে। যেমন এখন রানীচাঙা প্রধান এখানে। তিনি তাঁর জায়গায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দিয়ে যেতে পারেন এই পদ।

প্রতি গ্রামে একজন করে প্রধান থাকে, সব প্রধানরা মিলে আবার প্রধানদের একজন প্রধান নির্বাচন করে। প্রধানের নারী-পুরুষ বিচার নেই। বল-বিভবে যাকে উপযুক্ত মনে করে তাকেই প্রধান করে সবাই মিলে। পুরুষ প্রধানকে বলে কাপ্তেন, নারী প্রধানকে বলে রানী। সেই হিসাবেই ইনি রানীচাঙা,—চাঙা এর নাম।

রানীচাঙার অনেক সম্পত্তি, দ্বীপের অনেকখানি জমির অধিকারিণী রানী। রানীর ক্ষেতে চাল হয়, আখ হয়। রানীই প্রথম চাষের পত্তন করেন এখানে। ধান চাষ আগে করত না কেউ, এখন অনেকে চাষ-আবাদ শিখছে। অতিশয় উর্বরা মাটি, আখ হয়েছে যেন এক একখানা মুলি বাঁশ।

এ দ্বীপে ভারত সরকার স্কুল করেছে, ডিস্পেন্সারি খুলেছে। ঘাটের উপরেই স্কুল, ডিস্পেন্সারি।

প্যান্ডেলে বসলাম সবাই। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা হিন্দি গান শিখেছে,—'দেশ হামারা হিন্দুস্থান', 'আরাম হারাম হ্যায়'। রানীর ভাইপো পুত্র পুত্রবধূ বোনপো বোনঝি সবাই তাদের দ্বীপের সাজে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে পাশে। তারা নাচ দেখাবে, গান গাইবে। গিন্নিবান্নি মহিলা তারা, ছেলেরাও কেউ তরুণ বালক নয়।

সবল সুগঠিত দেহ পুরুষদের, মেয়েরা একটু স্থূলাঙ্গী। এখানকার নাচ দেখাবে, গান গাইবে, সেই সাজে সেজে এসে দাঁড়িয়েছে একদল। মেয়েদের পরনে রঙীন লুঙ্গি, গায়ে সাদা ব্লাউজ। ছেলেদের পরনে লেংটি—সামনের দিকটায় কারুকাজ করা—রঙীন, পিছনের দিকটা সাদা—সেই সাদা অংশটা লম্বা হয়ে মাটি ছুঁয়ে ঝোলে কোমর হতে, লম্বা লেজের মতো। গলায় পুঁথির মালা, রুপোর সরু সরু চেনের গোছা পৈতের মতো পরা—অজন্তার ছবির মতো। কোমরেও সরু চেন একগোছা। লম্বা একটা রঙীন কাপড় কোমরে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধা। মাথায় সাদা ফেটি বাঁধা। নোনাজলের রোদে হাওয়ায় তাম্রবর্ণ দ্বীপবাসীর মস্তকোপরি এ এক শুভ্র কিরীট। সর্বোপরি নারীপুরুষ সকলের গলায় দুলছে হালকা সবুজ রেশমের মতো কচি কলাপাতার মালা উরু ছুঁয়ে।

অপরূপ এই মালা। যেন সুকোমল হাতের না-ছোঁওয়া একখানি আলিঙ্গন।

সবচেয়ে কচি যে কলাপাতাটা—যেটা গাছের মধ্যিখানে গা মুড়ে থাকে, রোদ হাওয়া যার গায়ে লেগে পুরোপুরি সবুজ রং ধরেনি তাতে এখনো, সেই পাতাটির শির বরাবর কেটে লম্বা দু'খানা করে, তারপর পাতাটা নখ দিয়ে চিরল চিরল করে চেরে। চিরবার সঙ্গে সঙ্গে চেরা পাতাটা গুটিয়ে কুঁকড়ে যায়। তখন এটি চাদরেব মতো গলায় ঝোলায়, ঘাড় বেয়ে গলা বেয়ে দোলে দু' প্রান্ত বলিষ্ঠ বুকের উপর দিয়ে। মনে হয় ঝালর দেওয়া স্বর্ণ-সবুজ পশমের ওড়না। ঐ একটি মালাতেই পুরুষের রাজপুত্রের বেশ।

নারীপুরুষ দু'হাত মেলে বাহুতে বাহু জড়িয়ে ঘিরে ঘিরে নাচল, গাইল। যে ভাষা বুঝি না তা যেন অনেক ক্ষেত্রে একই বলে মনে হয়। মনে হল চীন দেশেও যেন এমনি গানের সুর শুনেছিলাম। ছেলেরা গাইল মোটা চাপা

গলায়, মেয়েরা সুর তুলল মিহি সুরে। সুরের দুই পর্দা মিলে হু-হু হাওয়ায় ঢাক আর বাঁশীর একটা মিলিত সুর যেন কানে এলো। এরা যেন উদাত্ত কণ্ঠে প্রাণ খুলে গায় না গান। কণ্ঠ চেপে ভিতর হতে একটা সুর বের করে। সাগর-পারে তাই বোধহয় করতে হয়। হাওয়ার ধাক্কায় এইভাবেই সুর বের করতে হয়।

এই নাচের পরে লাঠি নৃত্য। আড়াই মানুষ-সমান লম্বা লম্বা দুই লাঠি হাতে নিল দুইজন পুরুষ। মাথায় পরেছে মোটা কালো কাপড়ের টুপি, দু' দিকে উঁচু উঁচু কান-তোলা টুপি। দু'কানে কোঁচানো কাপড়ের দুটি সাদা ফুল। এই টুপি, এই কান,—এদের জাতের বিশেষ সাজ; আর পিছনে লেজের মতো লেংটির সাদা কাপড়ের অংশটা।

সকল উৎসব অনুষ্ঠানে মনে আনে পূর্বপুরুষের স্মৃতি—পুণ্যস্মৃতি। এরা বলে—এরা জানে,—এককালে সাগরের জলে সব ভেসে যায়, কেবল একটি পুরুষ ও একটি কুকুরী মাত্র বেঁচে থাকে একটা গাছে উঠে। সেই মানুষ ও কুকুর থেকে এদের জাতির উদ্ভব। সেই স্মৃতিতেই কুকুরের কানের মতো কান-তোলা টুপি পরে, আর পিছনে কাপড়ের লেজ ঝুলিয়ে রাখে।

আগে এরা সর্বদাই এই সাজে থাকত। যখন বাইরের লোক দ্বীপে আসতে ভরসা পেত না, দূরে জাহাজ হতে দূরবীণ দিয়ে দেখত,—দেখত লোকেরা চলছে ফিরছে—পিছনে লম্বা লেজ লুটোচ্ছে। দেখে তারা বলত—'এ দ্বীপের প্রাণীরা মানুষের মতোই, তবে পিছনে তাদের লম্বা একটি লেজ।

নাচের ঝোঁকে-তালে লম্বা লেজ উড়ছে দুলছে, কালো কানের সাদা ফুলের পাপড়ি কাঁপছে। হুঙ্কারে গর্জনে লাঠি হাতে লাফালাফি, ঠকাঠকি। এই নাচই ছিল আগে লড়াই। কারো সঙ্গে কারো ঝগড়া হল, বাদবিসম্বাদ হল,—দু'পক্ষ লাঠি হাতে এগিয়ে এলো। রানীচাঙা কড়ে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আগে এতটুকু কারণেই এই লাঠি খেলা হত। কত লোক মরত, কত হাত-পা ভাঙত। নাকে এই লাঠি পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।

কয়েক বছর আগে রানীর আদেশে ঝগড়ায় লাঠি চালনা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন লাঠি দিয়ে খেলাই দেখানো হয়—সে খেলায় মারপিট নেই।

গ্রামের মুরুব্বিরা স্বামীকে বললেন, খুব খুসী হয়েছি তোমরা এসেছ; আবার এসো। আমাদের একটা সিনেমা হাউস চাই।

হাসিখুসী মানুষ রানীচাঙা। ভাঙ ভাঙা হিন্দিতেই তিনি কথা বললেন। দেখলেই বোঝা যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা। স্বামী অন্ধ, গত যুদ্ধে চোখে কি যেন লাগে, অন্ধ হয়ে যান। স্নিগ্ধ মূর্তি ভদ্রলোকের। উপরে খোলা বারান্দায় বসে আছেন। পরনে ফুলপ্যাণ্ট সার্ট। রানীর পাঁচ পুত্র, এক কন্যা। কন্যা মেরীর স্বামী 'পিলপিলো'র কাপ্তেনের ছেলে। স্বামী পুত্র-কন্যা তিন পুত্রবধূ নাতি-নাতনী ভাইপো ভাইঝি দেবর ভাসুর জা আত্মীয়গোষ্ঠী নিয়ে বিরাট সংসার। ধবধবে সাদাবালির একই আঙিনায় অনেকগুলি আলাদা আলাদা ঘর। সব মিলে একটি গ্রাম। এমনিতরো আরো গ্রাম আছে ভিতরে ভিতরে।

রানীর নিজের বাড়ী অনেকটা আধুনিক ফ্যাসানের। বসবার ঘরে সোফাসেটি টেবিল টিপয়, মেঝে রঙীন লিনোলিয়ামে ঢাকা। টেবিলের দু'পাশে দুই কাচের বোতলে প্লাষ্টিকের ফুল, উড়িষ্যার তৈরী মোষের শিঙের সারস, মহীশূরের তৈরী চন্দন কাঠের হাতী। দেয়ালে বড় বড় ফটো, রানী একবার যখন এসে-ছিলেন দিল্লীতে তখনকার তোলা—পণ্ডিতজীর সঙ্গে, রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে।

গান্ধিজীর রঙীন ছবি, রঙীন তাজমহল পাশাপাশি। আর ঝুলছে নোনা জলের হাওয়ায় কালো হয়ে যাওয়া জরির মালা, দিল্লী থেকে পাওয়া।

খাবার এলো প্লেটে, সঙ্গে সৌখীন কাঁটা চামচ, ন্যাপকিন। ডিম সিদ্ধ, প্লেটজোড়া আটার তৈরী জিলিপী—উপরে গুড়ের রস ছড়ানো, কলা, বিস্কুট দিলেন খেতে। আর দিলেন কাঁচের গ্লাসে ভরা ডাবের জল, আখের রস।

রানীর ঘরে ট্রানজিস্টর, রেফ্রিজারেটর। রানীর পরনে লাল জর্জেট শাড়ী, কানে পান্না বসানো সোনার ফুল, পায়ে কালো ভেলভেটের ব্যালেরিনা সু। রানীর ছেলেরা সার্ট প্যান্ট পড়ে। কাচালের অন্যান্য পুরুষ-নারীর সাজ নিকোবরীদের মতো। কাচালের লোকেরা ভাবে কার-নিকোবরীরা বেশী আধুনিক। বলে—তারা অনেক 'আপ-টু-ডেট'।

আমাদের সঙ্গে এসেছেন পোর্টব্লেয়ার থেকে রামসুন্দরম, ওখানকার রেডিও স্টেশনের কর্তা, সব জায়গায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন, দ্বীপবাসীদের কথা, গান টেপ রেকর্ডে ধরে নিচ্ছেন। রামসুন্দরমের অনুরোধে আমার স্বামী রানীকে বললেন কিছু বলবার জন্য। বললেন,—না হয় দিল্লীতে গিয়ে পণ্ডিতজীর সঙ্গে যে দেখা হয়েছিল তাই বলুন।

রানীর মুখের সামনে মাইক ধরে আছে হরচরণ সিং। রানী হেসে গড়িয়ে পড়েন। হাসতে হাসতেই বললেন, কি বলব! আচ্ছা, আমি দিল্লী গিয়েছিলাম, পণ্ডিতজীর সাথে দেখা হল। খুব ভালো হল। সব খুব ভালো ছিল। খুসী ছিলাম—ব্যস, বলে হেসে হাততালি দিলেন। মানে, বক্তৃতা শেষ হল। রানীর সঙ্গে সঙ্গে আর সবাইও হেসে উঠল।

রানীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রথম হতেই কাচালে এক ঘরোয়া আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। এসে অবধিই সব কিছুতেই যেন খুসী হয়ে উঠছি। নির্মল আলো-হাওয়ায় ঝলমলে দ্বীপখানি যেন হাসি দিয়ে কানায় কানায় ভরা। রানীর এটি নিজ গ্রাম, রানী নাম রেখেছেন 'জহর গ্রাম'।

এদের উপরের ঠোঁট মোটা, একটু উল্টানো। দেখতে দেখতে চোখেরও একটা অভ্যেস হয়ে যায়, এদের সুন্দরী লাগে, মেয়েরা কথা বলে, যেন গান করছে—এমনি সুর ঝরে কথার টানে।

রানীচাঙাই এখানে সর্বেসর্বা। এদের সব রীতি-নীতি ভালো। আত্মীয়-গোষ্ঠী মিলে গ্রাম, গ্রামের সবাই প্রধানের অধীন। প্রধানের আদেশ মেনে চলে সবাই। যা কিছু তাদের উপার্জন আহরণ, খাদ্যসামগ্রী—সব এনে দেয় প্রধানকে। প্রধান সবাইকে খাবার বেঁটে দেয়, বাসগৃহ বানিয়ে দেয়। লোকেদের জীবন-যাত্রার যা কিছু প্রয়োজন সব মেটাবার দায়িত্ব প্রধানের। গুরুদায়িত্ব। যদি প্রধান সবাইকে সমান সন্তুষ্ট না রাখতে পারে,—গ্রামবাসী পুনরায় প্রধান নির্বাচন করতে পারে। এ ক্ষমতা তাদের আছে। তবে, তা হয় না বড়ো।

রানীচাঙা কাকে প্রধান করবেন বলে ঠিক করেছেন, জানবার জন্য কৌশলকুমার একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, বলল, রানীসাহেবা যেভাবে সব পরিচালনা করছেন, এইভাবে তাঁর কাজ চালিয়ে যাবার জন্য কাকে সুশিক্ষা দিয়ে তৈরী করছেন? 'ডেলিকেট' প্রশ্ন। সন্তানরা সামনে। রানীচাঙা চালাক, বুদ্ধি রাখেন; বললেন, এখনো সেকথা ভাবিনি।

রানীর ছেলেরা কৃশ্চান। রানী নিজেকে হিন্দু বলেন। সম্প্রতি একটি মন্দির

করেছেন গ্রামে, দেখাতে নিয়ে চললেন। কাঠের ঘর, ঘরে 'মুরলীধর'।

রানী পুজো করেন।

রানী ঘুরে ঘুরে তার গ্রাম দেখালেন। নতুন পুরাতন অনেকগুলি বাড়ী। নতুনগুলি বাংলোর মতো পুরাতনগুলি গোলঘর। সব বাড়ীগুলিই খুঁটির উপরে। মেঝে কাটা দরজা দিয়ে নীচ হতেই গোলঘরের প্রত্যেকটিতে 'স্পিরিট'-এর প্রতিমূর্তি সর্বাগ্রে নজরে পড়ে। কোনো ঘরে কাঠের চিত্র-বিচিত্র নৌকোয় কাঠের চিত্র-বিচিত্র পাখী ডানা মেলে আছে, কোনো ঘরে কাঠে খোদাই মনুষ্যমূর্তি।

একটা ঘরে দ্বীপবাসী অনেকে এসে জমেছে, নীচ হতেই দেখতে পাই পান-সুপারী খাচ্ছে সবাই বসে বসে। নিশ্চিন্ত ভাব। উপরে উঠে ঘরে ঢুকে আরো ভালো করে দেখতে চাই। দরজার মুখে—এখানে আবার মইও নয়, আছে এক-খানি সরু তক্তা ফেলা; প্রতি বছরের রসের জন্য যে খেজুর গাছ কাটা হয় সেই রকম খাঁজ কাটা কাটা। এই খাঁজে খাঁজে পা রেখে লোকে ওঠে নামে। পারবো না উঠতে! খাঁজ হতে পা ফসকালেই তো বিপদ।

রানীর বড় ছেলে তখন আর এক বাড়ীর একটা শক্ত মই নিয়ে এলো। উপরে উঠেই 'স্পিরিটের' মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

ঘরের মাঝখানে বড় একটা কাঠের পুতুল, মুখে গায়ে রঙ দিয়ে নানা নক্সা আঁকা। দু'হাত দু'দিকে মেলে থাকার ভঙ্গী। কাঁধের উপরে লম্বা কাঠি। সেই কাঠিতে ঝুলছে দু'ধারে নারকেল পাতা, সুপুরী পাতা, নারকেল, শুকনো সুপুরী, রঙীন কাপড়ের টুকরো। শুয়োরের দাঁত সমেত নীচের চোয়ালের কতকগুলি হাড়ও ঝুলছে সেখানে। প্রতি বছরে পুজো দেবার কালে যে শুয়োরটা মারে সেই শুয়োরের চোয়ালের হাড়টা ঝুলিয়ে রাখে পর পর সাজিয়ে। আরো কত কী আছে সেই কাঠিতে ঝোলানো, কাঠের ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে সব। ঘরের মধ্যিখানের ভালো স্থান বা বিশেষ স্থানটা প্রেতদেবতার। মানুষেরা তার আশেপাশে যেন আশ্রয়প্রার্থীর দল।

একই ঘরে লোকের থাকা-শোওয়া, রান্না-খাওয়া। একদিকে কার-নিকোবরের মতোই ছাই-বালির উপরে উনুন পাতা। দিনের সর্বক্ষণ আগুন জ্বলে উনুনে; কিন্তু ঘর পুড়েছে শোনা যায়নি কখনো। চালের বাতায় গুঁজে রাখা চাটাই, ঝুড়ি হাঁড়ি গৃহস্থালীর যাবতীয় জিনিস। মেঝে পরিষ্কার, ঘরের নীচে থাকে বৈঠা কেনো, বসবার মাচা। মাচার নীচে থাকে পোষা শুয়োরের দল।

কাচালবাসীদের সন্তান হয় বাড়ীতেই। শবদেহ কবরও দেয় বাড়ীর সীমানার মধ্যেই। রানীর ঘরের পিছন দিকে দু'পা যেতেই একটা জায়গায় তিনটে খুঁটি পোঁতা, খুঁটিতে জড়ানো কাপড়ের টুকরো। খুঁটির গোড়ায় একটি করে বালতি কাত করে রাখা, একটা এনামেল করা প্লেট বাটি ও চায়ের পেয়ালা। বিশেষ দিনে মৃত আত্মার উদ্দেশে আহার পানীয় দিতে হয় এতে করে। তাই এসব রাখা। তাছাড়াও মৃতের ব্যবহারের জিনিসপত্রও মৃতের সঙ্গে দিয়ে দেওয়াই এদের রেওয়াজ।

সমুদ্রের ধার ধরে পথ, পথ ধরে পাতাবাহারের বেড়া, আর আছে কিং-কোকোনাট। কাচাল দ্বীপে মাত্র বারোশ' লোকের বাস। প্রচুর জমি, সুখী লোক। মাছ আছে ফল আছে শস্য আছে নারকেল আছে। আরামে আছে সবাই। জীবন ধারণের সংগ্রাম নেই।

যে ঘাট দিয়ে কাচালে ঢুকেছিলাম সেই ঘাটের সামনে এসে দাঁড়াই। ঘাটের

কাছের জলটা অনেকখানি জুড়ে কালো হয়ে আছে। এমন যে পান্না-ধোওয়া জল—যেন জমাট শেওলায় ছেয়ে গেছে।

রানী বললেন, মাছ, মাছ, 'তানি' মাছ।

সার্ডিন মাছের মতো মাছ ভীড় করেছে তীরের কাছে। আসে এরা এইভাবে ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে, একেবারে পায়ের কাছে—হাতের নাগালে।

বোট ছাড়লো। দূরে আমাদের জাহাজ। জাহাজ আড়াল করে ঢেউ আসছে ঢেউ যাচ্ছে। সেই ঢেউ-এর ভিতরে ওঠা-নামা করে বোট চললো তীর ছেড়ে।

নানকৌরি

সাগরের উত্তাল উন্মুক্ত পথ হতে জাহাজ যেন এবার দুর্গে ঢুকলো। দু'পাশে দ্বীপ রেখে সমুদ্র যেন গোপন সুড়ঙ্গ কেটেছে একটি জাহাজকে এনে নিরাপদে লুকিয়ে রাখার জন্য। প্রকৃতির আপন মনের গড়া বন্দর। জাহাজ এসে ঢোকে এখানে।

বন্দরে ঢুকতে বাঁদিকে 'কামোরটা' দ্বীপ। দ্বীপের মাথায় কয়েকটা ঝাউ গাছ। ইংরেজদের আগে ড্যানিসরা এসেছিল এখানে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে। এই দ্বীপের টিলার উপরে ঘরবাড়ী তুলেছিল, ঝাউ গাছ লাগিয়েছিল। যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা সফলকাম না হওয়াতে সব ছেড়েছুড়ে চলে গিয়েছিল তারা। তাদের ঘরবাড়ীর চিহ্নও নেই, ধুলো হয়ে গেছে সব; কিন্তু ঝাউ গাছ কয়টি আজও হাওয়ায় দোলে আকাশের গায়ে। কাছে গেলে তার ধ্বনিও বুঝি পেতাম শুনতে।

ড্যানিসদের পরে বৃটিশ মিশনারীরাও এসেছিল। তারাও ঘরবাড়ী তুলেছিল, ধর্মপ্রচারে লেগেছিল। তাদেরও চলে যেতে হয়েছিল। সেখানে আবারও ঘরবাড়ী তোলা হয়েছে, এবারের বাড়ী ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। ভারত-সরকারের কর্ম-চারীরা থাকে সেখানে। কামোরটার মুখোমুখি এপারে 'নানকৌরি' দ্বীপ।

নানকৌরী ঘেঁষেই আমাদের জাহাজ থামলো। জন পঞ্চাশেক কুলি নামলো এখানে। সরকারী গঠনমূলক কাজে দরকার পড়েছে তাদের। দ্বীপের লোক খাটতে জানে না, খাটতে কেন হবে তাও জানে না। পুলিসের লোকও নামলো কিছু। মালপত্র, মানুষ ওঠা-নামা করছে, এপার ওপার হতে কেনো আসছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে। দেখছি ডেকে দাঁড়িয়ে। এদের ওঠা-নামা শেষ হলে, ভীড় ঠাণ্ডা হলে নামবো আমরা।

'এমারেল্ড-গ্রীন' জল, টলটল করছে সাগরটুকু। কোথা হতে হুসহুস করে বাইচ খেলার দুই কেনো এসে দাঁড়ালো সেই জলে। অকস্মাৎ কোন অদৃশ্যলোক হতে এলো যেন এ-দুটি।

নারকেল পাতার ঝালর দিয়ে সাজানো কেনো, একটিতে বসে আছে পর পর পাঁচটি মেয়ে, পরনে বড় বড় সাদা ফুলের ছাপ তোলা গোলাপী লুঙ্গি, গায়ে

বেগনি ফুলের ছাপ তোলা সাদা ব্লাউজ। মেয়েরা বসে আছে, সাদা ফুলে বেগুনি ফুলে গোলাপী রঙে—সব মিলিয়ে যেন ফুলভরা ঝাড়িগুলি কেনো ভরা।

ছেলেরা পরেছে লাল কাপড়, লেংটির মতো টেনে পরে কোমরে জড়িয়ে বাকীটা ঝুলিয়ে দিয়েছে পিছনে। গলায় সকলেরই সেই রেশমের উড়ানির মতো কচি কলাপাতার মালা। এবারে এ মালা দূর হতে দেখেই চিনে ফেলেছি। কাচালে অনেকক্ষণ লেগেছিল বুঝে উঠতে। নাচ দেখছি, গান শুনছি, আর মালা হেলছে দুলছে দেখছি। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী এই অতি কোমল জিনিসটি। নাচের পরে কাছে গেলাম, হাতে নিলাম। কচি পাতার সুবাস নাকে এলো, তখন বুঝলাম। এ মালা চির নবীন, চির উজ্জ্বল, বক্ষ জুড়ে এক শীতল স্পর্শ। এ মালাকে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে নেই। দেহের তাপে মলিন হয়ে আসে। তৈরী করে সঙ্গে সঙ্গে গলায় পরো, নাচো, গাও, পরে সাগরের জলে ভাসিয়ে দাও, নয়, বনভূমিকে অঞ্জলি দাও।

এইসব দ্বীপবাসীদের বাইচ খেলার খুব নামডাক। পূর্ববঙ্গে বাইচ খেলে নদীতে; কিন্তু সাগর জলে বাইচ খেলা—সে হয় কেমনতরো? দেখবার সখ ছিল। অন্য দ্বীপগুলিতে সময় পাওয়া যায়নি। একটু সময় দরকার আয়োজন উপকরণের জন্য। সাগরের খেয়াল-খুসীর উপরও কিছুটা নির্ভর করতে হয় বৈকি। তাই আগে হতে কৌশলকুমার খবর পাঠিয়ে বাইচ খেলা দেখাবার ব্যবস্থা করেছে এখানে।

নানকৌরির জেটি ভালো, তবু লঞ্চে করে যেতে হবে পারে। আমাদের লঞ্চ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাইচের কেনোও জলে ছুটলো। সরু লম্বা কেনো দুটি নীল জল কেটে শোঁ শোঁ করে চললো। ছেলের দলে মেয়ের দলে খেলা, কখনো মেয়েরা আগে যায়, কখনো ছেলেরা। লঞ্চের লোক জাহাজের লোক পারের লোক উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠছে, হাততালি দিচ্ছে। ময়ূরপঙ্খী রাজহংস পাল্লা দিয়ে চলেছে। মেয়েদের কেনো এগিয়ে আসতে আসতে পারের কাছা-কাছি এসে পিছিয়ে পড়লো। ছেলেরাই জিতলো।

মেয়েরা সবাই ঘরের গিন্নি, ছেলেরা এদের স্বামী দেবর ভাই, যুবক-যুবতী দেখালেও বয়স্ক সবাই।

নানকৌরিতে নামতে প্রথম দৃশ্য তীরে বালির উপরে লম্বা লম্বা খুঁটি—স্পিরিটের। পুজো দিয়ে এখানেই আগে খুসী করে। গ্রামে ঢুকতে বাধা দেয়।

নানকৌরির সাগর থেকে সবচেয়ে বেশী কোরাল তোলে ডুবুরীরা। নানা নক্সার নানা আকারের কোরাল। সমুদ্রের তলার যেসব গাছ ফুল ছবিতে দেখি—সেই রকম। অনেকগুলি কোরাল উপহার দিল আমাদের। সদ্য তোলা কোরাল, ভিতরে ভিতরে ছোট ছোট মাছ ঢুকে আছে, শেওলা জমেছে। কৌশলকুমার ব্যবস্থা করলেন পোর্টব্লেয়ারে সোডা ইত্যাদির জলে সিদ্ধ করে পরিষ্কার করে দেবে। দুধের বর্ণ রং হবে তখন। এইভাবেই কোরালগুলি পরিষ্কার করে ব্যবসায়ীরা। লাল কোরালও আছে, সাদাও আছে।

নানকৌরি ছোট দ্বীপ, মাত্র চারশ' লোকের বাস। তেরটি গ্রাম। কিছু পাহাড়, কিছু টিলা, কিছু জমি সবুজ বনে গাছে ঘাসে ঢাকা। প্রদোষ কাল। নারকেল গাছের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে কালির আঁচড়ের মতো সাদা বালির উপরে।

সমুদ্রের তীরে ছোট্ট গ্রাম। বালির তীরে ছোট ছোট বাড়ী, ছোট ছোট মই ফেলা দোরে। অজস্র নারকেল গাছ। গাছের তলা দিয়ে জোড়া গাছের

মাঝখান দিয়ে শুকনো বালিতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে আসি ছোটদের এক স্কুল বাড়ীর আঙিনায়।

স্কুল বাড়ীর সামনে ছোট্ট সবুজ মাঠ। মাঠের পাশে ঘন সবুজ বড় বড় পাতায় ভরা ব্রেডফ্রুট গাছ, তার তলায় এসে বসি আমরা। ছাত্রছাত্রীরা নিঃশব্দে ড্রিল করে সবুজ রিবন হাতে ঝুলিয়ে। সবুজ রিবন ওঠে নামে ওড়ে দোলে নিঃশব্দে। নিঃশব্দে নরম পাগুলি পড়ে কচি ঘাসের উপরে। স্কুল বাড়ীর চারদিকে বাড়ী, মই-এর সিঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে মা'রা শিশু-সন্তান কোলে নিয়ে কেউ কেউ। কেউ বসেছে নিজ নিজ দোরগোড়ায় বালিতে। দেখছে ড্রিলরত আপন আপন পুত্র-কন্যাকে।

তটভূমি-ভরা নারকেল গাছ, গাছের ছায়ায় গ্রাম। গ্রামে ঢুকি। বালুতটে খুঁটির উপরে গোলঘর দোচালা ঘর। এ ঘরগুলি তত উঁচুতে নয়। সীমানা ঘেরা আঙিনা নেই, নেই কোনো পথের রেখা। বালিই আঙিনা, বালিই পথ। সব বালুতটই সবার।

বালির উপরেই একটি ফটক বানিয়েছে অতিথিদের স্বাগত জানাতে। একটু আয়োজন না করলে তৃপ্ত হয় না মানুষের মন। হাতীর দাঁতের মতো রঙ কচি নারকেল পাতার, সেই পাতায় বোনা ছোট ছোট ঠোঙার মতো বল,—সেই বল ঝুলছে একসারি ফটকের মাথায়—জাপানী লণ্ঠনের মতো।

খোলা আকাশের তলায় খোলা বাস-বসতি। ঢাকাঢুকি নেই। গৃহ-সম্পদ পড়ে থাকে খোলা। বাইরের খুঁটিতে ঝোলে কলার কাঁদি, কাপড়ের পুঁটলী, সবুজ পাতায় মোড়া বন হতে আনা ফলমূল। ঘরের পাশের নারকেল গাছটাতে পেরেকে আটকানো আঁশসমেত মুড়ো লেজা নিয়ে পুরো মাছের চামড়াটা শুকোয় বাইরে।

নানকৌরির লোকেরা আপনজনের মৃতদেহের মাথার খুলিটা রেখে দেয় ঘরে কাপড়ে মুড়ে চালের বাতায় টাঙিয়ে। ধোঁয়ায় কালিতে রঙীন কাপড়ের রঙ বদলাতে থাকে—সেটা যত পুরোনো হয়।

রানী লছমী এ দ্বীপের চীফ কাপ্তেন। নরম চেহারা, হালকা ছিপছিপে দেহ। লম্বা নাক কাটালো মুখ—সুন্দর মুখশ্রী। ধীর শান্ত। রূপে স্বভাবে দ্বীপবাসীর ছাপ নেই একটুও।

ইংরেজ আমলে দক্ষিণ ভারত হতে 'রাও' এলেন এ দ্বীপে এজেন্ট হয়ে। রানী লছমীর মা তখন এ দ্বীপের চীফ কাপ্তেন। রানী লছমীর জন্মের পরে 'রাও' আদর করে নাম রাখলেন লছমী। পিতার রূপ পেয়েছিল লছমী।

রানী লছমীর মার ছিল খুব নাম-ডাক এ দ্বীপে। তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। উনিশশ' চোদ্দ সালে জার্মান জাহাজ আক্রমণ করতে আসে এ দ্বীপ। রানী লছমীর মা দূর হতে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি দ্বীপে বৃটিশ পতাকা উড়িয়ে দেন। জার্মান জাহাজ ঘাবড়ে যায়, ভাবে বৃটিশ সৈন্য জমায়েত আছে তাহলে এখানে। তারা আর এগোয় না, সেখান হতেই ফিরে যায়। এই একটি ঘটনায় রানী বিখ্যাত হয়ে আছেন আজও এই সকল দ্বীপের দেশে।

রঙীন, বাংলো প্যাটার্নের, কাঠের উঁচু বাড়ী রানীর। নানকৌরি হতে যারা বাইচ খেলায় নেমেছিল সেই দলই নাচছে বাড়ীর সামনের বালুতটে। সেই একই সুরে একই শব্দ, যেন সমুদ্রের হাওয়ায় ধাক্কা খেতে খেতে ছুটছে বালির উপরে হুমড়ি খেয়ে। গানের কথাগুলি কি? গানের কথা রানী লছমীও ধরতে পারলেন

না, হাসলেন। নারীপুরুষ গোল হয়ে নাচছে, পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পা বালির ভিতরে গেঁথে যায়, সুরের ধাক্কায় পা টেনে তোলে, আবার ফেলে। সুরের জোরে নাচে তাল রেখে।

নারকেল গাছের পাতা দোলে, সাগরের ঢেউ দোলে, নাচিয়েদের দেহ দোলে সাদা বালির উপরে।

কাচালের মতো লাঠিখেলা এদেরও।

রানীর বাড়ীর উঁচু বারান্দায় বসে আছি। সমুদ্রের ধারে গোলঘর, চালাঘর, নারকেল পাতার চাল, টিনের চাল, গাছ, কেনো, আলোছায়া সব মিলেমিশে গ্রামটি। সামনের বাড়ীতে দাঁড়ে রাখা সবুজ টিয়া দুটি। এ দ্বীপে কাক নেই, টিয়া অনেক। লোকজনের ভীড় দেখে পাখী দুটো মাথা ঝাঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে কেবলই ট্যাঁ ট্যাঁ করছে। জল খেয়ে ফেলে দেওয়া ডাবটা নিয়ে একটা শুয়োর যেন ফুটবল খেলছে। সরু ফুটোতে মুখ ঢুকিয়ে খেতে পারছে না এই তার রাগ।

নানকৌরি কামোরটা মুখোমুখি দুই দ্বীপ, প্রতিবেশী। জাহাজ এসে লাগে এই দুই দ্বীপের মাঝখানে, দু' দ্বীপে সেই ঢেউয়ের ধাক্কা লাগে একই সময়ে। টলটল জল, যেন নীল সরোবর।

ভিনদেশী যুবক কামোরটায় এসে বাসা বাঁধে,—কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকিয়ে থাকে ছায়ায় ঘেরা নানকৌরির বালুতটের দিকে। সন্ধ্যা নেমে আসে, ধীরে ধীরে ঢেকে যায় ঝিলমিল করা আলোয় ভরা দ্বীপখানি ঘন অন্ধকারে। দ্বীপবালা কেনো নিয়ে ভেসে পড়ে সাগর জলে। রাতের আঁধারে দুটি প্রাণ নতুন জীবনের স্বপ্ন গড়ে। সে স্বপ্ন তাদের ভেঙে গেল একদিন। অভিভাবকদের ব্যবস্থায় ভিনদেশীকে ছেড়ে আসতে হল দ্বীপ। মউচাকে হতে হল অন্য এক ঘরের ঘরণী—সতীনের সংসারে। 'মউচা' রানী লছমীর মেয়ে, রূপসী তরুণী।

এ কাহিনী বেশীদিনের নয়—এই সেদিনকার।

মউচা যে ঘরে থাকতো সেই ঘরের বারান্দায়ই ঝুলছিল টিয়া দুটি দাঁড়ে, পায়ে শিকল বাঁধা।

রানী লছমীর ফটকের দুধারে পাতাবাহারের সারি। আঙিনার মুকুল ভরা আম গাছটি ঝুঁকে পড়েছে পথে। পাশে একটি সাদা কাঞ্চনের গাছ—মিহি সৌরভ ফুলে মুকুলে।

অদেখা মউচার জন্য দু'চোখ ফিরলো নীল সাগরে। যেন তার কাহিনী নিয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনো এই নীল জলে কেনো ভাসিয়ে।

সূর্য ডুবে গেছে, আকাশ জুড়ে তার আভা, সেই আভা পড়েছে সাগরে। নীল সাগর ভাসছে সোনার জলে। সেই জলে ভাসলাম আমরাও এই সাঁঝের কালে।

'গ্রেট নিকোবর' সত্যিই 'গ্রেট'। আকারে গ্রেট, আয়তনে গ্রেট, বন-সম্পদে গ্রেট।

ঘন ঠাস বনে ঢাকা উচু নীচু সবুজ পাহাড়ের দ্বীপ। দ্বীপের পূর্ব দিকে খানিকটা গোল খাঁজ,—যেন কোল পেতে বসে আছেন মা। এ জায়গাটুকুতে সাগরের জল শান্ত হয়ে ঢোকে।

জাহাজ এসে থামলো এখানে।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেকটর শ্রীকরুণাকেতনের নেতৃত্বে যে দল এসেছে এই জাহাজে, তারা সবাই এখানেই নামবে। অফিসার, পিওন, চাকর, মজুর নিয়ে শতাধিক লোকের এক বিরাট দল। করুণাকেতনের সঙ্গে এসেছে এন্থ্রপলজিক্যাল, বোটানীক্যাল, জুওলজিক্যাল, হেলথ মিনিস্ট্রী, মেটেরিওলজিক্যাল এই রকম সাত আটটি বিভাগের লোক। এরা দ্বীপের মাটি জানবে, জল জানবে, বন জানবে, আবহাওয়া জানবে, স্বাস্থ্য জানবে, বনের পশুপাখী জানবে।

প্রচুর মালপত্র এসেছে সঙ্গে। তাঁবু, ক্যাম্প খাট হতে মায় সূচ সুতোটি পর্যন্ত। সবকিছুই আনতে হয়েছে সঙ্গে। যার যার বিভাগের কাজেই জিনিস-পত্রই কত। তাছাড়া এতগুলি লোকের খাদ্যসামগ্রী কাপড়জামা সাবান তেল—নাই কি? শুধু কাঠ আর জল বাদ। এদুটো জিনিস এখানে অপর্যাপ্ত।

তিনটে নৌকো, মোটর বোট বোঝাই হয়ে কেবল মাল নামছে আর মানুষ নামছে দ্বীপে। নৌকো বোটের আসা যাওয়া সমানে চলেছে। এক সময়ে আমরাও নামলাম। এসেছি এতদূরে, ভূমি ছুঁয়ে যাই একবার।

গ্রেট নিকোবরে মানুষ বেশী নেই। দ্বীপের ওদিকটায় আছে আদিবাসী নিকোবরী কয়েকজন, আর আছে 'শিম্পোনী'রা,—এরা বশে আসেনি এখনো।

গ্রেট নিকোবরই আন্দামানের শেষ দ্বীপ। এর প্রায় আশি মাইল পরে মলয় দ্বীপ। অন্য রাজ্যের এলাকা। তাই এখানে ছোট্ট একটা পুলিসফাঁড়ি রাখা হয়েছে। জন বারো পুলিস থাকে। জলপথে সন্দেহজনক কিছু দেখলে বেতারে খবর পাঠাবে পোর্টব্লেয়ারে। দুমাস বাদে বাদে পুলিসের দল বদলে দেওয়া হয়, নয়তো এভাবে এমন বনে থাকতে পারে না এরা বেশীদিন।

তীরের ধারেই কয়েকটা গাছ কেটে জায়গা বের করে নিয়েছে এরা। ডাল কেটে খুঁটি গেড়ে বেত দিয়ে বেঁধে সাঁকোর মতো ছোট্ট একটা জেটিও করে রেখেছে নিজেদের সুবিধের জন্য। মাসে দুমাসে একবার করে খাবার রেশন দিতে আসে এখানে জাহাজ। নৌকোয় করে জাহাজ হতে খাবার জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে আসে, আবার জেটির খুঁটিতে নৌকো বেঁধে রাখে।

ঝকঝকে চকচকে ছোট্ট একটি বসবাস বনের মুখে। টিনের দেয়াল টিনের চালের দুখানা ঘর, আর গোটা তিনেক কাঠের কুটির। সখ করে একটি গোলাকার ঘরও তুলেছে ডাল দিয়ে বালির উপরে। চারদিক খোলা, ঘর ঘিরে ডালের থাম, ডালের বেঞ্চি। বেঞ্চির পিঠের দিকটা বেতে মোড়া,—যাতে পিঠে না লাগে ডালের খোঁচা, আরাম করে বসা যায় পিঠ ঠেস দিয়ে সাগরমুখী হয়ে।

আঙিনার মাঝে একটা কুয়ো, মানে, তিন সাড়ে তিন হাত বালি খোঁড়া জল। গর্তটা ঘিরে রেখেছে ডাল দিয়ে। টলটলে জল, সুস্বাদু জল। এ জল যত তোলে তত ভরে, এর কম নেই শেষ নেই। কুয়োর ধারে ছোট্ট একটি বেগুন ক্ষেত, বেগনি রঙের ফুল ধরেছে তাতে। এবারে ফল ধরবে। ছোট্ট পথখানির দুদিকে শিশু শিশু নারকেল পেঁপে গাছ বড় ঘরের ছেলের মতো ফেঁপে-ফুলে বাড়ছে। কথায় বলে 'সোনা ফলে মাটিতে',—এ মাটি তাই। দুটি কুমড়ো লতা মাচা ছাপিয়ে পড়েছে। কমলা রঙের ছড়িয়ে পড়া পাপড়ির কুমড়ো ফুলগুলি যেন আর ধরে রাখতে পারে না নিজেকে।

এই একটু প্রাণ, একটু শোভা, নিজের হাতের এইটুকু একটু সৃষ্টি—নইলে যে মন ভরা থাকে না। বনে এত সবুজ, এত প্রাণ—প্রতি মুহূর্তে বন বীজ ছড়াচ্ছে প্রাণ ফোটাচ্ছে, তবু মানুষ সেই বন নিয়ে কি তৃপ্ত থাকে, না, থাকতে পারে! সৃষ্টির আনন্দই আলাদা। বনের আনন্দ বন পায়। ঘরের আঙিনায় ফুল ফুটিয়ে আনন্দ পায় মানুষ। বন বনস্পতি কি পারে দিতে তা?

সরু তটরেখা। তারপরেই শুরু হয়েছে বন। বন দেখেছি বহু, আসামের বন দেখেছি, ডুয়ার্সের বন দেখেছি, নেফা সুন্দরবনের বন দেখেছি; কিন্তু এ বন আলাদা। এ যেন বিশাল বিশাল দৈত্য, সবুজ ঝাঁকড়া চুল নিয়ে দলে দলে আকাশে উঠতে কাড়াকাড়ি লাগিয়েছে।

স্বামী আমি বিমল কৌশলকুমার বনের ভিতরে হাঁটতে শুরু করলাম। গহন অরণ্য যাকে বলে—আমরা তারি ভিতর দিয়ে চলেছি। ফাল্গুন মাস—পাকা পাতা ঝরা শেষ হয়ে গেছে। তলায় শুকনো পাতা নরম মাটির স্পর্শে নরম হয়ে আছে। মরমর ধ্বনি ওঠে না মাড়িয়ে গেলে। নিঃশব্দে পড়ছে এতগুলি লোকের পা। চারিদিকে পাখীর কাকলি। ছোট ছোট কালো এক রকম পাখীই দোয়েল পাখীর মতো, উঁচু গাছের শাখায় শাখায় বসছে উড়ছে ডাকছে গাইছে। যত ছোট পাখী, তাদের ডাক যেন তত মধুর। টিয়া পাখীও ডাকলো অনেক। আর আড়ালে ডেকে চলেছে পুরুষালী গলায়—যাকে বলে 'ইমপেরিয়াল পিজন'—ঘু-উ-উ, ঘু-উ-উ। বাগী পুরুষ যেন গুমরে গুমরে উঠছে। কালো রঙের ভীমরাজ পাখী—লম্বা তার পুচ্ছ,—যেন লম্বা দুটি কাঠির ডগায় দুটি পালক বসানো। সে বনের পাখীদের ভেংচে বেড়াচ্ছে। সকল পাখীর ডাক অনুকরণ করে তাদের ক্ষ্যাপানোই এর কাজ। এই ঘন অরণ্যে রঙীন একটি প্রজাপতির মতো একটি ছোট্ট মাছরাঙা উড়ে উড়ে ডালে বসছে।

উঁচু বনস্পতিতে ভরা বন। একবার নাকি মাপা হয়েছিল কয়েকটা গাছ,—একশ' কুড়ি পঁচিশ ফুট এক একটা। তেমনি এ অরণ্যের লতা, তেমনি বেত। কত রকমের বেত এখানে। লিকলিকে আমাদের দেশী বেতও আছে আবার বাঁশের মতো মোটা বেতও আছে। এই মোটা বেত একটা লাঠির মাপে কাটিয়ে নিলাম, গ্রেট নিকোবরের চিহ্ন।

হররা গাছের কী প্রকান্ড গুঁড়ি—কী চওড়া। শিমুল গাছের গুঁড়ির মতো খাঁজ কেটে কেটে বেড়িয়ে আসা গুঁড়ি। শিমুল গাছের গুঁড়ি মাত্র তিনচার ভাগে খাঁজ কাটা থাকে, হররার গুঁড়ি বহু ভাগে হাতির কানের আকারে বেরিয়ে আসে। এক একটা কান পাঁচ সাত হাত চওড়া, কি, তারো বেশী আরো বেশী হাত লম্বায়। এই কানে লাঠি দিয়ে ঘা দিলে ডুমডুম আওয়াজ হয়। আদি-বাসীরা বনের মাঝে এতে আওয়াজ তুলে দল ছাড়া সঙ্গীদের সঙ্কেত দেয়।

বিমল ঘা মারলো, বন কাঁপিয়ে ডুমডুম আওয়াজ হল। পিছনে যারা ছিল ক্ষণেক থমকে থাকলো,—দূরে কি কেউ বন্দুক ছুঁড়লো?

শিকড়,—শিকড়ই বা কত রকম বনে। সরু মোটা হরেক রকম লম্বা লম্বা শিকড় যেন মাটির উপর দিয়ে এপাড়া ওপাড়া মিতালি করে বেড়াচ্ছে। মোটা মোটা শিকড়ে জড়াজড়ি ধস্তাধস্তি, সরু শিকড়ে মাটিতে জাল বোনা। কুমীরের লেজের মতো দেখতে আট দশ বারো চৌদ্দ হাত শিকড় যেন লেজ ঝাপটে এই দিল বাড়ি গায়ে। হাতীর শুঁড়ের মতো শিকড় যেন গুটিয়ে বাটিয়ে খাবার তুলছে মুখে।

লতা পড়ে আছে মাটিতে, যেন বৃক্ষই শুয়ে আছে মনের দুঃখে মুখ থুবড়ে। কোন কালে হয়তো বনস্পতির আশ্রয়ে ছিল, কালের কবলে আশ্রয়চ্যুত লতা এখন মাটিতে ঘর তোলে। একটি লতার মুখ খুঁজতে গিয়ে অনেকখানি দূর অবধি চলেও তাকে পারলাম না ধরতে। মাঝপথ হতে একটি লতার হিসেব নিই; বৃক্ষ আকারের ভূলুণ্ঠিত লতা এক ফার্লংটাক এগিয়ে গিয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে দুই লম্বা বাহু মেলে আরো ফার্লং খানেক গিয়ে অনেককে এড়িয়ে আপন পছন্দ মতো দুই বনস্পতিকে আঁকড়ে তাদের মাথায় গিয়ে চড়ে বসেছে। এ এক দৃশ্য বনের রাজ্যে।

বনের রঙ্গ তামাসার ভাষাই আলাদা।

এ বনে যেন সবাই রাজা। সবই বনস্পতি। দীর্ঘ ঋজু বনস্পতিরা সোজা উঠে গিয়ে একে অন্যের মাথা ছাপিয়ে আকাশের খোলা হাওয়ায় ডালপালা মেলেছে, পাতা ছড়িয়েছে। বনস্পতির দেহ ঘিরে আছে তার সন্তান-সন্ততি নাতি-পুতির দল বংশপরম্পরায়। আছে উড়ে এসে জুড়ে বসা লতা, আছে বেতসেব বাহাদুরী,—সেও উঠেছে বনস্পতির মাথায়। আছে সুপারী পাম কত রকমের তারাও জায়গা করে নিয়েছে এ ঘোর বনে। নেই কেবল নারকেলের ঠাঁই এখানে।

রামসুন্দরম আগে এসেই ঢুকেছেন বনে। পাখীর গান ধরে নেবেন টেপ রেকর্ড-এ। বললেন, ফিরে গিয়েই কেটে ছেঁটে জুড়ে গেঁথে একটা পুরো প্রোগ্রাম খাড়া করবো। পোর্টব্লেয়ারে থাকতে থাকতেই হয়তো শুনে যেতে পারবেন।

উৎসাহী ভদ্রলোক গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে টেপ-রেকর্ডার বাক্স নিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছেন।

পায়ের কাছে নজর ফেলে চলেছি। তলা ছেয়ে আছে ফুলের পাপড়িতে। মুখ তুলে দেখি, কই সে গাছ? লাল টুকটুকে ছোট ছোট ফল ফেটে বীজ উড়িয়ে পড়ে আছে তলায়, আমড়ার আঁঠির মতো আঁঠি ছড়িয়ে আছে, মুখ তুলে দেখি।

জাপানী লণ্ঠনের গড়নের মতো ফল পড়ে আছে, দেখি। এই গাছ এই ফল চিনি, সব দ্বীপেই আছে—দেখতে দেখতে এসেছি। কাজুবাদামের মতো গাছ, কিন্তু বড় বড় বৃক্ষ। এই ফল ভেঙে জলে ছড়িয়ে দেয় লোকেরা। মাছগুলি ফলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে কাছে আসে, কিন্তু সইতে পারে না, মাথায় চক্কর লাগে। তখন পার হতে লোকেরা বর্শা টেটা ছুঁড়ে বা দা দিয়ে কেটে মাছ ধরে। একথা দ্বীপবাসীদের কাছেই শুনেছি আমি। গ্রেটনিকোবরে সমুদ্রের ধার ধরে ঘন সবুজ মোটা পাতা মেলে জমাট হয়ে আছে বহু বহু এই গাছ।

বনে কত কত গাছের তলায় অসংখ্য গোটা গোটা বীজ। আম আঁঠি হতে

যেমন চারা বের হয় তেমনি প্রতিটি আঁঠি হতে কচি কচি চারা বেরিয়ে জায়গাটায় যেন শিশু দলের হুল্লোড় লেগেছে। কত জাতের অর্কিড। পায়ের কাছে পড়ে থাকা ছোট দুটি সাদা অর্কিড কুড়িয়ে নিলাম। হাল্কা মিষ্ট সুরভিতে ভরপুর। হাতে রাখলে হাতের গরমে নষ্ট হয়ে যাবে, একটা চওড়া রকমের পাতা তুলে জড়িয়ে রাখলাম। স্বামী এগিয়ে গেছেন অনেকখানি, যখন নাগাল পাবো দেখাবো তাঁকে।

কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়াবার উপায় নেই। লাল পিঁপড়ের সারি সর্বত্র। তক্ষক ছুটে বেড়াচ্ছে। মুখের কাছে ঝোলা আঁকা বাঁকা লতাটা দুলে উঠে হঠাৎ ভীত ত্রস্ত করে তোলে। পরক্ষণেই নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলি। সাপও আছে এ বনে বহু, সঙ্গের নিকোবরী সঙ্গী সেকথা সুরুতেই জানিয়ে দিয়েছেন।

কত বনস্পতি পড়ে আছে এলোমেলো. কোথাও বা তলা দিয়ে গলিয়ে যাই, কোথাও তাদের উপরে ঘোড়ায় চড়ার মতো উঠে বসে ডিঙিয়ে যাই।

ঘেমে উঠেছি। আকাশ দেখা যায় না কোনো ফাঁক দিয়ে। সমুদ্রের ধারে বন, হাওয়া নেই একটু। পাতার ঠাসাঠাসিতে হাওয়া ঢুকতে পায় না ভিতরে।

ঝিঁঝি পোকার ঝিল্লিতান থেকে থেকে কমে বাড়ে। দুপুর হয়ে এলো। দেখে এসেছি বনের বাইরে চমচমে রোদ। বনের মাটিতে কেবল ছায়া। রোদে ছায়ায় যে ঝিলিমিলি খেলা,—সে খেলা একেবারে নিষেধ বনে।

নরম মাটি. আগের রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরদিন রোদে মাটি একদফা শুকিয়ে যেমন নরম হয়ে থাকে, তেমনি।

এ বনেও হিংস্র পশু নেই, ঐ এক বুনো শুয়োর ছাড়া। এ কথা জানি বলেই এমনভাবে ঢুকেছি বনে। পায়ে পায়ে ঠোক্কর খেয়ে চলা. কত যে চললাম বনে-- তা মাইল কয়েক তো হবেই। এতক্ষণে সাগরের ধ্বনি কানে আসে। উৎসাহে এবারে আরো এগিয়ে যাই, এবারে একটু হাওয়া পাই। এই হাওয়াটুকু বনের ভিতরে চলার সময়ে পেলে বন বাগিচায় পরিণত হত।

গাছের ফাঁকে আকাশ দেখা দিল। হাওয়ায় আঁচল উড়লো। খোলা আকাশের তলায় তটভূমিতে এলাম। সাগরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

তটভূমি বলতে এ দ্বীপ ঘিরে সরু এক ফালি বালি। সমুদ্রের ঢেউ এসে একবার তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে—আবার তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। না দিয়ে উপায় কি? ওদিক হতে বনস্পতিরা শক্ত শিকড় মেলে তাকে আঁকড়ে আছে। অরণ্যে সাগরে কাড়াকাড়ি এই তীর ধরে শুয়ে থাকা ক্ষীণাঙ্গী গৌরাঙ্গী রূপসীকে নিয়ে।

তটে পড়ে আছে শামুক ঝিনুক কোরাল ফেনা—ঢেউয়ে ঢেউয়ে আসা। বড় বড় ঢেউ-খেলানো ঝিনুক কয়েকটা হাতে তুলে নিই। নিকোবরী সঙ্গী তাচ্ছিল্য-ভাবে ঠোঁট উল্টোয়। বলে, এই কি নেবার জিনিস? এ পুড়িয়ে আমরা চূণ তৈরী করি।

তবু কুড়োবার সখেই কুড়োলাম শঙ্খ ঝিনুক একরাশ। কুড়িয়ে আবার ফেলে দিলাম। বইবো কি করে? যা ভারী এক একটা।

সাগর জলে ভেসে কত কিছুই না আসে তীরে। শিকড়ে শিকড়ে আটকে আছে প্লাষ্টিকের জুতোর পাটী, সেলুলয়েডের বল, কাঁচের বোতল চামড়ার টুকরো। একটা কালো প্লাষ্টিকের স্ট্র্যাপ লাগানো মেয়েদের জুতো—নতুন চকচকে.—বিমল তুললো, দেখালো, বললো,—এ আমাদের দেশের তো নয়ই, মনে

হচ্ছে জাপান দেশের।

ফিরে এলাম পুলিশ ক্যাম্পে। সাড়ে তিন ঘন্টা হেঁটেছি বনে, হিসেব করে দেখলাম। কষ্ট হল, তবু ভালো লাগলো।

ক্যাম্পে অনেক লোক এসে গেছে, অনেক মালও এসে পড়েছে। এখনো সমানে মোটর বোট টেনে টেনে নৌকো ভরা মাল, লোক আনছে।

দুপুরের খিদে দিনের সবচেয়ে বড় খিদে। দুটো লম্বা লম্বা মোটা গাছ পাশাপাশি শুইয়ে দুটো গাছের লম্বা ফাঁকটাকে আগুন জেবলে বড় বড় বালতি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে পর পর। গাছ দুটো যেন উনুন।

কয়েকটা বালতিতে ভাত ফুটছে, কয়েকটাতে ডাল। গাছের উপর বসানো বালতি বারে বারে কাত হয়ে যাচ্ছে, চাল জল গড়িয়ে পড়ছে। বিড়ম্বনার রান্না। ঠিকনে দেবার কিছু নেই। রান্নার ডেকচিগুলি যা'তে আছে সেই 'ক্রেট'টা এসে পেঁছোয়নি ডাঙায় এখনো। ফাঁড়িদাররাই এগিয়ে এসেছে সাহায্য করতে। তারাই নিজেদের বালতিগুলি এনে রান্না চাপিয়ে দিয়েছে। একশ' কুড়িজন লোক খাবে, সহজ কথা? কোনো রকম করে এ-বেলার মতো ডাল-ভাত নামিয়ে দিতে পারলেই হয়।

যে রান্নার ভার নিয়েছে তার কেবল এই এক ভাবনা এখন। এক বালতি সিদ্ধ আলু খোসা ছাড়ানো হয়েছিল, ডালেতেই ছেড়ে দিল। তেঁতুল দিল লঙ্কা দিল পেঁয়াজও দিল তাতে। ভেবেছিল আলাদা আলুর তরকারী রাঁধবে, তা আর হল না। ওদিকে ভাতের ফেন গালা আর এক সমস্যা। আলু আনা বস্তাটা বালতির মুখে চাপা দিয়ে ভাতসমেত বালতিটা আর একটা পড়ে থাকা বৃক্ষের গায়ে কাত করে রেখে দিল।

পুলিশদের তৈরী ডাল-এর প্যাভেলিয়ান-এর কাছে ভীড় জমেছে সবার। কয়েকজন পুলিশ বনে ঢুকেছিল—এমন প্রায়ই ঢোকে। আজ অকস্মাৎ কাছা-কাছি পেয়েছে দুটি শিম্পোনী ছেলে,—ধরে এনেছে। আর এসেছে পাঁচজন নিকোবরী বালক।

নিকোবরী বালকরা হাসিখুসী, কথা বলে, মেশে। তাদের অনেকটা সহজ ভঙ্গী। ভাব আছে এদের সঙ্গে। আগেও এ'সছে এই পুলিশফাঁড়িতে আপনা হতে। শিম্পোনী ছেলে দুটি এদের চেয়ে বয়সে বড়, কিশোর। হাতে মাছ ধরবার টেটা, আর মস্ত এক খাঁড়া। পরনে না-পরার মতো ময়লা একফালি লেংটি। গলায় তুলসী-কণ্ঠীর মতো মালা,—দেখে মনে হয় সাদা, হলুদ পুঁতির মালা। কিন্তু কাছ হতে দেখলাম তা নয়। হলুদ সাদা রঙের কিসের এক মিহি পাত জড়িয়ে জড়িয়ে নিয়েছে ক্ষুদে ক্ষুদে পুঁতির মতোই লাগে দেখতে। বোধহয় কোনো লতার আঁশ হবে। বড় সুন্দর মালা। এদের নিপুণতা আছে, সৌন্দর্য জ্ঞানও আছে। নইলে এমন মালা করে কি করে? করে আবার গলায়ও পরে।

মাথার চুল রুক্ষ, তৈলবিহীন। সারা অঙ্গে খুজলি। ভীড়ের মাঝে খাঁড়া কাঁধে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিম্পোনী দুজন। কত রকম ইশারা করা হচ্ছে কথা বলবার জন্য, কো'না সাড়া নেই। নির্বাক নিস্পন্দ। ভাবলেশহীন মুখচোখ।

আদিবাসীদের জন্য উপহার সঙ্গে আনা হয়েছে। শিম্পোনী দুটিকে খুশি করবার জন্য, ভাব করবার জন্য একটা করে বালতি, একটা এনামেলের মগ, একটা তোয়ালে, একটা বেডকভার আর একটা করে রঙীন কাচ্ছি দেওয়া হল।

নিকোবরী ছেলেগুলিকেও দেওয়া হল এই একই উপহার।

কাচ্ছিটা নিয়ে একজন পুলিশ শিম্পোনীদের দেখালো কি করে পরতে হয়। মুখে ভাবের কোনো পরিবর্তন না হলেও জিনিস পেয়ে যেন খুশীই হয়েছে মনে হল। লেংটিটা একটানে খুলে ফেলে সেখানে দাঁড়িয়েই কাচ্ছিটা দু'পায়ে গলিয়ে পরে ফেললো। ফিতে বাঁধতে জানে না, কাচ্ছি কোমরে থাকে না। আমাদেরই একজন ফিতেটা বেঁধে দিল। তোয়ালের ভাঁজটা খুলে তাদের গায়ে জড়িয়ে দিল, বেডকভারটাও।

প্যাভেলিয়ান হতে উঠবো এবারে। বনের ভাপ, বালির তাত সূর্যরশ্মির তেজ,—জাহাজে গিয়ে স্নান যে করবো—সেখানে জলের টানাটানি। কল বন্ধ করে দিয়েছে কাল হতে। তবু যে করে হোক এক বালতি জল জোগাড় করতে হবেই।

ভুষো রঙের বেড়ালটা মিঁউ মিঁউ করে খুঁটির গায়ে গা ঘষতে লাগলো। আয়ার—জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার বললো, এবারে এটাকে আবার নিয়ে যাবো। জাহাজেই সেবারে ছয়টা বাচ্চা দিল, এখানের ছয়টা দ্বীপে তাদের ছয়টাকে ছেড়েছি। এটা যাত্রীদের বিরক্ত করতো বলে এটাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলাম।

নেড়ি কুকুরও আছে একটা এখানে। সেটা পুলিশদের আনা। তার সাতটা বাচ্চা হয়েছে, ছোট্ট ছোট্ট লাল কালো রঙের। ঘরের ছায়ায় কোনোটা চিত হয়ে পেট বের করে শুয়ে আছে. কয়েকটা একে অন্যের ঘাড়ে গলায় জড়াজড়ি করে পড়ে আছে, আর দুটো বাচ্চা মার পায়ে পায়ে ঘুরছে।

কাঠের দুটো বাক্সতে চারটে সাদা খরগোস এলো এবারে। এরাই সব পুলিশদের নির্জন বাসে আনন্দের ফুলকি।

জাহাজ খালি। এত যে লোক, এত মালপত্র, চলা যায় না, লোকের শুতে জায়গা নেই। আহিরজী বিনোদ ওরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, কেবিন বাঙ্ক কিছু মেলেনি, ডেকের কোনায় বাক্স বিছানা রেখে যেখানে একটু স্থান মিলেছে, বসেছে, ঘুমিয়েছে এই কয়দিন। নানা দ্বীপের যাত্রীদের ভীড়, গ্রেট নিকোবরের দলের ভীড়—জাহাজে ক্যাপটেন অনুমান করতে পারেননি; জাহাজের জল ফুরিয়েছে খাদ্য ফুরিয়েছে—ক্যাপ্টেনের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে।

ফাঁকা জাহাজে এখন ঠেলাঠেলি নেই, হৈ চৈ নেই, চেয়ারগুলি সব খালি, বাঙ্কগুলি শূন্য।

খাবার পর উপরের খোলা ডেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। দ্বীপের বাঁকের মুখে তীর ছুঁয়ে জলের উপরে একটা কালো পাহাড় কয়েকটা গাছ, এখান হতে দেখায় যেন নিকোবরীদের 'মৌচাক'-ঘর একখানি। জলের উপরে সম্পূর্ণ ছবি একটি।

পাশে ঘন-বনানী, সামনে নীল জল, দূরে আকাশের গায়ে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ। বিমল, মণি ওরা সবাই এতক্ষণে খেয়েছে কিনা—কি জানি।

অপরাহ্নের ছায়া পড়লো জলে। নীল জল কালো হয়ে এলো। আবার একবার দ্বীপে নামলাম। যাবার আগে আবার একবার দেখে যাই সবাইকে। অনেকের সঙ্গেই হয়তো আর দেখা হবে না জীবনে।

এরই মধ্যে তাঁবু পড়ে গেছে এখানে ওখানে। তাঁবু পড়েছে সামনে, পড়েছে পিছনে। পড়েছে একেবারে বন ঘেঁষে—পড়েছে বনের ভিতরে। প্রতি দলের

আলাদা তাঁবু, আলাদা আলাদা জায়গা নিয়ে। মণি বিমলদের তাঁবু পড়েছে সব দলের মাঝামাঝি জায়গায়। বনের একটু ভিতরে তাঁবু পড়েছে জুওলজিক্যাল বিভাগের। সাপ ইঁদুর কত আছে বনে হিসেব রাখতে সুবিধে হবে।

ছেলেরা যার যার দলের লণ্ঠন জ্বালাচ্ছে, তেল ভরছে;—পেট্রোমাক্সও জ্বলছে কয়টা। এবেলাও একসঙ্গেই রান্না হবে সবার জন্য। খিচুড়ি হবে কেবল। কাল থেকে রান্নার ব্যবস্থা আলাদা আলাদা।

বিমল বললো, ওবেলা খাওয়া ভালো হয়নি, ভাত ডাল দুটোই পুড়ে গিয়েছিল। এবেলা খিচুড়ি খাবে—খুব খুশী। বললো, জালও এনেছি একটা, রোজ মাছ ধরবো খাঁড়িতে—আর খাবো, সবাইকে দিয়েই খাবো।

তাঁবু খাটানো সবগুলি সম্পূর্ণ হয়নি এখনো। খটখট খুঁটি পুঁতছে ছেলেরা, কুড়ুল দিয়ে ছোট ছোট গাছ কাটছে, কেটে গাছের গোড়া উপড়ে ফেলছে, নয়তো চলতে ফিরতে হোঁচট খাবে লোক। মুখের কাছে লতাগুলি ঝুলছে গাছ থেকে, সেগুলি টেনে দড়ি দিয়ে বেঁধে বৃক্ষকাণ্ডে জড়িয়ে দিচ্ছে।

বোম্বে হতে এসেছে জুওলজিক্যাল বিভাগের দল। বন্দুক নিয়ে বনে ঢুকেছিল, চার রকমের চারটি পাখী মেরে আনলো। আহা! লেজ-ঝোলা ভীমরাজও একটা।

মালপত্র বাইরে স্তূপাকার পড়ে আছে। বিমলের আঙিনায় টিনের ট্রাঙ্কগুলির উপরে এক একজন বসে পড়ি। বিমলের সেই গ্রামোফোনটি বাজছে,—খান পাঁচেক তো রেকর্ড,—কেউ বলে সন্ধ্যা রায়ের গানটা আগে দাও, কেউ বলে হেমন্তকুমারের,—কেউ বলে লতা মুঙ্গেশকরেরই শুনতে ভালো সবচেয়ে। বিমল কিন্তু কাননবালার হিন্দি গানটাই ঘুরে ফিরে দিতে চায়। বলে, আমি কাননবালার ভক্তই বলতে পারেন।

শিম্পেনী ছেলে দুটি এখনো থেকে গেছে দেখে অবাক হই। মনি হাসলো, বললো,—বিমল ভাব করে নিয়েছে ওদের সঙ্গে। বিমল ওদের স্নান করালো, ডাল ভাত খাওয়ালো; এখন বিমলের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছে এরা। বিমল থেকে থেকেই ওদের বিড়ি খেতে দিচ্ছে, দেশলাই জেলে বিড়ি ধরিয়ে দিচ্ছে। বিমল নিজে বিড়ি খায় না, কিন্তু ওদের জন্য প্যাকেট মজুত রাখছে সব সময়ে।

আদিবাসী নিয়ে কৌশলকুমারেরও খুব আগ্রহ। শিম্পেনীরা একপাশে নিশ্চুপ নিশ্চল বসে। তাদের একটু নাচাবার জন্য সে নিকোবরী ছেলেদের দিয়ে নাচ শুরু করিয়ে দিল। তারা হাত ধরাধরি করে নাচতে গাইতে লাগলো। নাচ শেষ হল ভেবে যতবার হাততালি দেওয়া হয়, তারা আরো উৎসাহে নাচে গায়। তাদের থামানো মুশকিল। শেষে বিনোদ, কৌশলকুমার ছেলেদের টেনে একজন একজন করে আলাদা করে বসিয়ে দিয়ে নাচ থামায়। এবারে শিম্পেনীদের ইশারায় বোঝানো হল ঐ রকম করে নাচতে। তারা বুঝলো, দুজনে হাত ধরাধরি করে উঠে দাঁড়ালো, ভীরু ভীরু পা ফেলে নাচতে লাগলো। এদের নাচ নিকোবরী বালকদের চেয়ে ভালো, পা ফেলার ভঙ্গী ভালো। 'আ—ঈ' করে আস্তে একটু গানও করলো শিম্পেনীরা। নাচের শেষে সবার হাততালিতে ও বাহবায় কিছু বুঝলো—একটু হাসলোও যেন।

সবাই খুশী হয়ে উঠলো। এই শিম্পেনী দুটিকে দিয়ে অন্য শিম্পেনীদের সঙ্গে হয়তো ভাব করা যাবে একদিন।

শিম্পেনীরা আজও লোকালয়ে আসে না। দ্বীপের পশ্চিম দিকে নিকো-

বরী আছে কিছু। ব্যবসাদাররা আসে তাদের কাছ থেকে বেত কিনতে। এ বনের বেত বিখ্যাত। কি জানি কি সূত্রে কবে থেকে নিকোবরী ও শিম্পোনীদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে আছে একটা। নিকোবরী বা ব্যবসাদাররা বনে একটা বিশেষ সীমানায় গাছের ডালে শিম্পোনীদের জন্য উপহার সামগ্রী বেঁধে রেখে আসে,—যেমন তামাকপাতা, কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি। শিম্পোনীরা এক সময়ে এসে তা নিয়ে নেয়, পরিবর্তে বনের ভিতর হতে কেটে আনা বেত সেখানে রেখে যায়। উপহারের সামগ্রী কম হলে এদের নাকি আবার রাগও হয়। সেযাত্রায় বেত আর রেখে যায় না। বহুদিন হতে এইভাবেই চলে আসছে এদের। এর বেশী কেউ জানে না শিম্পোনীদের সম্বন্ধে।

কটকট করে ঝিঁঝি পোকা কানের কাছটাতে এসে যেন ডাকতে থাকলো।

রাত হল। বনের অন্ধকার এতগুলি লোকের ছোট ক্যাম্পখানিকে ঘিরে যেন আরো ছোট করে তার পায়ের কাছে এনে রাখলো।

জুওলজিক্যাল বিভাগ 'ট্র্যাপ' পেতেছে বনে তাদের তাঁবুর ধার ঘেঁষে। সন্ধ্যে রাত্রে অতটা হতে অতটা পর্যন্ত কয়টা ইঁদুর সাপ যাতায়াত করে সে জাগাটুকুতে, তা দেখতে। যারা যাবে এই পথে—ট্র্যাপে ধরা পড়বে। সময় হিসেবে সংখ্যা হিসেবে বনের সকল সাপ ইঁদুরের সংখ্যা মিলবে। সারা রাত্রিই এইভাবে হিসেব চলবে।

স্বামী বসে আছেন একবারের নমুনাটা দেখে যেতে। কখনো দেখেননি, হাতেকলমে এ জ্ঞান তাঁর নেই। তাই অতিশয় আগ্রহ তাঁর। বলেন, নিশ্চয়ই এ এক বিস্ময়কর কলকব্জার কারিগরি—এই ট্র্যাপ পাতা। বনের প্রাণীর হিসেব ধরবে একি যে-সে কথা?

জুওলজিক্যাল দলের মধ্যে একটা সাড়া, একটা চাঞ্চল্য জাগলো। যিনি আমাদের সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন, তাড়াতাড়ি ছুটে চলে গেলেন তিনি। একটু পরে একটা জাঁতিকল হাতে নিয়ে সামনে এলেন। একটা ইঁদুর পড়েছে জাঁতিকলে।

স্বামী বললেন, আর আপনাদের ট্র্যাপে?

তিনি বললেন, এই তো সেই ট্র্যাপ। কয়েক হাত দূরে দূরে লাইন করে এই জাঁতিকল পেতে রাখি। এড়িয়ে যাবার কারো উপায় নেই।

স্বামীর নিরাশ-কালো মুখখানা অন্ধকারে কেবল আমারই নজরে পড়লো। যেন একটু অপ্রস্তুত ভাবও দেখলাম তাতে। কেননা আমাকে খানিক আগে চাপা গলায় ধমকে ছিলেন আমার অসহিষ্ণুতা দেখে যে, কি করে পারি এমন একটা মেশিনের দক্ষতা সচক্ষে না দেখে জাহাজে ফিরতে!

সবার কাছে বিদায় নিয়ে মোটর বোটে উঠলাম। মনি ও বিমলের জন্য মনটা একটু কেঁদে উঠলো। ওরাই এ কয়দিনে আমার বড় কাছে এসে পড়েছিল। খোলা পথের দুধারে কত না মায়া ছড়ানো।

খণ্ড মেঘগুলি যেন ভারী হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের বুকে মেঘের ভাষা বোঝা দায়। দ্বীপে দলের প্রায় সব জিনিসই বাইরে পড়ে আছে। বৃষ্টি যেন না হয় দুদিন।

মেঘের মাঝে আধো খোলা আধো ঢাকা অষ্টমীর চাঁদ। কালো দ্বীপ, কালো বনানী, কালো আকাশ, কালো জল। পথ অন্ধকার। ধীরে ঈষৎ দুলে বোট

চলেছে। মনের গভীরে মন আকাশব্যাপী সাড়া তুলে বলে উঠলো—'তুমি আছো, আমি আছি'।

....

চাওড়া

....

নির্জন ডেকে বসে আছি, ভাবছি। নজর পশ্চিম প্রান্তে বড় তারাটার দিকে। তারাটা ছুটে একবার করে নীচে নামছে আর একবার করে উপরে উঠছে। মনে হল অনেকক্ষণ হতেই দেখছি তার নামা-ওঠা। দেখলাম জাহাজটা দুলছে। জাহাজ চলতে সুরু করে দিয়েছে।

'চাওড়া'য় নামা হবে কিনা কি জানি। জলের সমস্যা। 'যমুনা' জল দিতে পারবে না। তারই নাকি জল কম। 'জামিলা'কে খবর পাঠানো হল, সে আছে নিকোবরে। সে যদি কিছু জল দিতে পারে 'জারোয়া'কে তবেই চাওড়ায় যাওয়া সম্ভব হবে। ক্যাপ্টেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ডেকের এ-মাথা ও-মাথা ছুটোছুটি করছে।

জামিলাও জল দিতে পারবে না খবর এলো।

দূরে থেকে ধোঁয়ার মতো 'টেরেসা' 'বোমপোকা' 'চাওড়া' দ্বীপগুলি ছাড়িয়ে চললাম। সাগরের বুকে তরঙ্গ কয়টি যেন মিলিয়ে গেল।

চাওড়ার জন্য মনে বড় আগ্রহ ছিল। মন্ত্রেতন্ত্রে তুকতাকে প্রেতপুজোয় এ দ্বীপের খ্যাতি প্রসিদ্ধ। সকল দ্বীপ ভয় করে চাওড়াকে। প্রতি বছর ভীড় জমে এখানে. পুজো দিতে আসে অন্যান্য দ্বীপের লোকেরা। গৃহের মঙ্গল চায়, প্রিয়জনের মঙ্গল চায়, গ্রামের মঙ্গল, ভূমির মঙ্গল—সবকিছুরই মঙ্গল চায় মানুষ। চাওড়া দ্বীপে পুজো দিলে অপদেবতা খুশী থাকে সবচেয়ে। জলের ধার ঘেঁষে এ দ্বীপে স্পিরিটের পুজো শুরু হয়, গ্রামের ভিতরে সর্বত্র তার আয়োজন।

এই দ্বীপের মানুষকে ভয় পায় না, এমন কেউ নেই। এহেন দ্বীপ দেখে গেলাম না?

চাওড়ার লোক চিরকাল ভয় দেখিয়ে রেখেছে সবাইকে,—যে, চাওড়ার তৈরী কেনো ছাড়া অন্য কেনো সাগরে ভাসালে সাগরে কেনো ফাটবে। চাওড়ার তৈরী মাটির হাঁড়ি না নিলে অমঙ্গল জানবে। ছোট বড় চাড়ির মতো মুখখোলা যেসব হাঁড়িতে দ্বীপবাসীরা রান্না করে, সব হাঁড়ি আসে এই চাওড়া দ্বীপ থেকে। দু'তিন দিনের পথ,—চল্লিশ মাইল ষাট মাইল সাগরে কেনো ভাসিয়ে বিভিন্ন দ্বীপ থেকে লোক আসে চাওড়া হতে হাঁড়ি নিতে। হাঁড়ির ব্যবসা চাওড়া দ্বীপের একচেটিয়া।

কৌশলকুমার বলে, এদের দ্বীপের মাটি হাঁড়ির জন্য খুব ভালো। তাও নাকি এদের নিজের দ্বীপের মাটি শেষ হয়ে এসেছে। এগারো মাইল দূর থেকে অন্য এক অখ্যাত দ্বীপ থেকে চাওড়ার লোক মাটি নিয়ে আসে কেনো

ভয়ে। মেয়েরা সেই মাটিতে হাঁড়ি গড়ে। হাঁড়ি গড়ার কাজে ছেলেরা হাত দেয় না। মেয়েরাই শুধু এই কাজের অধিকারী। চাওড়ার হাঁড়ি মজবুত। দিবারাত্রি জল ফোটে তাতে। চাওড়ার হাঁড়ি পবিত্র। নবজাত শিশুর প্রথম স্নান হয় চাওড়ার নতুন হাঁড়িতে। চাওড়ার হাঁড়ি শুভ। বিবাহে উৎসবে চাওড়ার হাঁড়িতে রান্না হয় ভোজের রান্না।

ছোট্ট দ্বীপ চাওড়া। দ্বীপময় হাঁড়ি গড়ছে, শুকোচ্ছে, পোড়াচ্ছে—কল্পনায় চোখে ছবি হয়ে আছে। সব দ্বীপেই দেখলাম আয়াসে আবেশে চলছে সবাই, এখানে হয়তো কিছু অন্য রকম দেখতাম। না-দেখা জিনিসের জন্যই মন টানে বেশী।

চাওড়ার লোক ভয় দেখায়, চাওড়ার লোক আকর্ষণ করে। চাওড়াকে বাদ দিয়ে চলে না কোনো দ্বীপের। কার-নিকোবর হতে অনেক সময়ে লোকেরা চাওড়া ডিঙিয়ে অন্য দ্বীপে গিয়ে কেনো নিয়ে আসে কখনো কখনো, কিন্তু আসবার পথে চাওড়াতে থেমে কিছু পয়সা দিয়ে তবে আসে। এটা চাওড়ার প্রাপ্য কমিশন।

চাওড়া দ্বীপে জলের অভাব। প্রতি বছরই এমন ঘটে—প্রতিবেশী দ্বীপ হতে কেনোতে করে জল আনতে হয় তাদের। জোড়া জোড়া নারকেল-ঘটি ভরে জল আনে।

আপন আপন দ্বীপকে সবাই ভালোবাসে, চাওড়াবাসীও ভালোবাসে তাদের নিজের দ্বীপকে। তবু উপার্জন উপলক্ষে তারা অন্য দ্বীপেও আসে। কার-নিকোবর কাচাল নানকৌরির লোকেরা আয়েসী। ক্ষেতে বনে মজুর খাটতে চাওড়ার লোকেরাই আসে। আসে বটে, কিন্তু দু'মাসের বেশী থাকে না। চাওড়া ছাড়বার সময়ে একটা কাঠি সঙ্গে আনে। প্রতিদিন দিনশেষে সেই কাঠিতে একটা করে দাগ দেয়। যেই দু-চাঁদ শেষ হয়ে যায় অমনি সে চাওড়ামুখী রওনা দেয়। কিছুতে তখন তাকে আটকানো যায় না।

চাওড়ার লোক ভূত-প্রেত বশে রাখে বলে জানে সবাই। জানে, কারো উপর রাগ হলে দূরে থেকেও ভূত দ্বারা অনিষ্ট করতে পারে তার। এই বিশ্বাসের বহু গল্প চাওড়া নিয়ে দ্বীপে দ্বীপে। কৌশলকুমার বলে, এও এক চলতি গল্প এখানে, চাওড়া নিয়ে। মাঝে মাঝে চাওড়ারা আসে কার-নিকোবরে লোহার যন্ত্রপাতি কিনতে। জিনিসের বদলে জিনিস কেনে এরা, পয়সা দিয়ে কেনার রেওয়াজ নেই। যার যেটা নেই তাই আদান-প্রদান করে।

একবার এক চাওড়ার লোক এসেছে কার-নিকোবরে ছুরি কিনতে। কার-নিকোবরীর মনে কি মজা জাগল, একটা কাঠের ছুরিতে রং লাগিয়ে লোহার ছুরি বলে চালিয়ে দিল। সরল বিশ্বাসে চাওড়াবাসী সেই ছুরি নিয়ে চলে গেল। অল্প সময়েই বুঝতে পারে সে আসল ব্যাপারটা। চাওড়ার লোক রেগে উঠল। বিষ মিশিয়ে প্যাণ্ডেনাসের পিঠে কেনোয় ভরে মন্ত্রবলে কার-নিকোবরের যে গ্রাম হতে ছুরি কিনেছিল সেই গ্রামমুখী কেনো ভাসিয়ে দিল। মন্ত্রঃপূত কেনো ভাসতে ভাসতে সেই গ্রামে ঠেকল। কৌতূহলী গ্রামবাসী ভেঙে পড়ল কেনো ঘিরে। সবাই খেল প্যাণ্ডেনাসের পিঠে। সব গ্রামের লোক মরে পড়ে রইল কেনো ঘিরে। কেবল একটিমাত্র শিশু—সে ঘুমিয়ে ছিল ঘরে, সে-ই শুধু রইলো বেঁচে। জেগে উঠে কাউকে না দেখে কান্না জুড়ে দিল। পাশের গ্রামের লোকেরা কান্না শুনে এসে দেখে এই ব্যাপার।

এই কাহিনী নিয়ে এখনো এরা গান গায়। গানের সার কথা হল, কাউকে ঠকিয়ো না।

আন্দামান। কয়দিন সাগরে দ্বীপে ঘুরে আবার ফিরে আসি আন্দামানে—পোর্টব্লেয়ারে।

আন্দামান মানেই দ্বীপান্তর—কয়েদীদের জেলখানা। শিশুকাল হতে শুনে আসছি—'আন্দামানে দ্বীপান্তর দিল'। মানে, এত বড় শাস্তি আর নেই। আপন জন, আপন দেশ সবকিছুরই সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক শেষ। এই আন্দামান দ্বীপের কথা ভেবে কত শিউরে উঠেছি, কত আতঙ্ক বুকে পোষণ করেছি। সেই আন্দামানের ভিতরেও আবার জেলখানা।

জেল দেখছি ঘুরে ঘুরে। বিরাট জেল। জেলখানা যেন প্রকাণ্ড একটা 'ষ্টারফিস' সমুদ্রের—সাতদিকে সাত হাত বের করা। দোতলা। পাথর গাঁথা সিঁড়ি। কতদিনের কত পদাঘাতে সে পাথরের বুক ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে। ভারতের কত সুসন্তানকে এই সিঁড়ি দিয়েই দোতলায় নিয়ে গেছে।

মনে পড়ল,—দেবমন্দিরের প্রবেশের আগে দোরের ধুলো মাথায় নিতে হয়। সিঁড়ি স্পর্শ করে মাথায় ছুঁলাম।

দোতলায় লম্বা বারান্দা—লম্বা লোহার শিক গাঁথা। বারান্দার একধার ধরে ছোট্ট ছোট্ট একসারি কুঠরি,—অর্থাৎ 'সেল'। ঘরের দেয়ালে উঁচুতে একছিদ্র জানালা—পটের মতো একটুকুন আকাশ ধরা। ঘরের সামনে মোটা গরাদের দরজা। এক একজন করে সেলের মধ্যে কয়েদী পুরে লোহার দরজায় মস্ত এক তালা লাগিয়ে শিক ঘেরা এই লম্বা বারান্দায় সর্বক্ষণ পাহাড়া দিত বন্দুক-ধারী সৈনিক প্রহরীরা।

এরই এক একটি ঘরে থাকতেন বীর সাভারকর, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত। উপেন্দ্র ব্যানার্জি, আশুতোষ লাহিড়ী, ভাইপরমানন্দ—আরো সব দেশ-মাতার বীর সন্তানরা।

এই রকম সাতটা লম্বা দোতলা ব্যারাক। মাঝখানে গোল সরু সুউচ্চ একটি 'ওয়াচ টাওয়ার'কে ছুঁয়ে আছে এই সাতটা ব্যারাক, সাতদিক হতে। যেন লম্বা লম্বা সাতটা আঙুলওয়ালা বিরাট থাবা একখানা। এরই নাম 'সেলুলার জেলখনা'। এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে পুরো জেলখানাটা পরিষ্কার দেখা যায়। কোনো কয়েদীর একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই।

পাথরের সিঁড়ি ক্ষয়ে গেছে। 'সেল'গুলির মেঝেতে খোয়া উঠে গেছে। ব্যারাকের লম্বা বারান্দায় ফাটল ধরেছে, সেই ফাটলে বট পাকুর শিকড় ছড়াচ্ছে। যাঁরা ছিলেন একদিন এই লোহার গরাদে বন্দী, তাঁদের স্মৃতিতে আজ এই ভাঙা জেলখানা বাঁচিয়ে রাখতে কত চেষ্টা চলছে। যে সেলে সাভারকর থাকতেন সেই সেলে তাঁর একটি ফটো রাখা হয়েছে। অন্যদের ফটোও রাখা হবে সেই সেই সেলে। চিহ্ন থাকবে তাঁদের।

কী এক কৌশল করেই তৈরী করা হয়েছিল এই জেলখানা,—সমুদ্রের ধারে জেলখানা, প্রতিটি ব্যারাক সমুদ্রের দিক হতে মুখটা তেরছা করে যেন ঘুরিয়ে আছে। সমুদ্রের গর্জন শোন, হুঙ্কার শোন, কিন্তু তাকে দেখতে পাবে না কোনো ফাঁক দিয়ে। সেলে বসে লোহার শিকের ভিতর দিয়ে দূরের ঢেউ একটু

দেখবে তার উপায় নেই। একটু জলের রেখা—সময় কত হরণ করে। মনকেও করে।

সেলুলার জেলের প্রাঙ্গণে কয়েদীদের কাজের ঘরে সেই আমলের লোহার ঘানি; বলদের বদলে এ ঘানি ঘোরাতে হত দেশের বন্দী বীরদের। সারাদিন ঘানি ঘুরিয়েও অর্ধেক সর্ষে পেষা হত না—এত সর্ষে প্রতিদিন বের করে দিত তেল বের করবার জন্য। দিনের শেষে নতুন করে অত্যাচার করবার অজুহাত মিলত জেল কর্তৃপক্ষের।

সেইসব দিন যেন এখনো এখানে কথা কয়।

প্রাঙ্গণের পাশে ফাঁসি ঘর, তাও দেখলাম। ছোট চালওয়ালা ঘর। মেঝের মাঝখানে কাঠের পাটাতন পর পর তিন ভাগে। তিন কয়েদীকে একসঙ্গে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা। রেললাইন বদলাবার সময়ে 'লাইনস্‌ম্যান' যেমন একটা লোহার হাতল ধরে টানে, তেমনি একপাশে একটা লোহার হাতল। সেটা ধরে টানলেই একসঙ্গে তিন ফাঁসীর কয়েদীর পায়ের তলার পাটাতন তিনটে সরে যায়। উপরে কড়ি-বরগার হুক থেকে ঝোলানো দড়িতে গলায় ফাঁস আটকানো কয়েদীরা ঝুপ ঝুপ নীচে ঝুলে পড়ে। নীচে 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' ঘর, মাটি হতে নামার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকে মৃতদেহ তুলে আনে। সিঁড়ির পাশে লোহার ফটক—নামই এর 'কালো দরজা', সেই কালো দরজা দিয়ে লাস বের করে দেয় বাইরে। সে জায়গাটাও চেয়ে দেখলাম।

সেলুলার জেলখানার সাত আঙুলের তিনটে আঙুল ভেঙে দিয়েছে জাপানীরা। সেখানে এখন হাসপাতাল। অনেক বেড, অনেক রোগী—নারী-পুরুষে ভরা।

জাপানীরা যে তিন বছর টিকে ছিল এখানে, সেই তিন বছরে বহু আন্দামানবাসীকে প্রাণ দিতে হয়েছে তাদের হাতে। এই কাজের জন্য তারা বন্দুকের গুলি খরচ করেনি অনর্থক। তলোয়ারেই কাজ সেরেছে। সরকারী কর্মী অতুলবাবু, তাঁর দেহচ্যুত মাথা এইভাবেই আন্দামানের মাটি ছুঁয়েছে। এ দ্বীপের তিনি অতি প্রিয়জন ছিলেন। তাঁকে ঘিরে বাঙালীরা এক ছিল। আজ তাঁর নামে 'অতুল স্মৃতি ক্লাব' করে বাঙালীরা একত্রিত হয়।

টিলার উপরে উজ্জ্বল হলুদ ফুলেভরা রাধাচূড়ার বৃক্ষ কতকগুলি। এই ফুলকে মান দিইনি কখনো তেমন। এখানে নীলসাগর নীল আকাশ—নীল রঙের এতখানি সুবিস্তৃত পট. এই পটের গায়ে দুপুরের আলোতে হলুদ ফুলে ফুলে যেন জমাটবাঁধা বিদ্যুৎ ঠিকরে উঠল।

নেভির একটা জাহাজ এসে লেগেছে বন্দরে, 'তীর' নাম। নীল-ধূসর রঙ জাহাজের, সাগরের জলের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে থাকে। দূর থেকে দেখা যায় না একে। এক সকালে বন্দর হতে কিছুটা তফাতে 'তীর'কে ঘোরাঘুরি করতে সকলের আগে দেখেছিলেন শ্রীমতী কক্, দ্বীপের কমিশনের স্ত্রী। তাঁর উঁচু টিলার বাংলোর বারান্দায় বসে বহুদূর অবধি দেখা যায় সমুদ্র। সমুদ্রের দিকেই চেয়ে থাকেন তিনি সারাক্ষণ। এই সমুদ্রই হরণ করেছে তাঁর বুকের দুই রত্নহার।

ফুটফুটে দুটি তরুণী মেয়ে পিতার সঙ্গে স্নানে নেমেছিল সাগরের জলে। সঙ্গে ছিলেন পোর্টকমিশনার আর একটি বর্মী যুবক। হাঁটু জল, স্থির ঢেউ, হঠাৎ কোন তলা হতে স্রোতের টান এসে তলিয়ে নিল কন্যা দুটিকে। বাঁচাতে

গিয়ে বর্মী যুবকও তলিয়ে গেল। পোর্টকমিশনার নাম-করা সাঁতারু,—সাগরের সঙ্গে লড়াই করে যখন পারে আনলেন মেয়ে দুটিকে—তখন তাদের প্রাণের স্পন্দন থেমে গেছে। পোর্টকমিশনার নিজেও সকল শক্তি হারিয়ে বালির উপরে শুয়ে পড়লেন, হার্টফেল করলেন। বর্মী যুবকটিকে পাওয়া গিয়েছিল পরে, ততক্ষণে হাঙরে মাছে মাথা পা খেয়ে ফেলেছিল ঠুকরে ঠুকরে। বিধবা মাকে এসে সনাক্ত করতে হল—হ্যাঁ, এ-ই আমার সেই একমাত্র ছেলে।

চারদিকেই সমুদ্র। শ্রীমতী কক্ বলেন, এখনো আমাকে এই সমুদ্র অহরহ দেখতে হচ্ছে চোখের সামনে। এর চেয়ে মারাত্মক যন্ত্রণা আর কি হতে পারে। কমিশনার সাহেব বদলির দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। দু'চার দিনের মধ্যেই তাঁর 'সাকসেসর' এসে পড়বেন।

কমিশনারের অনুমতি নিয়ে 'তীর' লেগেছে বন্দরে। ক্যাপটেন নিমন্ত্রণ করে গেছেন আজ সন্ধ্যেবেলা 'তীর'-এ কক্‌টেল পার্টিতে।

জাহাজ ভরা কামান গোলা। কোনোটা উপরে ছুঁড়বার—বিমান ধ্বংস করবার, কোনোটা জলের তলায় সাবমেরিন ভাঙার। শুধুই কামান আর কামান। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে—সম্মুখসমরে লড়বার সব ব্যবস্থা। শিক্ষার্থী ছেলেদের নিয়ে সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে শিক্ষা দিচ্ছেন শিক্ষকরা। কোচিনের শিক্ষা শেষ করে এখন প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং-এ সাগরে ভাসছে। এর পরেই ছাত্ররা 'অফিসর' পদ পেয়ে যাবে। ছেলেমানুষ ছেলেরা—সবে সব কাঁচ বয়সের যুবক।

'তীর' তীরে ঠেকেছে অবশ্য, তবে নামবার অনুমতি পায়নি এখনো কেউ। মাটিতে পা ফেলবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। আগামীকাল অনুমতি পাবে। আজ ছুটি, সন্ধ্যায় নিজেদের জাহাজের খোলা ডেকটা ক্যানভাস দিয়ে ঢেকেছে, লাল কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়েছে, সারি সারি বাতি জ্বালিয়েছে; জাহাজ সাজিয়েছে।

কক্‌টেল পার্টি; কালো প্যাণ্ট সাদা সার্ট কালো টাই পরে সেজেছে সবাই। আমন্ত্রিত এই কয়টি মুখ দেখেই কত খুশী ছেলেরা, কত গল্প তাদের।

আছি এখন কয়দিন এখানে, ধীরেসুস্থে দেখছি সব। 'ফিনিক্স বে'তে সমুদ্রের উপর এগিয়ে আসা টিলার উপরে সার্কিট হাউস। এক বছর হল তৈরী হয়েছে বাড়ী, এখনো নতুন নতুন গন্ধ। সামনে উন্মুক্ত সাগর, উদার আকাশ, অবারিত হাওয়া। ঘরের সামনে রেলিং ঘেরা বারান্দা, বসে আছি বারান্দায়। চিল শাংচিল ভাসছে আকাশে, পড়ন্ত আলো লেগেছে তাদের বুকে পাখায়। হাওয়ায় ভর দিয়ে মেলে দিয়েছে ডানা দুটি—যেন হাওয়ার ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তাদের। গতি আছে, ক্লেশ নেই এই চলায়।

সার্কিট হাউসের ডানদিকে মেরিন বন্দর, পুলিশ লঞ্চ ফেরি লঞ্চের বন্দর। এরা থামে এখানে এসে, ছাড়েও এখান থেকে। ভেঙে গেলে, ফেটে গেলে এটাই তাদের হাসপাতাল। এখানেই সব মেরামত হয়।

বাঁদিকে চাথাম বন্দর,—ছোট্ট একটুখানি দ্বীপ। জলের উপরে সাজানো খেলাঘর যেন। অতি শান্ত, অতি নিরীহ। দূর থেকে দেখে কে বলবে এরই বুকে চলেছে বিরাট এক কারখানা, এশিয়ার সবচেয়ে বড় 'স' মিল। আজই সকালে গিয়েছিলাম দেখতে।

বন হতে কাটা বৃক্ষ বিটপী জাহাজ বোঝাই হয়ে এসে জমা হয় ঘাটে। বনস্পতির বিশাল সেই দেহ জল হতে উঠে আসে কলের গাড়ী চেপে সোজা

কারখানায়। পলক দাঁড়ায় না কোথাও। এ-যন্ত্র ও-যন্ত্রের ভিতর দিয়ে গিয়ে শতাব্দীর বনস্পতি কয়েক মুহূর্তে ফালা ফালা হয়ে, সরু তক্তার রূপে নিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। তখনো মুক্তি নেই। বন্ধ ঘরে সেগুলিকে বন্দী করে গরম হাওয়ার চাপ দিয়ে গায়ের সমস্ত রস বাষ্প করে টেনে বের করে নিয়ে তবে ছাড়ে। এবারে আর জলে গরমে কোথাও ভয় নেই তাদের নিয়ে। পুরোপুরি 'সিজন্‌ড্‌' তারা। চোখের নিমেষে হয়ে যাচ্ছে সব। দানবীয় ব্যাপার।

'মার্বেল উড' এখানকার বিখ্যাত কাঠ। শক্ত কাঠ। বেশী পাওয়া যায় না বনে। কালো খয়েরীতে দাগটানা কাঠের রং। 'পেডোক' কাঠেরই চল বেশী।

বিড়লা, খৈতান, সাহুজীদেরও নিজ নিজ কাঠের কারখানা আছে আন্দামানে।

'সাগর দুলাল' মোটর বোটে চড়ে 'হ্যাডো' বন্দর ছাড়ি। পথে পড়ে 'হ্যারিয়েট পয়েন্ট',—আন্দামানের সবচেয়ে উঁচু টিলা। এই টিলায় উঠে লর্ড মেয়ো একদিন সূর্যাস্ত দেখে নেমে আসছিলেন, 'হোপ পয়েন্টে' এক আফগান কয়েদী আচমকা তাঁকে খুন করে। কি জানি কি রাগ ছিল তার সাহেবের উপরে। তখনকার দিনে দ্বীপান্তরের বহু আসামীকে দ্বীপেই ছেড়ে দেওয়া হত কয়েক বছর বাদে। তারা বন জঙ্গল কেটে চাষ-আবাদ করে স্বাধীনভাবে বসবাস করত। এই কয়েদীও ছাড়া ছিল সেইভাবে।

উত্তরপ্রদেশের 'ভান্টু' জাত। খুন-জখমে ছিল পোক্ত। তাদের আনা হত কালাপানি পার করিয়ে আন্দামানে। কয়েক বছর পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হত। বহু 'ভান্টু' ঘর বেঁধেছিল এখানে, আন্দামানের আদিবাসী বিয়ে করে সংসার পেতেছিল। এই রকম সব কয়েদীদের বংশধররাই 'লোক্যালবর্‌ন্‌' বলে পরিচিত এখন। সবচেয়ে ভালো নাগরিক এরা।

চাথামের ঠিক উল্টো দিকে 'ব্যাম্বোফ্ল্যাট' দ্বীপে খৈতানদের কারখানা—প্লাইউডের। এখানে ফালা ফালা নয়, পরতে পরতে গাছের গা চেঁছে নেয়। যন্ত্রের ভিতরে হাত-পা কাটা কবন্ধ বনস্পতি শুয়ে শুয়ে ঘুরছে, আর তার গা হতে থান কাপড়ের মতো পাতলা কাঠের কাপড় বেরিয়েই আসছে কেবল—দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের মতো।

এই পাতলা কাঠের থান আঠায় ভিজিয়ে আড়ে সোজায় চেপে চেপে মোটা করে যন্ত্রের সাহায্যেই প্লাইউডের বড় বড় বোর্ড তৈরী হয়ে যাচ্ছে। আজকাল সর্বত্র এই বোর্ড দিয়েই আধুনিক আসবাবপত্র হয়।

যন্ত্র চলছে, গাছ ঘুরছে, গায়ের ছাল চেঁছে চলছে;—চেয়ে দেখতে দেখতে আমার নিজের ডান হাতটা টাটিয়ে উঠলো। মনে হল 'গর্জন' গাছের কাণ্ড নয়, আমারই হাতটা যেন ঘুরছে যন্ত্রের ভিতরে।

শুনেছি 'রাইটমাইও'তে হাতী দিয়ে কাজ করায়, কাটা বৃক্ষ স্থানান্তরিত করে। হাতীকে এরা মজুরের মতো কাজে লাগায়।

সরু খাল ঘুরে গেছে, সেই বাঁকে খানিকটা জমি. খাল দিয়ে এসে জমা হয় এখানে খণ্ডে খণ্ডে কাটা বনস্পতির স্তূপ। হাতীর উপরে মাহুত বসে হাঁটু দিয়ে, গোড়ালি দিয়ে অনবরত গুঁতো মারছে হাতীর কানে পিঠে। গুঁতোই ভাষা, সেই ভাষায় হাতী কাজ করে চলেছে। উপরি ভাষা—মুখের ভাষা,—মাহুত বলছে 'উঁদি, উঁদি'—অর্থাৎ ঠেলো ঠেলো। হাতী শুঁড় দিয়ে গাছের কাণ্ড ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল। মাহুত বলে, 'ঘুম', হাতী পিছনে ঘুরলো, একটা গুঁড়ি শুঁড়ে তুলে নিল। রাখবে কোথায়? মাহুত বললো—'আগি,

আগি'। হাতী তড়বড় করে এগিয়ে যায়, মাহুত হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারে, হাতী বোঝে কতখানি এগিয়ে কি ভাবে কোথায় রাখতে হবে গুঁড়িটা।

দ্রুতগতিতে কাজ করে চলেছে হাতী, কয়েক মিনিটের মধ্যে এপাশ ওপাশ থেকে একরাশি সমান মাপে কাটা বৃক্ষখণ্ড শুঁড়ে তুলে দাঁতে ধরে শূন্যে উঁচিয়ে মাটিতে গড়িয়ে এনে ফেললো সামনের সরু রেললাইনে রাখা পর পর ট্রলির উপরে। থাকে থাকে সাজালো খণ্ডগুলি তাতে। কোনোটা একটু বেরিয়ে আছে তো মাহুতের নির্দেশে ঘুরে গিয়ে শুঁড় দিয়ে ঠেলে সমান করে দিল। দিয়ে এবারে পিছু হটে লাইনের পিছন দিকে ওমাথায় গিয়ে ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে দূরে নিয়ে রাখলো। পর পর কাঠ বোঝাই ট্রলিগুলি এইভাবে জমা হলে পরে ইঞ্জিন টেনে নিয়ে যাবে সবকয়টাকে একসঙ্গে। এই পর্যন্ত হাতীর কাজ।

চটপটে কাজের মেয়ে দেখলে দিদিমা বলতেন, 'চলে ফিরে যেন বাঁশপাতা-খানি।' এই হাতীদের কাজ দেখলেও দিদিমাকে বলতে হত সেই কথা-ই।

পাপিতা গাছ দেশলাই বানাবার জন্য প্রয়োজন। বনস্পতি এও, আশি বছরের বৃক্ষ এক একটি। এই গাছই বন হতে কেটে জলে ভাসিয়ে এখানে আনে, এখান হতে হাতীকে দিয়ে টেনে তোলায়, ট্রলিতে ওঠায়। তবে খুব বেশীক্ষণ করায় না একাজ হাতীকে দিয়ে। করাতে নেই। সময় নির্দিষ্ট।

চারদিকে 'গর্জন' বন। বনের ভিতরে টিলার উপরে 'ফরেস্ট বাংলো'। বাংলোতে এসে বসি। মনে হল যেন বড় ক্লান্ত।

গাছে ঢাকা বাড়ী, ঝিরঝিরে হাওয়া, চারদিকে চোখ মেলে যেন আরাম খুঁজতে থাকি, নানা রঙের পাতাবাহারের গাছ বারান্দা ঘিরে, পাশে কলাগাছে লম্বা লম্বা পুষ্ট কলার কাঁদি, নীল অপরাজিতার লতা, আর ঐ যে আমার ঝুমকোজবা। এ জবা এক পলকে নিয়ে যায় আমাকে দেশের বাড়ীর মণ্ডপের পিছনে। ঝুমকোজবা যেন আমার হারানো অঙ্গভূষণ, ফিরে পেয়ে আনন্দে উছলে উঠি। পাখী এক ডেকে উঠলো, স্পষ্ট ডাক,—'বৌ কথা কও' 'বৌ কথা কও'। এত কাছে, অথচ আড়াল হতে বলছে 'বৌ কথা কও'। এ এক কৌতুক। সময় নেই অসময় নেই, কারো মনের দিকে তাকানো নেই,—দুম করে ব'লে বসে—'বৌ কথা কও'।

আন্দামানে অনেক কেরেলাবাসী। বেশীর ভাগ এরা এসেছিল নারকেল ছোবড়ার সরকারী কারখানায় কাজ নিয়ে। কারখানা চললো না। কেরেলা-বাসীরা আর ফিরে গেল না। এখানেই জমি নিয়ে গ্রাম গড়ল। তাঁতে লুঙ্গি বানিয়ে, হাতে দড়ি পাকিয়ে সংসারে শ্রী তুললো। নিজের হাতে গড়া ঘর রঙ বুলিয়ে সাজানো। এদের ছোট ছোট রঙীন বাড়ীগুলি সবুজ বনের ভিতরে ভিতরে যেন রঙীন রিবনে বাঁধা ফ্রক-পরা বালিকার দল ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে।

চৌখুপী লুঙ্গি বুনছিল চার তাঁতে চারজন কেরেলার তাঁতী। তারা খুসী,—নিজেদের নিয়ে খুসী। একপাশে একফালি দোকানঘর—বোনা লুঙ্গি বিক্রি করে দোকানে, আর পান। কুঁকড়ে যাওয়া ক্ষুদে ক্ষুদে পান—বনে হয়। এরা বলে জংলী পান। পান-বিলাসীরা এ-পান খায় না। আন্দামানবাসীরা খায়। কাঁচা সুপারী, ঝিনুকপোড়া চুন দিয়ে পান খায়। খয়ের খায় না।

'চাউলধারী' গ্রামে পূর্ববঙ্গের প্রথম উদ্বাস্তুদল এসে সংসার পেতেছিল। তারা ছিল একশটি পরিবার। এতদিনে পাকাপোক্ত ঘরসংসার এখানে তাদের।

সতেরো বছরের জানা এই মাটিই এখন তাদের আপন মাটি হয়ে গেছে।

গলায় কণ্ঠী নিশিকান্ত হালদার, গাছকোমরবাঁধা ধুতি পরনে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নতুন গৃহের ভিত গাঁথাচ্ছিলেন, তারই আঙিনায় উঠলাম আগে। পনেরো বিঘা করে জমি সরকার হতে দেওয়া হয়েছিল সবাইকে। সেই জমি এই কয় বছরে বাড়িয়ে ছত্রিশ বিঘা করেছেন হালদারমশায়। তিন বছর আগে পনেরো বিঘা জমি কিনেছেন, এ বছরে আরো ছয় বিঘা কিনলেন। ছোট ছোট সন্তান—যাদের নিয়ে এসেছিলেন, তারা বড় হয়েছে, বিয়ে করেছে, সন্তানাদিও হচ্ছে। আগের মাটির ঘরে কুলোয় না আর সবাইকে নিয়ে, তাই নতুন ঘর তুলছেন এ বছরে। গরু মোষ পুকুর ক্ষেত নিয়ে মস্ত সংসার। স্ত্রী বিশল্যকরণী প্রৌঢ়া মহিলা, মাথায় কপাল অবধি ঘোমটা,—পানের বাটা সাদা পাতা সামনে ধরে দিলেন। বললেন, এসেছিলাম, কষ্ট পেয়েছি অনেক। খেটেছি,—ভগবান দয়াও করেছেন। হাসিমুখে বিশল্যকরণী দেবী ছোট মেয়েটার ঝাঁকড়া চুলে আঙুল দিয়ে বিলি দিতে লাগলেন, বললেন, এই মেয়েটা এখানে আসার পর হয়েছে।

পথের দু'ধারে বনের কোলে খোলা জমি—সবুজ শস্যে ভরা। বন কেটে জমি দিয়েছে উদ্বাস্তুদের। অনেকখানি খোলা আকাশ হালকা হাওয়ায় ভরা। শীতল বাতাস লাগল এসে গায়ে। দেখি ঘন মেঘ এগিয়ে আসছে। দূরে বৃষ্টি নেমেছে, ঝাপসা হয়ে আছে বনের মাথা।

'লং আয়রল্যাণ্ডে' যেতে সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগে জলপথে।

মেরিন জেটি হতে পুলিশ লঞ্চে উঠি। এক কেবিনের ছোট্ট লঞ্চ। সামনে খোলা ডেক, ডেকে চেয়ার পেতে বসেছি সবাই। ছোট বড় নানা দ্বীপ পারের কাছে কাছে। এসব দ্বীপে লোক কেউ থাকে না। বন্য জন্তুও নেই। আছে কেবল গাছ—পাহাড় ঢেকে মাথা তুলে।

লং দ্বীপে দ্বীপবাসীরা কেউ নেই। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের যত লঞ্চ তৈরী হয় এখানে। বিড়লাদের প্লাইউডের কারখানাও এই দ্বীপে। এই দুই কারখানার লোকজন আর প্রচুর গাছভরা বন নিয়ে 'লং দ্বীপ'।

সন্ধ্যে হয়ে গেল দ্বীপে এসে নামতে। আজ রাত্রে এখানে থেকে কাল ভোরে উঠেই চলে যেতে হবে এগিয়ে। রাত্রেই দেখতে হয় দ্বীপে যা যা দেখার।

বিজলীর আলোয় প্লাইউডের কারখানা দেখলাম। এ-পথ সে-পথ ঘুরলাম। কারখানার অফিসঘরের সামনে কাঁকর বিছানো পথের মতো ভাঙা কোরাল বিছানো পথ। দু'ধারে সখ করে লাগানো গাছে সাদা গোলাপী নয়নতারা যেন আহ্লাদে ডগমগ হয়ে ফুটে আছে। নয়নতারা অভিমান কাকে বলে জানে না। তার মান-অপমান বোধ নেই। বনেবাদাড়ে বালিতে কাঁকরে পাথরের ফাটলে যেখানে একটু জায়গা পায়—জায়গা করে নিয়ে আপনমনে হাসতে থাকে। আর, একটু আদর করলে যেন খুশীতে গলে পড়ে।

সমুদ্রের তীরেই রেস্ট হাউস, কিন্তু তীর উঁচু টিলার উপরে। হেঁটেই উঠতে হল। তিনদিক হতে ঘন বনে ঘেরা বাড়ী, সন্ধ্যে রাতেই গভীর রাত টেনে আনে। কর্মক্লান্ত দ্বীপ সন্ধ্যে হতেই ঘুমিয়ে পড়ে।

তবু, সন্ধ্যে সন্ধ্যেই। এতখানি রাত বিছানায় কাটে কি করে? রাতের আর খানিকটা যে করে হোক কাটাতে হয়। শোনা গেল আজকের ডাকে একটা 'ফিল্ম' এসেছে এখানে। মাঝে মাঝে আসে এই রকম। লোকেরা দেখে।

শোনা গেল পার্সেলটা ডাকঘরেই আছে এখনো।

আন্দামানের কমিশনারের সহকর্মী আমাদের সঙ্গী। তিনি পোস্টমাস্টারকে বলে পোস্টঅফিস খুলিয়ে ফিল্মের পার্সেলটা বের করিয়ে আনালেন। রেস্ট-হাউসের ছোট্ট লনটুকুতে স্ক্রিন খাটানো হল। ঘর হতে সোফাসেটি বের করা হল। ব্যাটারির তার টেনে আনা হল। ফিলম্ শুরু হল।

সমুদ্রের তীর, চাঁদনী রাত, বনের ধার, ঝিল্লিস্বর; বাইরে বাগানে বসে চেয়ে রইলাম স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রাত বারোটা অবধি। পায়ের তলার ঘাস ভিজলো, মাথার উপরের চুল ভিজলো, ভিজলো কৌচের হাতল দুটো—যার উপরে হাত রেখেছি এতক্ষণ। কিন্তু কি ছবি দেখলাম জানি না।

যেন দোয়াতের কালিগোলা জল, এমনি রঙ সমুদ্রের আজ। ভোরের আকাশে তো এ রঙ আসে না। এ যেন অতলের রঙ উপরে ঠেলে উঠতে চাইছে। ডানদিকে ঘন নীল রঙ, বাঁয়ে ঘন গভীর বন, মাঝখানের পথ দিয়ে ছুটেছে মোটর। পথে পথে পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের ছোট ছোট গ্রাম। নতুন গ্রামের নতুন নাম,—শান্তনু, উত্তরা, কৌশল্যা, পঞ্চবটি, চিত্রকূট, জনকপুর, সীতাপুর—রামায়ণে যত লোক আছে, যত স্থান আছে, সেইসব নামে গ্রাম বসে গেছে। তাছাড়াও অশ্বত্থতলা, কদমতলা, বকুলতলা। নাম শুনে যেন বাংলাদেশের নরম মাটির গন্ধ এসে লাগে নাকে।

জেটি থেকে উনিশ মাইল দূরে 'পিচার নালা', নতুন বসতি হচ্ছে নবাগত উদ্বাস্তুদের। পাহাড় হতে চুইয়ে গড়িয়ে পড়া জল গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে নালা হয়ে। এই পিচার নালার দুদিকের পাহাড়ের বন মাইলের পর মাইল কেটে কেটে সাফ করা হচ্ছে। পনেরো বিঘা করে জমি নিয়ে উদ্বাস্তুরা বসবে এখানে ঘর-সংসার বেঁধে।

আট টন ওজনের মস্ত এক লোহার বল, হাতীর পায়ের মতো মোটা লোহার শিকল বলের দু'দিকে। দুই ট্রাকটার শিকলের দু'দিক ধরে টান মারে, লোহার বল গড়িয়ে গিয়ে বনস্পতি দুমড়ে ফেলে। দণ্ডকারণ্য হতে এ বল এখন এখানে এনে কাজে লাগানো হচ্ছে। এখানকার কাজ হয়ে গেলে আবার অন্য কোথাও নিয়ে যাবে হয়তো।

বহু উদ্বাস্তু পরিবার এসে আছে ক্যাম্পের অস্থায়ী ঘরে। পুরুষেরা ভবিষ্যৎ বসতির নানা কাজে লেগেছে, আর বন সাফ করা জমির দিকে তাকিয়ে আছে—কোন্ মাটিটুকু তার নিজের হবে একদিন।

বাঙালদেশের বৌরা গিন্নিরা এগিয়ে আসে, সেই ছেলেবেলার শোনা সুরে কথা বলে। সেই তাদের সহজ সাজ, সরল ভঙ্গী,—যেন লাল রঙের কাঁচ কাঁচ পাতা-ভরা গাব গাছতলার এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া।

পিচার নালা হতে রঙ্গত আসি। রঙ্গত এখন আর গ্রাম নয়, ছোটখাটো নগর—উদ্বাস্তুদের। এরা এসেছে বেশ কয়েক বছর আগে। ভালোভাবেই স্থিতি হয়েছে এদের। দেশের মাটির শোক ভুলে গেছে। থানা পুলিশ কোর্ট কাছারি স্কুল রেস্টুরেন্ট সিনেমা দোকান নিয়ে পূর্ণ নগর একখানা। আন্দামান আর কালা-পানির দেশ নয়, নিজেদেরই দেশ। কালাপানি এখন পদ্মার ঘোলা জল। পথের ধারের চায়ের দোকানটার সামনে সরু বেঞ্চিটার উপরে ছোট্ট ছোট্ট চারটে মুরগীর বাচ্চা উঠে গা লাগালাগি চুপচাপ বসে আছে, যেন ঘরের শিশুরা সব—রোয়াকে বসে পথের লোকজন দেখছে।

জেটি হতে আবার উঠলাম লঞ্চে, আবার এসে বসলাম ডেকে চেয়ার পেতে।

নীল জল কেটে চলেছে বোট। রোদ পড়লো ওপাশে, চেয়ার টেনে এপাশে এসে বসলাম। ওদিকটা ছিল দ্বীপমুখী, কাছাকাছি সবুজ দ্বীপগুলি দেখতে দেখতে আসছিলাম। এদিকে সাগর আর আকাশ,—একটানা একটাই রূপ,—দেখতে দেখতে ঘুম পায়। চোখ বুজি আর খুলি। এদিকেও আবার রোদের আলো আকাশ ছুঁয়ে জলে পড়ে ঝিকিমিকি করে কেন? মুখ তুলে তাকাই। মেঘে ঢাকা সূর্য কি? সূর্যের তো ওপাশে থাকার কথা! সূর্য নয়, সাগর হতে ওঠা তিন খণ্ড সাদা মেঘ পেঁজা তুলোর স্তূপের মতো, তারি উপর আলো পড়েছে সূর্যের, সেই আভা নীল জলে পড়ে অসীমের পার ছুঁয়ে ঝিলিমিলি নাচতে নাচতে লঞ্চ পর্যন্ত চলে এসেছে—তিনটি ধারায় বেয়ে।

কপালের মাঝখানে সিঁদুরের টিপের জায়গায় সাদা দাগটা আজও মিলিয়ে গেল না। গ্রেট-নিকোবর হতে ফিরে এসে চিটচিটে হয়ে যাওয়া চুল ঘষলাম, অঙ্গ মাজলাম। বেশ কিছুদিন পরে আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়ালাম। সিঁদুর পরতে যাব, দেখি যেন একটি চন্দনের টিপ বসানো সেখানে। স্টিমারে এতদিন লক্ষ্য রাখিনি, রোদে জলে নোনা হাওয়ায় গায়ে ওগোদের ছায়া পড়েছে। কেবল টিপের [illegible]টি ছুঁতে পারেনি, সিঁদুরে ঢাকা ছিল তাই।

পোর্টব্লেয়ারে সমুদ্রের ধারে মেরিন পার্ক, মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি—রবীন্দ্র শতবর্ষে স্থাপন করেছে এটি। বিকেলে মূর্তি ঘিরে জড়ো হয়েছে দ্বীপ-নাগরিকরা। আন্দামান মিউনিসিপালিটি হতে আনন্দ প্রকাশ করল, সৌজন্য দেখাল, মানপত্র দিল স্বামীকে।

আন্দামানে আজ আমাদের শেষদিন।

সার্কিট হাউসে ফিরে এলাম। বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দ্বীপ জোড়া পাহাড়ের ঢেউ, মাথায় নারকেল গাছের সারি,—তাকিয়ে থাকি। আকাশের গায়ে গাছের সারিকে দেখাচ্ছে যেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমে বর্ষামঙ্গল উৎসবের মিছিল চলেছে ফুলপাতার অর্ঘ্য হাতে নিয়ে।

বাসর-জাগা নববধূর সিঁদুর-লেপা কপাল নিয়ে বেলা ডুব দিল তার আড়ালে।

শান্ত দ্বীপ, স্তব্ধ হাওয়া, নিস্তরঙ্গ সাগর।

দ্বীপ ঘিরে দীপাবলীর ফুলঝুরি ফুটল। বাতি জ্বলে উঠল। মাথার উপরে ত্রয়োদশীর চাঁদ। কালো পাহাড়ে ঘেরা সকল দিক।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ পূব,—পূব দিকে খোলা পথ, সাগর এসে ঢুকেছে এই পথে। এই পথেই হাতছানি দিয়ে সাগর মনকে টেনে নিয়ে উধাও হয়ে গেল চোখের নিমেষে।

—